প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল

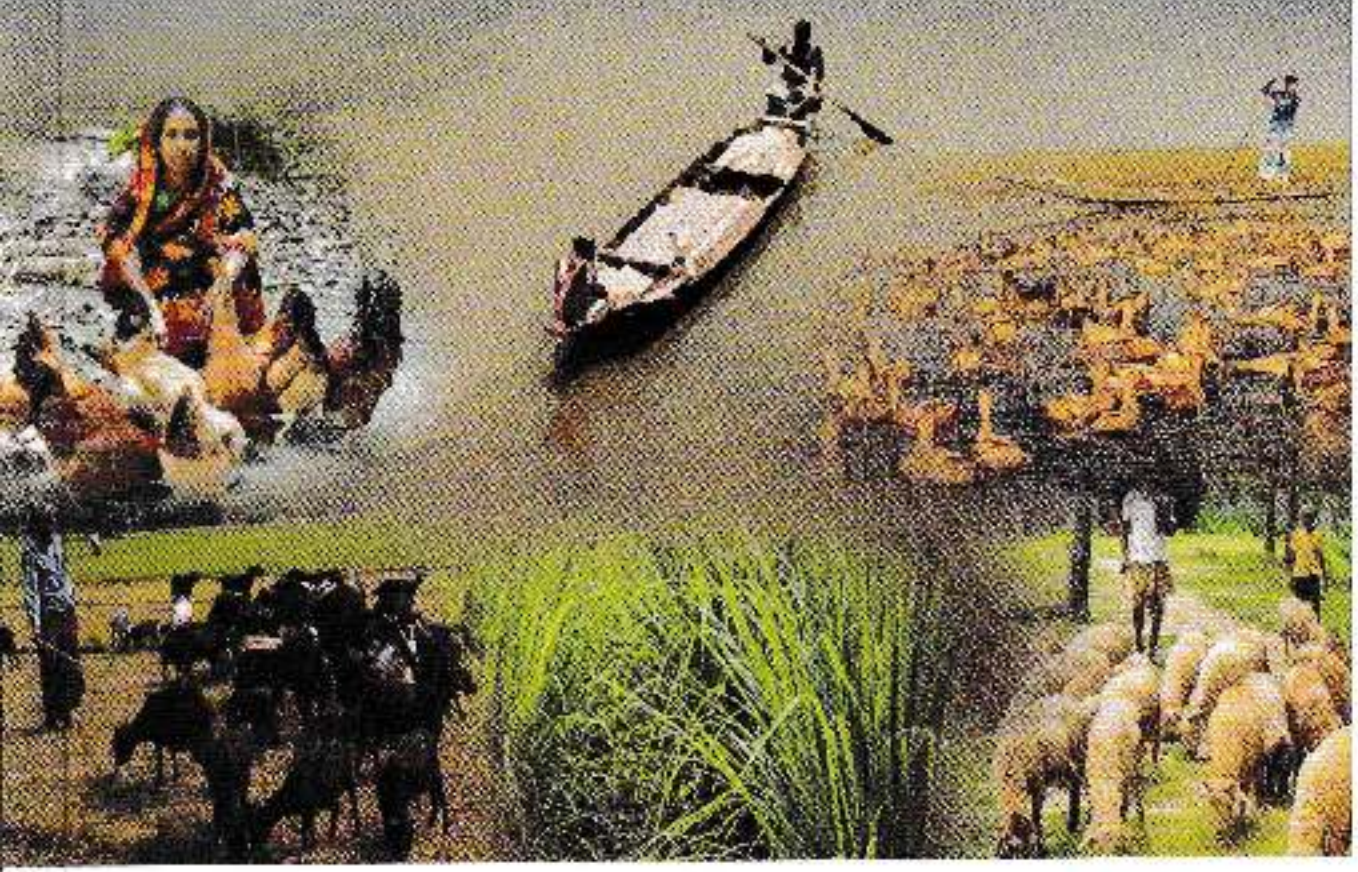

হাওর অঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল

রচনা ও সম্পাদনায়

ডা. মোঃ আখলাক উদ্দিন ফকির, পরিচালক

ড. সৈয়দ আলী আহসান, উপ-পরিচালক

ডা. পল্লব কুমার দত্ত, উপ-পরিচালক

জিনাত সুলতানা, উপ-পরিচালক

দীপক কুমার সরকার, ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর

সম্পাদনা সহযোগীতায়

ডা. মোঃ আনোয়ার সাহাদৎ, উপ প্রকল্প পরিচালক

ড. এবিএম মুস্তানুর রহমান, উপ প্রকল্প পরিচালক

সার্বিক তত্ত্বাবধান ও প্রচ্ছদ ডিজাইন

ডা. মোঃ গোলাম কবির

প্রকল্প পরিচালক

হাওর অঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প

উপদেষ্টা

ডা. মনজুর মোহাম্মদ শাহজাদা

মহাপরিচালক

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

প্রকাশনায়

হাওর অঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প,

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

Website: www.dls.gov.bd

Email: pdhaordls@gmail.com

মুদ্রণ সংখ্যাঃ ৫১,৫০০ কপি

প্রকাশকালঃ ডিসেম্বর ২০২১

উৎসর্গ

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতি

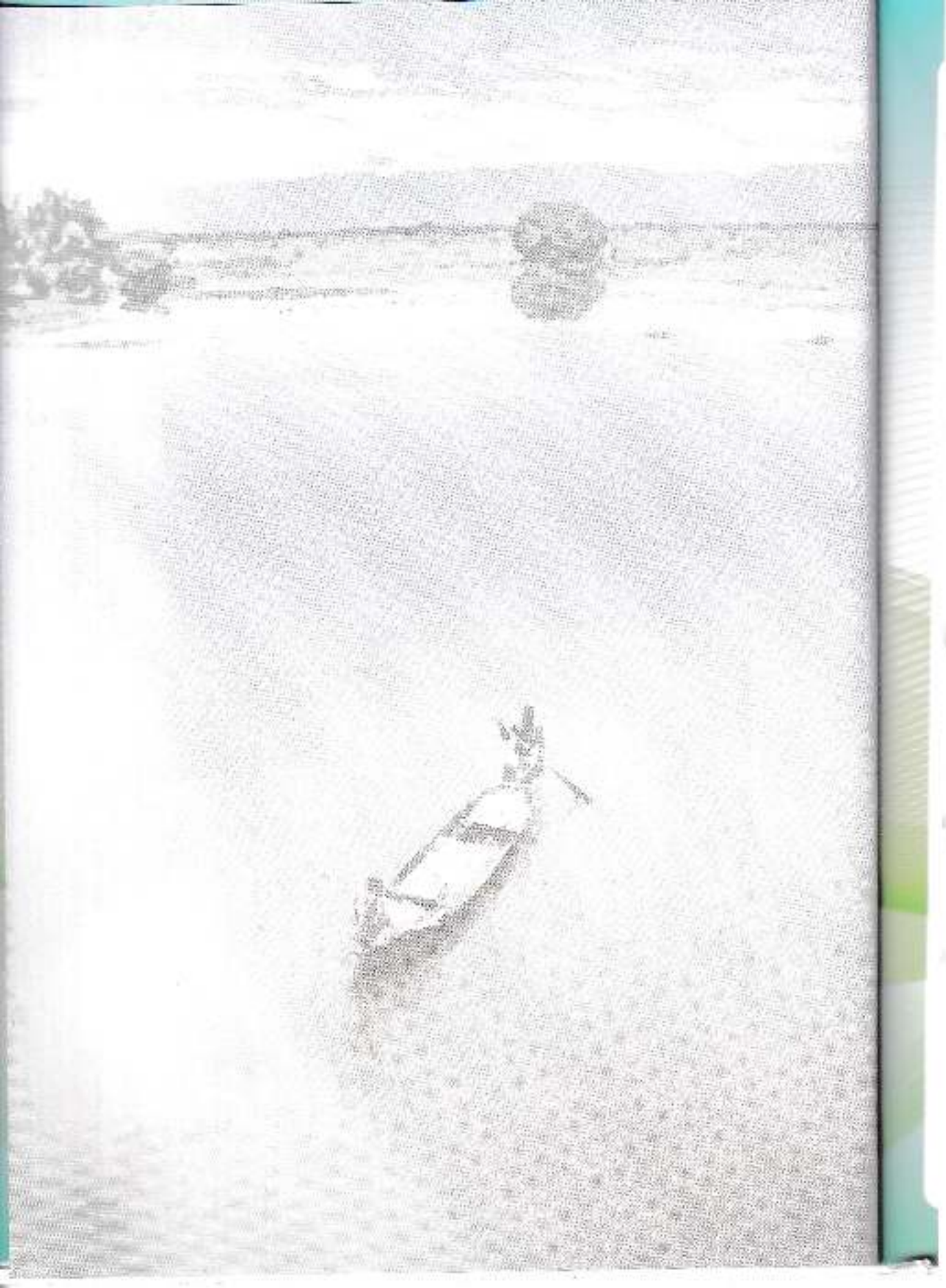

মন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সুখী, সমৃদ্ধ ও আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। জাতির পিতার সুযোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সে স্বপ্নের সার্থক রূপায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। উন্নয়নের অগ্রযাত্রার গতিতে তিনি দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এ উন্নয়ন ধারায় দেশের প্রান্তিক ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে হাওর অঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় আট ভাগের এক ভাগ বিস্তীর্ণ হাওর অঞ্চলের সাতটি জেলার অধিবাসী। সেখানকার জীবনপদ্ধতি, সংস্কৃতি, জীবিকায়ন বৈচিত্র্যপূর্ণ। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করা হাওর অঞ্চলের মানুষের জন্য আগামী দিনের অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। হাওর অঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ অঞ্চলের প্রাণিসম্পদ খাতের টেকসই উন্নয়ন, তৃণমূল পর্যায়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন এবং প্রাণিজ আমিষ তথা দুধ, ডিম ও মাংসের চাহিদা পূরণ হবে। ফলে হাওর অঞ্চলের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সমৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন সম্ভব হবে। এভাবে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ অর্জন এবং বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে হাওর অঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি মনে করি।

হাওর অঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের সুফলভোগী খামারিদের প্রশিক্ষণ, ইউনিয়ন পর্যায়ে সেবা প্রদানকারী লাইভস্টক ফিল্ড ফ্যাসিলিটেটরদের মৌলিক দক্ষতা উন্নয়ন, আধুনিক প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তির সাথে পরিচিতি, জীব নিরাপত্তা, রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং টেকসই উন্নয়ন সর্বোপরি প্রাণিসম্পদ খাতে নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরির ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সুফলভোগী খামারিদের প্রশিক্ষণের জন্য দিক-নির্দেশনামূলক প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল প্রণয়ন করা হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি আশা করি ম্যানুয়েলটি সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। এ ম্যানুয়েলের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে সুফলভোগী খামারি ও লাইভস্টক ফিল্ড ফ্যাসিলিটেটরগণ দক্ষ ও প্রশিক্ষিত হয়ে উঠবে। ফলে তারা আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পাশাপাশি প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারবে। প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল রচনা, সম্পাদনা, প্রকাশনায় সংশ্লিষ্টদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(শ ম রেজাউল করিম এমপি)

সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বাণী

পাহাড়, পলল ভূমিতে গড়ে ওঠা আমাদের দেশ প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির লীলা নিকেতন। ইতিহাসের নানা ধাপ পেরিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা তার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আজ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃত ও সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত। জাতিসংঘ ঘোষিত এমডিজির সফল বাস্তবায়নে বাংলাদেশ অপরিসীম সফলতা ও সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও এর ধারাবাহিকতায় রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নত দেশের মর্যাদা লাভ এবং সর্বোপরি ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা অনুযায়ী সরকারের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের প্রতি সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যাপক অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা হচ্ছে।

বর্তমান জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশ প্রত্যক্ষ এবং প্রায় ৫০ শতাংশ পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদের উপর নির্ভরশীল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বিগত দশকে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। ভৌগোলিক কারণে এদেশের হাওরাঞ্চল খুবই দুর্গম এবং গ্রামগুলো বিচ্ছিন্ন। হাওর অঞ্চলের অনেক মানুষই ডেইরী এবং হাঁস-মুরগি পালনের সাথে জড়িত। দেশের ক্রমবর্ধমান প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে গবাদিপশু ও হাঁস মুরগির টেকসই জাত উন্নয়ন এবং রোগনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখার প্রয়াসে সরকার হাওর অঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে প্রান্তিক পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ খাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন এবং প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নত ও টেকসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণ। এ সকল কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে খামারীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান ও সমন্বিত পদ্ধতিতে প্রাণিসম্পদ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের সরবরাহ বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য বিমোচনের উপর সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তি প্রদর্শনীর মাধ্যমে খামারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, দুগ্ধজাত পণ্যের বিপণনের জন্য বাজার সংযোগ, স্থানীয় পর্যায়ে উদ্যোক্তা উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং প্রাণিজ আমিষের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে প্রকল্পটি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

হাওর অঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনায় তৃণমূল পর্যায়ে লাইভস্টক ফিল্ড ফ্যাসিলিটেটরদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। প্রকল্প এলাকায় সম্প্রসারণ সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে লাইভস্টক ফিল্ড ফ্যাসিলিটেটর ও সুফলভোগী খামারীদের দক্ষতা উন্নয়নে দিক নির্দেশনামূলক যুগোপযোগী একটি প্রশিক্ষণ সহায়ক "প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল" তৈরি করা হয়েছে যা প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়ক হবে। আমি আশা করি বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ গাইড হিসেবে প্রণীত ম্যানুয়েলটি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। এ ম্যানুয়েলটি রচনা, সম্পাদনা ও প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আল্লাহ হাফেজ। জয়বাংলা।

ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী

মহাপরিচালক
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নীতি ও পথ ধরে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্ম প্রয়াসে দেশে উৎপাদিত ডিম, দুধ ও মাংসের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করে চলেছে। প্রাণিসম্পদ সেক্টরে গ্রহণ করা হচ্ছে আধুনিক লাগসই প্রযুক্তিভিত্তিক নতুন নতুন প্রকল্প। হাওর এলাকার মানুষের অর্থনৈতিক সক্ষমতা অর্জন ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার "হাওর অঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প" গ্রহণ করে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে হাওর অঞ্চলের ৭টি জেলার ৫৭টি উপজেলার বেকার ও দরিদ্র যুবসম্প্রদায় বিশেষত নারী জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্য দূরীকরণ তথা আত্মকর্মসংস্থান ও নারীর ক্ষমতায়নে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। দেশের এই উন্নয়ন ধারায় পিছিয়ে পড়া সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করে আমিষের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের বিষয়টির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

প্রাণিসম্পদ সভ্যতা-সংস্কৃতির বুনিয়াদ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কৃষি সভ্যতা বিকশিত হয়েছে প্রাণিশক্তির বিভিন্ন ধরণের ব্যবহারের মাধ্যমে। শিল্পবিপ্লবের যুগে আধুনিক মানুষ সুষম খাদ্যের তালিকা প্রণয়নে প্রাণিজাত খাদ্যকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। বাংলাদেশের কৃষি অর্থনীতিতে খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা বিধানে প্রাণিসম্পদ খাতের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা তৈরী, সুষম পুষ্টি নিশ্চিতকরণ, বেকার সমস্যা সমাধান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, জিডিপিতে ক্রমবর্ধমান হারে অবদান রাখা, প্রাণিজাত পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে অধিকহারে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়তা প্রদান, সর্বোপরি দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার মানোন্নয়নে বর্তমানে প্রাণিসম্পদ একটি অপরিহার্য ও সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে বিবেচিত। প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর দেশের গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি উৎপাদন, দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিসহ গবাদিপশু-পাখির পুষ্টি উন্নয়ন, রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নতজাত বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রাণিসম্পদ সামগ্রিক কৃষির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন, আয়বৃদ্ধি ও জীবন যাপনের ধরণের পরিবর্তনের সাথে সাথে আমিষের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। আর মানুষের আমিষের চাহিদার সিংহভাগই আসে প্রাণিজ উৎস থেকে। খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে প্রাণিসম্পদের রয়েছে অবিচ্ছেদ্য গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ। খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের পাশাপাশি এখন পুষ্টি নিরাপত্তা এবং নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে মনোযোগ দেয়া আবশ্যক। বর্তমানে তৃণমূল পর্যায়ে খামারি, উদ্যোক্তা এবং স্টেকহোল্ডারগণ প্রাণিসম্পদ কেন্দ্র থেকে পরামর্শ ও বিভিন্ন ধরণের বিষয় ভিত্তিক সেবা গ্রহণ করছে। হাওর অঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে হাওর অঞ্চলের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের প্রধান উৎস দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সুফলভোগীদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে প্রাণিসম্পদ উপকরণ বিতরণ করা হবে। প্রাণিজ আমিষ উৎপাদন, বিপণন ও প্রক্রিয়াজাতকরণসহ জনগণকে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সার্বিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণ এবং অবহিতকরণের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ ভিত্তিক এ ম্যানুয়াল সম্পর্কে সুষ্ঠুভাবে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কাজে লাগাবেন। প্রাণিসম্পদ খাতে উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তি প্রদর্শনীর মাধ্যমে খামারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, পণ্য বহুমুখীকরণ, মূল্য সংযোজন, স্থানীয় পর্যায়ে উদ্যোক্তা উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে প্রকল্পটির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা দৃশ্যমান হবে বলে আমি মনে করি।

গ্রামীণ কর্মসংস্থান, সার্বিক লোকসংস্থান, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি ও সর্বোপরি আমিষের চাহিদা মিটিয়ে একটি মেধাবী ও স্বাস্থ্যবান প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাণিসম্পদ খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। বিজ্ঞানসম্মত ভাবে পশু-পাখি লালন-পালন কৌশল, খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও রোগবালাই থেকে রক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক ধারণা ও জ্ঞানার্জনের জন্য প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েলের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এ প্রকল্পের আওতায় প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েলটি প্রকল্পভুক্ত সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ এবং এতদসংশ্লিষ্ট সকলের সবিশেষ উপকারে আসবে। এই ম্যানুয়েলটি তৈরীতে যারা শ্রম ও মেধা দিয়ে আন্তরিকতার সহিত কাজ করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

জয়বাংলা

ডাঃ মনজুর মোহাম্মদ শাহজাদা

প্রকল্প পরিচালক
হাওর অঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ফার্মগেট, ঢাকা।

মুখবন্ধ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোনার বাংলা গড়ার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বহু বছরের দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছেন। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত দেশের মর্যাদা লাভ এবং বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার কর্মযজ্ঞে সার্বক্ষণিক আত্মনিয়োজিত রয়েছেন। এ লক্ষ্যে গ্রামীণ উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে [illegible], জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় সরকার অনেক কর্মপন্থা গ্রহণ এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের লক্ষ্যে "হাওর অঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প" গ্রহণ করেছেন।

দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের ৭টি জেলা তথা সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ জেলার বড় অংশ, সিলেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও মৌলভীবাজার জেলার অংশবিশেষসহ বৃহত্তর সিলেট অঞ্চল এবং কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলার বড় অংশ হাওর নিয়ে গঠিত। হাওর অঞ্চলের জনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জীবন ও জীবিকার জন্য কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ পালনের উপর নির্ভরশীল। হাওর এলাকার প্রাণিসম্পদের মধ্যে প্রধানত গবাদিপশু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, মুরগি, হাঁস রয়েছে। উল্লেখ্য যে, সারা দেশের মোট হাঁসের ২৪ শতাংশ এবং মোট গবাদিপশুর ২২ শতাংশ হাওর অঞ্চলে রয়েছে।

স্বাধীনতার পর আর্থ-সামাজিক অবস্থান পুনরুদ্ধারের পথে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গৃহীত দূরদর্শী উদ্যোগ, ১৯৭৩ সালে হাওর অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য একটি স্বাধীন বোর্ড গঠন করেন। হাওর অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও পরিবর্তনশীল জলবায়ুর সাথে হাঁস, মুরগি, গরু, ভেড়া সহজে অভিযোজন করে। হাওর অঞ্চলে হাঁস-মুরগি, গরু-ভেড়া পালন [illegible] সম্ভাবনাময় উৎস। হাওরে শুষ্ক মৌসুমে [illegible] জমি পতিত থাকে যেখানে প্রাকৃতিকভাবেই ঘাস জন্মায়, গবাদিপশুর খামার, ভেড়া পালন ইত্যাদি গড়ে উঠতে পারে এবং বর্ষা মৌসুমে হাওরের মধ্যে প্রচুর শামুক ঝিনুক পাওয়া যায় যা হাঁস পালনের উপযোগী। অপরদিকে গরু ও ছাগল মোটাতাজাকরণ একটি বাড়তি আয় বর্ধনমূলক কাজ হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় এখানে বিশেষ মৌসুমে কৃষিজীবী মানুষ সম্পৃক্ত হতে পারে। আবার বর্ষা মৌসুমে [illegible] মাচা তৈরি করে গবাদিপশু পালনের মাধ্যমে [illegible] লাভ করে [illegible] পারে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে নারী, শিশু ও পুষ্টিহীন জনগোষ্ঠী ব্যাপক উপকৃত হবে। হাওর এলাকায় হাঁস মুরগি, ভেড়া এবং ছাগলপালনের সাথে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীরা জড়িত থাকেন। সুতরাং, এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ নারীর আয় বৃদ্ধি ও ক্ষমতায়ন ঘটবে। প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে প্রাণিজ আমিষের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে যা নারী ও শিশুর পুষ্টি সাধনে সহায়ক হবে।

অনুন্নত প্রযুক্তি, রোগের প্রাদুর্ভাব, সঠিক খামার ব্যবস্থাপনার অভাব, নিম্নমানের প্রাণিস্বাস্থ্য পরিচর্যা ও ভেটেরিনারি সেবা, অপর্যাপ্ত [illegible] ইত্যাদি হাওর অঞ্চলে প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন ও উৎপাদনের প্রধান অন্তরায়। এছাড়া আধুনিক পদ্ধতিতে ও পরিকল্পিতভাবে পশুপাখি লালন-পালন করে পারিবারিক পুষ্টি নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক মুক্তি ও নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। এ প্রকল্পের সুফলভোগীদের ৫০ ভাগই মহিলা। এই আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই প্রকল্পের আওতায় প্রাণিপালন ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত [illegible] মাধ্যমে পারিবারিক [illegible] রাখবে। তাই আধুনিক পদ্ধতিতে পশু-পাখি লালন-পালন, টিকা প্রয়োগ বিধান, খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও রোগব্যাধি থেকে রক্ষা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বলিত একটি প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

প্রকল্পে নির্বাচিত সুফলভোগীরা প্রযুক্তি উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর হতে যথাযথ প্রশিক্ষণ, পরামর্শ ও সেবা গ্রহণের মাধ্যমে, তাদের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস ও আয় বৃদ্ধি পাবে। এর মাধ্যমে [illegible] নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে। সফল এ সকল খামারীকে অনুসরণ করে অন্যরাও আরো খামারী প্রাণিসম্পদ খাতে বিনিয়োগ [illegible] উদ্যোগী হবেন। দেশে [illegible] জমি দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। প্রাণিসম্পদ পালনে খুব বেশি জমির প্রয়োজন হয় না কিন্তু অর্থনৈতিক লাভ অনেক ফসলের তুলনায় অনেক বেশি। প্রাণিসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে এ প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তর, উপকরণ বিতরণ ও যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দুধ, ডিম ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, সেই সাথে [illegible] প্রাণিজ উপজাত রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও [illegible] আমদানি হ্রাসের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

হাওর অঞ্চলের [illegible] পুষ্টি ও জীবনমানের উন্নয়ন, আত্মকর্মসংস্থান কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি প্রাণিসম্পদ উৎপাদন প্রক্রিয়াকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। দেশের [illegible] প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদ নির্ভর কর্মসংস্থানের সাথে যুক্ত। [illegible] বেকারত্ব [illegible] ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগ ও প্রবৃদ্ধি এখাতকে শিল্পের মর্যাদা দিয়েছে।

প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটির প্রণয়ন ও সংকলনে যাঁরা অনন্য ভূমিকা রেখেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি। জয়বাংলা, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ডাঃ মোঃ গোলাম কবির

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	ভূমিকা	১১
২.	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)	১২
৩.	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ভিশন ও মিশন	১৩
৪.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং প্রধান কার্যক্রমসমূহ	১৪
৫.	অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা	১৫
৬.	প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কৌশল	১৭
৭.	মানবসম্পদ উন্নয়ন, সমন্বয় ও পরিদর্শন	১৮
৮.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	২১
৯.	নেতৃত্ব, জেন্ডার ও নারীর ক্ষমতায়ন	২৩
১০.	দল গঠন ও সংগঠন ব্যবস্থাপনা	২৬
১১.	পশু-পাখির রোগ দমন ও জীবনিরাপত্তা	২৮
১২.	টিকার প্রয়োগ ও রোগ প্রতিরোধ	৩১
১৩.	প্রাণিসম্পদে পুষ্টি ব্যবস্থাপনা	৩৬
১৪.	৫.১ গবাদি পশুর খাদ্যের আন্তর্জাতিক শ্রেণিবিন্যাস	৩৭
১৫.	৫.২ গো-খাদ্য হিসেবে সবুজ ঘাস (ফডার) পরিচিতি ও চাষ পদ্ধতি	৪১
১৬.	৫.৩ হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে ঘাস চাষ	৪৪
১৭.	৫.৪ উন্নত জাতের ঘাস হতে সাইলেজ তৈরির প্রক্রিয়া	৪৫
১৮.	৫.৫ সবুজ ঘাস প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও ব্যবহার	৪৭
১৯.	৫.৬ গো-খাদ্য হিসেবে ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র	৪৯
২০.	৫.৭ গো-খাদ্য হিসেবে ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক	৫০
২১.	৬ হাঁস পালন	৫১
২২.	৬.১ হাঁসের জাত ও বৈশিষ্ট্য	৫১
২৩.	৬.২ হাঁসের বাসস্থান ব্যবস্থাপনা	৫২
২৪.	৬.৩ হাঁসের খাদ্য ব্যবস্থাপনা	৫৩
২৫.	৬.৪ হাঁসের বাচ্চা ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা	৫৫
২৬.	৬.৫ বাড়ন্ত হাঁসের ব্যবস্থাপনা	৫৬
২৭.	৬.৬ বাড়ন্ত হাঁসের ব্যবস্থাপনা	৫৮
২৮.	৬.৭ ডিমপাড়া হাঁসের ব্যবস্থাপনা	৫৯
২৯.	৬.৮ ডিমপাড়া হাঁসের ডিমপাড়ার বাসা স্থাপন ও আলোক	৬০
৩০.	৬.৯ হাঁসের খামারে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা	৬০
৩১.	৬.১০ হাঁসের গুরুত্বপূর্ণ রোগ, লক্ষণ ও করণীয়	৬১
৩২.	৬.১১ বাড়ন্ত হাঁস পালনে আয়-ব্যয়ের হিসাব	৬৪
৩৩.	৭ মুরগি পালন	৬৫
৩৪.	৭.১ মুরগির জাত পরিচিতি	৬৫

৩৫.	৭.২ মুরগির বাচ্চা ও ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা	৬৭
৩৬.	৭.৩ বাড়ন্ত মুরগির ব্যবস্থাপনা	৬৯
৩৭.	৭.৪ ডিমপাড়া মুরগির ব্যবস্থাপনা	৭১
৩৮.	৭.৫ ডিমপাড়া মুরগির বাসস্থান, ডিমপাড়ার বাসা স্থাপন, ও আলোক	৭২
৩৯.	৭.৬ মুরগী খামারে জীবনিরাপত্তা ও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা	৭৪
৪০.	৭.৭ সোনালী মুরগি পালনে আয়-ব্যয়ের হিসাব	৮০
৪১.	৮. ছাগল পালন	৮১
৪২.	৮.১ ছাগলের জাত পরিচিতি	৮২
৪৩.	৮.২ বিভিন্ন ধরনের ছাগল পালনের পদ্ধতি	৮৩
৪৪.	৮.৩ ছাগলের বাসস্থান ব্যবস্থাপনা	৮৬
৪৫.	৮.৪ ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা	৮৮
৪৬.	৮.৫ বাচ্চা ছাগল ব্যবস্থাপনা	৯০
৪৭.	৮.৬ পারিবারিক খামারে দুগ্ধবতী ছাগলের ব্যবস্থাপনা	৯০
৪৮.	৮.৭ বিশেষ পদ্ধতিতে ছাগল পালন	৯১
৪৯.	৮.৮ ছাগলের প্রজনন ব্যবস্থাপনা	৯৪
৫০.	৮.৯ ছাগলের টিকাদান কার্যক্রম	৯৫
৫১.	৮.১০ ছাগলের ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস জনিত রোগ ও প্রতিকার	৯৬
৫২.	৯. ভেড়া পালন	৯৯
৫৩.	৯.১ ভেড়ার পালন জাত ও খাদ্য উপাদান ব্যবস্থাপনা	১০২
৫৪.	৯.২ ভেড়ার রোগ ব্যবস্থাপনায় জীবনিরাপত্তা ও রোগ প্রতিরোধ	১০৮
৫৫.	৯.৩ ভেড়া হতে উৎপাদন এবং ৩০টি ভেড়া সমৃদ্ধ খামারের আয়-ব্যয়ের হিসাব	১১৩
৫৬.	১০ গাভী পালন	১১৪
৫৭.	১০.১ বাংলাদেশের স্থানীয় গরুর পরিচিতি	১১৪
৫৮.	১০.২ গবাদি প্রাণির বাসগৃহ ব্যবস্থাপনা	১১৭
৫৯.	১০.৩ ডেইরি প্রাণির খাদ্য ব্যবস্থাপনা	১১৯
৬০.	১০.৪ পশুর খাদ্য ও পুষ্টি ব্যবস্থাপনা	১২০
৬১.	১০.৫ গাভীর প্রজনন, গর্ভকালীন পরিচর্যা ও নবজাত বাছুরের পরিচর্যা	১২৩
৬২.	১০.৬ ডেইরি প্রাণীর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা	১২৮
৬৩.	১০.৭ গবাদি পশুর রোগ সমূহ ও তাদের প্রতিকার	১২৯
৬৪.	১০.৮ দশটি গাভীর দুগ্ধ খামারের আয় ব্যয়ের হিসাব	১৩১
৬৫.	১০.৯ দুধ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ	১৩৩
৬৬.	নবায়নযোগ্য জৈব জ্বালানি, বায়োগ্যাস প্রযুক্তি ও আয় ব্যয়ের হিসাব	১৩৬
৬৭.	গবাদি পশু ও পোল্ট্রি খামারে বর্জ্য ব্যবহার করে কম্পোস্ট সার তৈরি	১৩৯
৬৮.	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ এর থেকে পশুপাখি রক্ষায় করণীয়	১৪১-১৪৩

ভূমিকাঃ

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লক্ষ্য ছিল দেশকে সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করা। বর্তমান সরকার সর্বদাই দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পিত পথে অগ্রসর হচ্ছে। এই সোনার বাংলা হবে দারিদ্র্যমুক্ত, ক্ষুধামুক্ত ও দুর্নীতিমুক্ত যেখানে দ্রুত জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমৃদ্ধি ঘটবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কার্যকরী পরিকল্পনার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশিত উন্নয়ন পথ ও দর্শন অনুসরণ করে সেই মোতাবেক রূপকল্প ২০২১ এবং এ সংশ্লিষ্ট প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ ঘোষণার মাধ্যমে দারিদ্র্য মোকাবেলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। এর লক্ষ্য ছিল ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা লাভ, মানব উন্নয়ন এবং দ্রুত দারিদ্র্য নিরসন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিচক্ষণ রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং সুদক্ষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ফলে বাংলাদেশ নিরবচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করে। ফলে ২০১৮ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সকল মানদণ্ড পূরণ করে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশের তালিকাভুক্ত হয়। বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংক সংজ্ঞায়িত নিম্ন আয়ের দেশের তালিকা থেকে বেরিয়ে এসে ২০২১ সালের লক্ষ্যমাত্রা সময়ের আগেই নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের তালিকায় স্থান পায়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ মাংস উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। প্রাণিসম্পদ খাতে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার উৎকর্ষ সাধনের জন্য সরকার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে চলেছে। সরকারের উন্নয়ন দর্শন এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০২১-২০২৫) প্রাণিসম্পদ সেক্টরের অর্জিতব্য লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে জিডিপিতে স্থিরমূল্যে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১.৪৪% এবং প্রবৃদ্ধির হার ৩.৮০%। মোট কৃষিজ জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১৬.৯০%। জনসংখ্যার প্রায় ২০% প্রত্যক্ষ এবং ৫০% পরোক্ষ ভাবে প্রাণিসম্পদ খাতের উপর নির্ভরশীল। প্রাণিসম্পদ কৃষকের কর্মসংস্থান, নগদ আয়, পুষ্টি, খাদ্য নিরাপত্তা ও সামাজিক মর্যাদার উৎস। বর্তমানে দুধ, মাংস ও ডিমের প্রাপ্যতা বেড়ে যথাক্রমে ১৯৩.৩৮ মিলি/দিন, ১৩৬.১৮ গ্রাম/দিন এবং ১২১.১৮টি/বছর এ উন্নীত হয়েছে। জনসংখ্যা ও আয় বৃদ্ধির সাথে দুধ, মাংস, ডিমের পাশে এ সব পণ্য থেকে প্রক্রিয়াজাত খাবারের অভ্যন্তরীণ চাহিদাও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এতদসত্ত্বেও সরকারের নীতি ও কৌশলের পাশাপাশি ব্যক্তি খাতের উদ্যোগের কারণে চাহিদা ও উৎপাদনের ব্যবধান ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগি উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হল সুষম খাদ্যের নিশ্চয়তা। দেশে গবাদিপ্রাণি ও হাঁস মুরগির খাদ্য ঘাটতি মেটানোর জন্য খামারীদের উন্নতজাতের ঘাস, অপ্রচলিত খাদ্যশস্য ও ভুট্টা চাষে উদ্বুদ্ধ করা এবং ঘাসের কাটিং বা বীজ সরবরাহ করা হচ্ছে। সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগ, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনশক্তি নিয়োগ, সক্ষমতা বৃদ্ধি, ভ্যালু চেইন ব্যবস্থার উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত সহায়তার বৃদ্ধি, পিপিপি এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ২০২৩ সালের মধ্যে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়ন, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে।

দেশের সকল মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ও জীবনমান উন্নয়ন ব্যতীত টেকসই উন্নয়ন কোনভাবেই সম্ভব নয়। হাওর অঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে হাওর অঞ্চলের দারিদ্র্যপীড়িত ৭টি জেলার ৫৩টি উপজেলার বেকার ও দরিদ্র যুবক-যুবতী বিশেষত নারী জনগোষ্ঠীকে প্রাণিসম্পদের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ তথা আত্মকর্মসংস্থান ও নারীর ক্ষমতায়নে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। হাওর অঞ্চলের সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রকল্প। এ প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগীদের মাঝে হাঁস, মুরগি, ছাগল ও ভেড়া বিতরণ করা হবে যা প্রাকৃতিক পরিবেশে পালনের জন্য খুবই উপযোগী।

এ প্রকল্পের সফলতার সাথে দারিদ্র্য বিমোচনের কাজে লাগানোর জন্য দেশীয় উপযোগী কারিগরি প্রশিক্ষণের ঘাটতি রয়েছে। খামারীদের মৌলিক দক্ষতা উন্নয়ন, আধুনিক প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তির সাথে পরিচিতি ও টেকসই উন্নয়ন সর্বোপরি প্রাণিসম্পদ খাতে নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরির ক্ষেত্রে একটি প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েলের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সে আঙ্গিকেই এই প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত "প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল" ব্যবহার করে সুফলভোগীগণ আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পাশাপাশি প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা (SDG)

এস ডি জি (SDG)

২০১৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০ তম অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট " ২০৩০ এজেন্ডা গৃহীত হয়। টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে "২০৩০ এজেন্ডা" এমন একটি কর্ম-পরিকল্পনা যা বিশ্ব শান্তি জোরদার করবে এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যসহ সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটাবে। টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের মূলমন্ত্র হবে: "কাউকে পশ্চাতে রেখে নয় (No one will be left behind) নীতি অনুসরণ। সহস্রাব্দ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) অর্জনে বাংলাদেশ প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। গত দুই দশকে দারিদ্র হ্রাস, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীর উন্নয়ন, জেন্ডার সমতা অর্জন, খাদ্য নিরাপত্তা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি, পাঁচ বছরের নিচে শিশু মৃত্যুর হার ও মাতৃ মৃত্যুর হার কমানো প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য বিশ্ব স্বীকৃত। এই অভীষ্টগুলো বাস্তবায়নে কাজ করবে যার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে জনগণের সকল ধরনের দারিদ্র্যের অবসান ঘটানো সম্ভব হবে; সকল ধরনের বৈষম্যের অবসান ও অসমতা হ্রাসের গুরু দায়িত্ব পালন করবে এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় লক্ষ্য এগিয়ে নেয়া যাবে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিরূপণের জন্য একটি সমন্বিত ভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো প্রস্তুত করা হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টতে ১৭টি অভীষ্ট এবং ১৬৯টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তন্মধ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ম্যাপিং অনুযায়ী ৯টি অভীষ্ট (১, ২, ৩, ৮, ৯, ১০, ১২, ১৩, ১৭, নং) ও ২৮ টি লক্ষ্যমাত্রা প্রাণিসম্পদ সেক্টরের সাথে সংশ্লিষ্ট আছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ

১) সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান, ২) ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার, ৩) সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ, ৪) সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি, ৫) জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন, ৬) সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা, ৭) সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা, ৮) সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, ৯) অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং উদ্ভাবনার প্রসারণ, ১০) অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা, ১১) অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাতসহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা, ১২) পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদনধরন নিশ্চিত করা, ১৩) জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ, ১৪) টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার, ১৫) স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারে পৃষ্ঠপোষণ, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবেলা, ভূমির অবক্ষয় রোধ ও ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ, ১৬) টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ, ১৭) টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করা।

প্রাণিসম্পদ সেক্টর দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনশক্তি তৈরি, খামারিদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রাণিজাত পণ্যের আধুনিক ব্যবহার উন্নয়ন এবং অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) অর্জনে কাজ করে যাচ্ছে। তাই বর্তমানে সরকারও এই প্রাণিসম্পদ খাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। হাওর অঞ্চলে প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন এবং প্রাণিসম্পদের সার্বিক উন্নয়নের পাশাপাশি জলবায়ুর পরিবর্তন মোকাবিলায় অবদান রাখবে।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ভিশন ও মিশন

রূপকল্প (Vision)

সকলের জন্য নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও মানসম্পন্ন প্রাণিজ আমিষ সরবরাহকরণ।

অভিলক্ষ্য (Mission)

প্রাণিসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aim and Objectives):

- গবাদিপশু পাখির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
- গবাদিপশু পাখির রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
- মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
- নিরাপদ প্রাণিজাত পণ্যের (দুধ, মাংস ও ডিম) উৎপাদন ও রপ্তানী বৃদ্ধিতে সহায়তা;
- গবাদিপশু পাখির জেনেটিক রিসোর্স সংরক্ষণ ও উন্নয়ন

প্রধান কার্যাবলী (Main Functions):

- প্রাণিজ আমিষ তথা দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ;
- গবাদিপশু পাখির চিকিৎসা, রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
- উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে গবাদিপশু পাখির জাত উন্নয়ন এবং কৃত্রিম প্রজনন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ;
- গবাদিপশু পাখির পুষ্টি ও পশুখাদ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
- প্রাণিসম্পদ সেক্টরে দক্ষ জনবল সৃষ্টি ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মানব সম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ;
- প্রাণিজাত পণ্যের বাজার ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ও মূল্য সংযোজনে উদ্যোক্তা তৈরী;
- GAP GLP প্রচলনের মাধ্যমে খামার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধন;
- দেশীয় প্রজাতির কৌলিক মান সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;
- প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত গবেষণার চাহিদা নিরূপণ ও উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সম্প্রসারণ;
- দীর্ঘ ও মধ্যমেয়াদি সরকারের গৃহীত পরিকল্পনা ও সেক্টোরাল কর্ম-কৌশলের আওতায় উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- প্রাণিসম্পদ সেক্টরে প্রয়োজনীয় আইন, বিধি, নীতিমালা ও নির্দেশিকা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ এবং বাস্তবায়ন।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা সমূহ ঃ

1. The Bengle Cruety to Animals Act, 1920.
2. The Society for the prevention of Cruelty to Animals ordinance, 1962.
3. পশু রোগ আইন, ২০০৫।
4. বাংলাদেশ পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০০৫।
5. পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১১।
6. বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল এ্যাক্ট-২০১৮।
7. প্রাণীকল্যাণ আইন ২০১৮।
8. পশু রোগ বিধিমালা, ২০০৮।
9. পশুখাদ্য বিধিমালা, ২০১৩।

প্রাণিসম্পদ নীতিমালা ঃ

১. জাতীয় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন নীতিমালা,২০০৭
২. জাতীয় পোল্ট্রি উন্নয়ন নীতিমালা, ২০০৮।

পোল্ট্রি উন্নয়ন নীতিমালা ২০০৮ খ্রি: অনুযায়ী বাণিজ্যিক পোল্ট্রি খামার স্থাপনের শর্তাবলী ঃ

- বাণিজ্যিক খামার জনবসতি এলাকা এবং শহরের বাইরে স্থাপন করতে হবে।
- একটি বাণিজ্যিক খামার হতে অন্য একটি বাণিজ্যিক খামারের দূরত্ব ন্যূনতম ২০০ মিটার হতে হবে
- ব্রিডিং খামারের পারস্পারিক দূরত্ব ন্যূনতম ৫ কিলোমিটার হতে হবে।
- গ্রান্ড প্যারেন্ট স্টক এবং প্যারেন্ট স্টক খামার লোকালয়ের বাইরে স্থাপন করতে হবে এবং উভয় শ্রেণির খামারের ২ কিলোমিটারের মধ্যে কোন প্যারেন্ট স্টক/ বাণিজ্যিক খামার প্রতিষ্ঠা করা যাবে না
- গ্রান্ড প্যারেন্ট স্টক ও প্যারেন্ট স্টক খামার স্থাপনের পূর্বে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে
- খামার ও হ্যাচারী স্থাপন পরিকল্পনায় উন্নত জীব নিরাপত্তা ব্যবস্থার উল্লেখ থাকতে হবে।
- খামার ও হ্যাচারী পরিকল্পনায় বর্জ্য স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে অপসারণের ব্যবস্থা থাকতে হবে; এবং
- খামার ও হ্যাচারীর জন্য নির্ধারিত স্থানে স্বাস্থ্যসম্মত বর্জ্য অপসারণের জন্য প্রয়োজনীয় স্থানের সংস্থান থাকতে হবে।

হাওর প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

১) সমন্বিত পদ্ধতিতে প্রাণিসম্পদ উৎপাদন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে হাওরাঞ্চলীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠির মাথাপিছু প্রাণিজ আমিষ গ্রহণ বৃদ্ধিকরণ এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয়ন।
২) প্রাণিসম্পদ খাতে উন্নত ও টেকসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণ
৩) নারীর আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি, তাদের জীবনমান উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন।

প্রকল্পের ফলাফল

- নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে।
- খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার উন্নয়ন এবং মাথাপিছু প্রাণিজ আমিষ গ্রহণের পরিমান বৃদ্ধি পাবে।
- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে
- নারীর কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি পাবে এবং ক্ষমতায়ন হবে।
- প্রস্তাবিত প্রকল্পের মাধ্যমে ঘাস চাষ এবং এর বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে গবাদিপশুর খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন হবে।
- দরিদ্র জনগোষ্ঠী ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণে অনুপ্রাণিত হবে।
- অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে সচেতনতা ও নৈপুণ্য বৃদ্ধি পাবে।
- দরিদ্র পরিবারগুলোর জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি এবং বৈরী অবস্থার টিকে থাকার সক্ষমতা অর্জন করতে পারবে।

প্রকল্পের আউটপুট

- ৫৩টি উপজেলায় ২১৫২টি সুফলভোগী দল গঠিত হবে
- ৫১২৭৬ জন সুফলভোগী খামারী ও ৩৩৮ জন লাইভস্টক ফিল্ড ফ্যাসিলিটেটর প্রশিক্ষিত হবে।
- ৫১২৭৬ জন প্রশিক্ষিত সুফলভোগী পরিবার বিভিন্ন প্যাকেজে উপকরণ ও প্রযুক্তি ও প্রাণিসম্পদ সেবা গ্রহণ করবে
- ৫৩টি উপজেলায় মোট ৩৮০টি মডেল প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করা হবে।
- ৩৩৮টি ইউনিয়নের মোট ৬৭৬ জন (৫০% মহিলা) প্রশিক্ষিত ফ্যাসিলিটেটর তৈরী হবে
- অন্তর্ভুক্ত উপজেলার ৫০হাজার খামির উৎপাদনকারী সুফলভোগী সহায়তা প্রাপ্ত হবে
- হাওরাঞ্চলীয় দরিদ্র পরিবারের জীবন মানের উন্নয়ন করা হবে।

৮টি প্যাকেজঃ

ক্রমিক নং	প্যাকেজের নাম	সুফলভোগী সংখ্যা
০১	হাঁস পালন	১৭৯৭৫ জন
০২	ছাগল পালন	৫৮৫০ জন
০৩	মুরগি পালন	১৭৪৮০ জন
০৪	ভেড়া পালন	২৮৬৫ জন
০৫	ঘাস চাষ	৩৩৮০ জন
০৬	ভ্যাকসিনেটর	৬৭৬ জন
০৭	পনির উৎপাদনকারী	৫০ জন
০৮	সাইলেজ প্রদর্শনী প্লট	৩৭০টি

প্রকল্পভুক্ত জেলা ও উপজেলার নামঃ

ক্রমিক	জেলা	উপজেলা
১.	সুনামগঞ্জ	১. সদর, ২. জগন্নাথপুর, ৩. ধর্মপাশা, ৪. জামালগঞ্জ, ৫. ছাতক, ৬. শাল্লা ৭. তাহিরপুর, ৮. বিশ্বম্ভরপুর, ৯. দিরাই, ১০. দোয়ারাবাজার এবং ১১. দক্ষিণ সুনামগঞ্জ
২.	সিলেট	১. জৈন্তাপুর, ২. বিয়ানীবাজার, ৩. ফেঞ্চুগঞ্জ, ৪. বালাগঞ্জ, ৫. বিশ্বনাথ, ৬. দক্ষিণ সুরমা, ৭. গোয়াইনঘাট, ৮. জকিগঞ্জ, ৯. কানাইঘাট এবং ১০. গোলাপগঞ্জ
৩.	হবিগঞ্জ	১. আজমিরীগঞ্জ, ২. সদর, ৩. বাহুবল, ৪. লাখাই ৫. বানিয়াচং, ৬. নবীগঞ্জ এবং ৭. মাধবপুর
৪.	মৌলভীবাজার	১. কুলাউড়া, ২. রাজনগর, ৩. শ্রীমঙ্গল, ৪. বড়লেখা এবং ৫. জুড়ী
৫.	নেত্রকোণা	১. আটপাড়া, ২. কলমাকান্দা, ৩. খালিয়াজুরী, ৪. মোহনগঞ্জ, ৫. মদন, ৬. কেন্দুয়া, ৭. নেত্রকোণা সদর ৮. দুর্গাপুর এবং ৯. বারহাট্টা
৬.	কিশোরগঞ্জ	১. মিঠামইন, ২. করিমগঞ্জ, ৩. অষ্টগ্রাম, ৪. ইটনা, ৫. নিকলী, ৬. বাজিতপুর ৭. কুলিয়ারচর, ৮. তাড়াইল, ৯. ভৈরব এবং ১০. কটিয়াদি
৭.	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১. নাসিরনগর

মোট উপজেলার সংখ্যা ৫৩টি

অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা

অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা (Participatory Rural Appraisal or PRA) কী?

P = অংশগ্রহণমূলক (Participatory): তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ- একটি বটম-আপ এপ্রোচ যেখানে প্রকল্প জনবলের দৃষ্টিভঙ্গী ও ভাল যোগাযোগ দক্ষতা প্রয়োজন হয়।

R = গ্রামীণ (Rural): সমীক্ষার বিভিন্ন কৌশলসমূহ যে কোন অবস্থায় যেমন গ্রাম বা শহরে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত জনগণের সাথে পরিচালনা করা যেতে পারে

A = সমীক্ষা (Appraisal): সমীক্ষা হলো গ্রামীণ সমস্যা, চাহিদা ও সম্ভাবনা বিষয়ক তথ্যাদি সংগ্রহ করার পদ্ধতি। অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা (PRA) হল এমন কতগুলো পদ্ধতির সমষ্টি যা গ্রামের তথা এলাকার মানুষকে তাদের নিজেদের জীবনের ও পরিবেশের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করতে, বহিরাগতদের সাথে মত বিনিময় করতে এবং নিজস্ব সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করে তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, তদারক ও মূল্যায়ন করতে সামর্থ্য যোগায়।

PRA- কৌশল গ্রামবাসীদেরকে বিভিন্ন ডায়াগ্রাম, চার্ট বা মানচিত্র তৈরি করতে উদ্বুদ্ধ করে যার মাধ্যমে ঐ সকল গ্রামবাসীর অতীত ও বর্তমান অবস্থা প্রতিফলিত হয়। গ্রামের বা এলাকার জনগণের দ্বারা তাদের নিজেদের সমস্যা চিহ্নিতকরণ, চাহিদা নিরূপণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ (মনিটরিং) ও মূল্যায়ন করার পদ্ধতিসমূহের সমষ্টি হল PRA অর্থাৎ যাদের জন্য প্রকল্প তাদের মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিত করে বিশ্লেষণ ও সমাধান নির্ণয় করানোকেই PRA- বলা হয়।

অষ্টগ্রামের মৌলভী বাজার-এ পনির উৎপাদনকারী সুফলভোগী গ্রুপ গঠনে পিআরএ

পিআরএ'র প্রধান কৌশলসমূহ

কৌশলসমূহ	ব্যবহারের উদ্দেশ্য
পরিভ্রমণ	গ্রামের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত হাঁটার মাধ্যমে প্রাকৃতিক বিষয়ে জানা, স্থানসমূহের জমির গঠন, ব্যবহার, উৎপাদন, সমস্যা ইত্যাদি জানা।
সামাজিক মানচিত্রায়ণ	সার্বিকভাবে গ্রামের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানা
সম্পদ মানচিত্রায়ণ	গ্রামের সম্পদ সম্পর্কে বিশদ ভাবে জানা। যথা-ঘর-বাড়ি, হাট-বাজার, স্কুল-কলেজ, নদী-খাল-পুকুর, ফসলের জমি, বনভূমি ইত্যাদি।
আর্থিক অবস্থাভেদে স্তর বিন্যাস	সম্পদের ভিত্তিতে গ্রামের জনগণের অর্থনৈতিক স্তর বিন্যাস (ধনী-গরীব শ্রেণীবিন্যাস) করা।
বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে স্তর বিন্যাস	বিভিন্ন বিষয়ে তুলনামূলক স্তর বিন্যাসের মাধ্যমে গুরুত্ব বা ওজন নিরূপণ জানা।
সম্পর্কের চিত্র	বিভিন্ন প্রয়োজনে গ্রামের জনগণের বিভিন্ন স্থান/সংস্থার সাথে যোগাযোগ বিষয়ে জানা।
চাপাতি ডায়াগ্রাম	বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সংস্থার সাথে জনগণের সম্পর্ক, এলাকার বিভিন্ন ব্যক্তি বা সংস্থার প্রভাব জানা
সমস্যা নিরূপণ	খামারীদের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য প্রদানমূলক সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা প্রদান করার জন্য খামারীদের তথ্য/চাহিদা সনাক্ত করা।
ঋতুভিত্তিক পার্থক্য	ঋতুভিত্তিক উৎপাদন/ কাজের পার্থক্য, রোগ, শ্রম চাহিদা, অভাব, ঋণ সুবিধা, সামাজিক কার্যক্রম ইত্যাদি জানা ও বিশ্লেষণ করা

ব্যবহার

খামারীদের চাহিদার প্রতি লক্ষ্যদানমূলক সম্প্রসারণ কর্মকান্ডের পরিকল্পনা করার জন্য খামারীদের তথ্য/চাহিদা সনাক্ত করা হয়।

পদ্ধতি:

➢ মোটামুটি একই ধরনের অবস্থা সম্পন্ন প্রায় ৩০ জন খামারী/কৃষক এর একটি দলের সাথে আলোচনা করা যেতে পারে।

➢ আলোচনার জন্য একটি বিষয় বাছাই করা, যেমন- প্রাণিজ খাদ্য উৎপাদন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা।

➢ দলটিকে ৫-৬ জনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ভাগ করে, তাদেরকে কাগজ-কলম দিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে তারা যে সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হন সেগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত করার জন্য বলতে হবে।

➢ তালিকা করা শেষ হলে ছোট দলগুলো একটি পূর্ণ অধিবেশনে নিজ নিজ তালিকা পেশ করবেন

➢ এরপর সমস্যার একটি বড় তালিকা হবে এবং এ তালিকা হতে সকল দলের জন্য সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাসমূহ নির্বাচন করতে হবে এবং প্রাপ্ত সমস্যার একটি অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করতে হবে

➢ সমস্যাগুলো সমাধানের কোন চেষ্টা করা হয়েছিল কিনা সে সম্পর্কে খামারীদের নিকট হতে জানতে হবে।

➢ সহায়তাকারী টিমের সদস্য বা সদস্যবৃন্দ ডায়েরিতে আলোচনার সারমর্ম লিপিবদ্ধ করবে।

প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কৌশল

প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কার্যক্রমঃ

প্রযুক্তি সনাক্তকরণ, বাস্তবায়ন এবং প্রদর্শনীর জন্য নিম্ন প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হবে

১. খামারী সুফলভোগী গ্রুপ হাওর অঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের প্রস্তাবিত কাঠামোর মধ্যে প্রযুক্তি সনাক্ত করবে। প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট উৎপাদনে খামারীর দক্ষতার উপর ভিত্তি করে প্রদর্শনী পরিচালনার জন্য খামারীকে নির্বাচন করা হবে।
২. যদি একটি নির্দিষ্ট প্রযুক্তি একাধিক স্থানে প্রদর্শিত হয়, সে ক্ষেত্রে হিসাব করা হবে এক প্রযুক্তি দ্বারা দুইটি প্রদর্শনী করা হয়েছে।
৩. সকল প্রকার প্রযুক্তি প্রদর্শনীসমূহ খামারে/প্লটে প্রদর্শিত হবে।
৪. প্রযুক্তি প্রদর্শনী আয়োজনে প্রকল্প থেকে সকল প্রকার উপকরণ সরবরাহ করা হবে এবং খামারী উক্ত প্রদর্শনীতে প্রয়োজনীয় শ্রম ও জমি/খামারী প্রদান করবেন।
৫. প্রদর্শনীর জন্য নির্বাচিত খামারী প্রদর্শনকৃত প্রযুক্তি গ্রহণে প্রতিবেশী খামারীদেরকে উৎসাহিত করবেন।
৬. প্রদর্শনীর জন্য নির্বাচিত খামারী উক্ত প্রদর্শনীর ২১ দিবস পরিচালনায় লাইভস্টক ফিল্ড ফেসিলিটেটরকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবেন।
৭. প্রতিটি প্রদর্শনীর জন্য একটি করে মাঠ দিবস থাকতে হবে। স্থানীয় সম্প্রসারণ কার্যক্রমের আওতায় প্রদর্শনীর ফলাফল অর্থাৎ উৎপাদনের দিন এই মাঠ দিবসের আয়োজন করা হবে
৮. প্রতিটি প্রযুক্তি প্রদর্শনীতে তথ্যবহুল দৃশ্যমান সাইনবোর্ড স্থাপন করতে হবে

প্রযুক্তি প্রদর্শনীর জন্য খামারী নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়ঃ

১. প্রদর্শনীর জন্য নির্বাচিত/মনোনয়নকৃত খামারী অবশ্যই স্থায়ী বাসিন্দা এবং স্থানীয়ভাবে সকলের নিকট সুপরিচিত হবেন।
২. তিনি বাংলা পড়তে ও লিখতে পারবেন।
৩. প্রদর্শনীর জন্য তাঁর প্রাণী/চাষযোগ্য জমি থাকবে এবং তিনি উক্ত প্রাণী/জমি প্রদর্শনীর কাজে ব্যবহার করতে ইচ্ছুক থাকবেন।
৪. প্রদর্শনী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তিনি অভিজ্ঞ এবং নেতৃত্বের গুণাবলী ও উদ্বুদ্ধকরণের ক্ষমতাবান হবেন।
৫. সদস্যের প্রাণিসম্পদ বিষয়ক মুখ্য পেশা হতে হবে।
৬. তিনি নতুন/উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণ এবং বাণিজ্যিক খামার প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হবেন।
৭. নতুন/উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণে খামারীদের তিনি সহায়তা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবেন।
৮. প্রদর্শনীর শর্ত বলী পালনে তিনি সম্পূর্ণরূপে সম্মত হবেন।

প্রযুক্তি প্রদর্শনী প্লট/খামার নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয়

১. প্রদর্শনী প্লট/খামার অবশ্যই দৃশ্যমান স্থানে হওয়া উচিৎ যাতে খামারীগণ উক্ত প্রদর্শনী প্লট/খামার সহজেই প্রবেশ করে প্রযুক্তি গ্রহণ করতে পারেন। এ জন্য রাস্তার পার্শ্বের প্রদর্শনী প্লট/খামার অগ্রাধিকারযোগ্য।
২. প্রদর্শনী প্লট/খামার উঁচু জমিতে করতে হবে যাতে বন্যায় ক্ষতি না হয় এবং সারা বছর ব্যবহারযোগ্য হয়
৩. প্রদর্শনীর জন্য নির্বাচিত খামারী BG সদস্যের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে, যারা মূলত সম্প্রসারণ পরিকল্পনায় প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে চাহিদা বা সমস্যা চিহ্নিত করেছেন এবং প্রদর্শনী থেকে উক্ত সমস্যা সমাধানে আগ্রহী।
৪. যদি একক খামারী প্রদর্শনী হয় তাহলে খামারী গ্রুপের সকল সদস্যের সম্মতিতে খামার নির্বাচিত করতে হবে।

খামার ঃ (ছাগল/ভেড়া পালন, হাঁস-মুরগী পালন ইত্যাদি)

- খামারটি সুবিধাজনক ও পরিমাণমত জায়গায় হতে হবে। খামারটি পরিদর্শনের জন্য যাতায়াতের সুবিধা থাকতে হবে।
- খামারে বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ এবং বর্জ্য নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকতে হবে
- মুরগী ও মাংসের ক্ষেত্রে বাহির হতে যাতে কোন প্রাণী খামারে প্রবেশ করতে না পারে তার ব্যবস্থা নিতে হবে।
- হাঁস পালনের ক্ষেত্রে খামারের নিকট পুকুর বা জলাশয় থাকতে হবে।

ঘাস চাষ প্রদর্শনী

ঘাস চাষ প্রদর্শনী মূলত কৃষকের নির্বাচিত প্লটে করা হয়।

- ➢ ঘাস চাষের জমিটি কাঙ্খিত আকার ও আকৃতির এবং খোলামেলা স্থানে হতে হবে।
- ➢ ঘাস চাষের জমির মাটির ধরণ ঘাস চাষের উপযোগী হতে হবে।
- ➢ ঘাস চাষের জমিতে পানি সেচের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- ➢ প্রদর্শনীর ঘাস কাটিং পর্যায়ে এলে খামারীদের নিয়ে মাঠ দিবস করতে হবে।

প্রযুক্তি প্রদর্শনী:

প্রযুক্তি প্রদর্শনী সম্প্রসারণের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। সুনির্দিষ্ট প্রযুক্তি বা কৌশল ব্যবহারের ফলে কৃষকের খামারে উৎপাদনের উপর যে প্রভাব পড়ে তা প্রদর্শন করাই প্রযুক্তি প্রদর্শনীর মূল লক্ষ্য। নতুন প্রযুক্তি হস্তান্তরের পূর্বে উক্ত প্রযুক্তি স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কি না এবং প্রযুক্তিটি কৃষকের চাহিদার ভিত্তিতে করা হয়েছে কি না এ সব যাচাই বাছাই করে প্রযুক্তি নির্বাচন করতে হবে। খামারীদের নিকট প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি হস্তান্তরে প্রদর্শনীর সুবিধা হচ্ছেঃ

১. খামারীদের লেখাপড়া কম জানা থাকলেও, প্রদর্শনীর মাধ্যমে তাদের বুঝাতে অনেক সহজতর হয়।
২. খামারী প্রযুক্তি দেখে ও নিজ হাতে করে সহজেই তা শিখতে পারেন এবং অতি সহজেই নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ হন।
৩. এর ফলে খামারী ও সম্প্রসারণ কর্মীর মধ্যে বিশ্বাস এর জন্ম বেড়ে যায় এবং সম্পর্ক সৃষ্টিতে সহায়ক হয়।
৪. অন্যদিকে খামারী সমাবেশ ও মাঠ দিবস কার্যক্রমে প্রদর্শনী সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

প্রযুক্তি প্রদর্শনী সাধারণত দুই প্রকারের, যথা- (ক) ফলাফল প্রদর্শনী ও (খ) পদ্ধতি প্রদর্শনী

(ক) ফলাফল প্রদর্শনী:

যখন কোন উপকরণ ব্যবহার বা কোন কৌশল প্রয়োগের ফলে উৎপাদনের উপর এর প্রভাব পর্যবেক্ষণ করা হয় তাকে ফলাফল প্রদর্শনী বলা হয়। যেমন- একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত একটি গরুকে সাইলেজ খাওয়ানোর ফলে গরুর যে ওজন বৃদ্ধি হয় তা এ প্রযুক্তির ফলাফল। খামারী সমস্যা ও চাহিদার উপর নির্ভর করে এ ধরনের ফলাফল প্রদর্শনী করা হলে খামারীগণ উৎসাহিত হবে।

(খ) পদ্ধতি প্রদর্শনী:

যখন সম্প্রসারণ কর্মীদের মাধ্যমে কোন প্রযুক্তি বা কৌশল এক বা একাধিক খামারীকে হাতে কলমে শেখানো বা দেখানো হয় তাকে পদ্ধতি প্রদর্শনী বলা হয়। পদ্ধতি প্রদর্শনী একটি দলীয় (গ্রুপ) সম্প্রসারণ পদ্ধতি, যা এক হতে দু-ঘন্টা স্থায়ী হতে পারে। তবে পদ্ধতি প্রদর্শনীর বিষয়ে খামারীদের চাহিদা বা সমস্যার ভিত্তিতে চিহ্নিত করতে হবে। এ পদ্ধতিতে একটি বিশেষ দক্ষতা ধাপে ধাপে প্রদর্শন করে এবং অংশগ্রহণকারীদের অনুশীলন করতে সাহায্য করে, যেমন সাইলেজ প্রস্তুতকরণ। এ পদ্ধতিটি অংশগ্রহণমূলক এবং খামারীগণ সাইলেজ প্রস্তুত করণ প্রভৃতি পদ্ধতিটি এক হতে দু-ঘন্টার মধ্যে হাতে-কলমে শিখতে সমর্থ হন। পদ্ধতি প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী উৎপাদন খরচ ও আয়ের ১টি হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন, সমন্বয় ও পরিদর্শন

মানবসম্পদ উন্নয়ন ঃ

সাধারণত দক্ষতা সম্পন্ন মানুষকে মানবসম্পদ বুঝায়।

মানবসম্পদ উন্নয়ন হলো এমন একটি আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নির্দেশক যা ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা বা অবস্থান নির্ধারণ করে। এটি মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল, শিশু মৃত্যু হার হ্রাস, এবং শিক্ষার বৃদ্ধির সাথে সংশ্লিষ্ট। এটি এমন একটি উন্নততর অবস্থাকে নাম দেয় যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি তার সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ এবং যথাযথ কর্মশক্তি নিয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত সেবাগুলো যেমন ন্যূনতম আহার, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, চিত্ত বিনোদন, ইত্যাদি মৌলিক চাহিদা পূরণ করে মানসম্মত জীবন নিশ্চিত করে।

প্রশিক্ষণ ঃ

প্রশিক্ষণ হচ্ছে মানব সম্পদ উন্নয়নের সর্বাধিক কার্যকর প্রক্রিয়া। প্রাতিষ্ঠানিক কাজে মানব সম্পদকে সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে হলে তাদের দক্ষতা ও উপযুক্ততা থাকলেই চলবে না বরং কিভাবে তারা সে দক্ষতা ও উপযুক্ততাকে প্রতিষ্ঠানের কাজে লাগাতে পারে সেদিকেও নজর দিতে হবে। মানবসম্পদ নির্বাচন ও নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনাকে অনেক বিধি নিষেধ বিবেচনা করতে হয়। এক্ষেত্রে একমাত্র প্রশিক্ষণই সকল সীমাবদ্ধতাকে দূরীভূত করে দক্ষ ও উপযুক্ত মানব সম্পদ গঠনে ভূমিকা রাখতে পারে। দেশ যত দ্রুত উন্নত হচ্ছে তত প্রযুক্তির পরিবর্তন ঘটছে ফলে পুরানো কর্মীদের পুনঃপ্রশিক্ষণের প্রয়োজন ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই নতুন পুরানো সকল কর্মীর ক্ষেত্রেই প্রশিক্ষণ সমানভাবে প্রযোজ্য।

এল এফ এফদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

মানবসম্পদ উন্নয়নের উপায় সমূহঃ

১. আনুষ্ঠানিক শিক্ষাঃ প্রাথমিক শিক্ষা স্তর থেকে শুরু করে বিভিন্ন কাঠামোর মাধ্যমিক শিক্ষা এবং কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ পর্যায়ের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষাকে বোঝানো হয়েছে।

২. কর্মকালীন প্রশিক্ষণঃ ধারাবাহিক বা অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করা।

৩. আত্ম উন্নয়নঃ যেমন– জ্ঞান, দক্ষতা ও সামর্থ্যের উন্নয়ন যা ব্যক্তি তার নিজের চেষ্টায় আনুষ্ঠানিক উপায়ে অথবা দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে অনানুষ্ঠানিক উপায়ে পড়ে বা অন্যের কাছ থেকে শিখে নিজের আগ্রহ ও কৌতূহল অনুযায়ী ব্যাপক জ্ঞান, দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে তৈরি করে

৪. স্বাস্থ্য উন্নয়নঃ উন্নততর চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং মানব স্বাস্থ্য কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্মরত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য উন্নয়ন।

৫. পুষ্টি উন্নয়নঃ পুষ্টি মানুষের কর্মদক্ষতা বাড়িয়ে দেয়। ফলে মানুষ অধিক সময় ধরে কাজ করতে পারে এবং তার কর্মজীবন দীর্ঘ হয়। পুষ্টির উন্নয়ন মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত।

৬. শিক্ষার সম্প্রসারণ।

৭. নৈতিকতাবোধ জাগ্রতকরণ এবং বিবেক-বিবেচনাবোধ সম্পন্ন মানুষ গঠন, দেশপ্রেমের দীক্ষা গ্রহণ, ব্যক্তিগত দক্ষতা উন্নয়ন এবং উন্নত চরিত্র, শিষ্টাচারের সঠিক অনুশীলনই মানুষকে সম্পদে উন্নীত করে

সমন্বয় (Co-ordination)

সমন্বয়ক : যিনি জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে বিভিন্ন বিভাগের বা কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে অথবা বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন, তাকে সমন্বয় সাধনকারী, সমন্বয়কারী বা সমন্বয়ক বলে। সমন্বয়ক তাকেই বলে যিনি প্রশ্ন উত্তর ও মন্তব্য অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করার পাশাপাশি অন্যান্য কার্যক্রম এবং বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। তিনি জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে সংযোগ সাধন করেন। বিভিন্ন বিভাগের বা কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। যিনি বিভিন্ন প্রশাসনিক কার্যক্রমের মধ্যে সংগতি, সামঞ্জস্য বজায় রেখে লক্ষ্যকে বহুদূর এগিয়ে নিতে পারে তিনি ভাল সমন্বয়ক।

পরিদর্শন বলতে কি বুঝায়?

কোন প্রতিষ্ঠানে গমন করে প্রতিষ্ঠানের কাজের প্রকৃতি, উন্নয়ন, সমস্যা, অবস্থা, উৎপাদন ও সেবা সম্পর্কে ধারণা লাভ করাকে তাকে পরিদর্শন বলে। যেখানে পরিদর্শন করা হয় সেখানে সাধারণ ভাবে উৎপাদন, সংরক্ষণ, ব্যয় নির্বাহ কাগজপত্র, হিসাবনিকাশ, দলিল, হাজিরা, রেকর্ড পত্র রেজিস্টার মূল্যায়ন ও নিরীক্ষা করা এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানই হলো সম্প্রসারণের ভাষায় পরিদর্শন।

পরিদর্শন ধাপ সমূহঃ

১. পরিদর্শন পরিকল্পনা (অনবোর্ড)
২. সম্ভাব্য অফিস ভ্রমণ সূচী প্রস্তুতকরণ
৩. ভ্রমণ সূচী অনুমোদনের জন্য কর্তৃপক্ষের এর নিকট দাখিল
৪. অনুমোদিত ভ্রমণ সূচী মোতাবেক পারিবারিক/বাণিজ্যিক খামারে অথবা প্রতিষ্ঠানে গমণ করে নির্ধারিত ছকে তথ্য সংগ্রহ এবং খামার/প্রতিষ্ঠান মালিককে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান
৫. প্রতিবেদন তৈরি ও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট জমা প্রদান।

দাপ্তরিক কাজের দায়িত্ব পালন সম্পর্কিত বিষয়সমূহ ঃ

১. চাকুরির বিধিবিধান ও রীতি-নীতি মেনে চলা।
২. অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে মনোযোগী হওয়া এবং কর্মক্ষেত্রে কর্মোপযোগী পরিবেশ বজায় রাখা।
৩. কাজের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা।
৪. কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ এবং আন্তরিক হওয়া
৫. যে কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে সময়ে সময়ে তা পর্যালোচনা করা।
৬. অফিসে সময়মত উপস্থিত হওয়া।
৭. গুরুত্বপূর্ণ কাজকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রতিদিনের কাজ প্রতিদিন শেষ করা।
৮. কারও ব্যক্তিগত জীবনের বিষয় কে অফিসের সাথে সম্পৃক্ত না করা।
৯. প্রতিটি কাজে সাবধানতা রাখা
১০. দাপ্তরিক কাজের গোপনীয়তা রক্ষা করা
১১. দায়িত্ব গ্রহণের সময় কাজের পরিধি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া।
১২. অসমাপ্ত কাজের তালিকা প্রণয়ন ও সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা।
১৩. প্রশাসনিক শৃঙ্খলা রক্ষায় সর্বদা সতর্ক থাকা।
১৪. Chain of Command এর বিষয়ে নিজে শ্রদ্ধাশীল হওয়া ও অপরকে উৎসাহিত করা।
১৫. যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অহেতুক তাড়াহুড়া না করা।
১৬. দাপ্তরিক ফাইলনোট, নথি, চিঠিপত্র স্বাক্ষরের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট নির্ভুলভাবে উপস্থাপন করা।
১৭. কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করলে তা সুষ্ঠুভাবে সমাধানের চেষ্টা করা এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা।
১৮. অফিসে বিলম্ব হলে উপযুক্ত কারণ ব্যাখ্যা করা
১৯. দক্ষ ও সৎ কর্মীকে পুরস্কৃত করা।
২০. শিষ্টাচার রীতি-নীতি মেনে চলা।

২১. টীম এর মনোভাব নিয়ে কাজ করা
২২. সহকর্মীদের কাজের গঠনমূলক পরামর্শ প্রদান করা।
২৩. সরকারী পত্র লেখার ক্ষেত্রে যথাযথ ভাষা প্রয়োগ করা।
২৪. নাতিদীর্ঘ পত্র লেখা।
২৫. চিঠি এবং ই-মেইল-এ বিষয়, প্রাপকের নাম ও ঠিকানা সঠিকভাবে লেখা।
২৬. অফিসের আর্থিক ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা
২৭. অফিস চলাকালীন সময়ে জরুরী প্রয়োজনে কর্তৃক নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার অনুমতি নিয়ে অফিস ত্যাগ করা।
২৮. নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার প্রতি অনুগত থাকা
২৯. ভাল কাজের দ্বারা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আস্থা অর্জন করা।
৩০. ঊর্ধ্বতন অফিসার অফিস কক্ষে এলে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করা।
৩১. নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা ডেকে পাঠালে যথা সম্ভব দ্রুত হাজির হওয়া।
৩২. ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বিধি বহির্ভূত নির্দেশনা প্রদান করলে নিজের যুক্তি-বিবেচনা নম্রতা ও শ্রদ্ধাবোধ বজায় রেখে সে কাজ থেকে বিরত থাকা এবং বিনয়ের সাথে অপারগতা প্রকাশ করা।

লাইভস্টক ফিল্ড ফেসিলিটেটর (LFF) এর দায়িত্ব ও কর্তব্য

সুফলভোগীদের নিয়ে সুফলভোগী দল (BG) গঠন ও মবিলাইজেশন করা
সুফলভোগী দল (BG) কে নিয়ে প্রতি মাসে কমপক্ষে ১ বার উঠান বৈঠকের আয়োজন করা।
বৈঠকে উত্থাপিত বিভিন্ন সমস্যাসমূহ সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা
ইউনিয়ন পর্যায়ে টিকা প্রদান, প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান কৃমি দমন ইত্যাদি সেবাসমূহ সম্পাদন করা।
সুফলভোগীদের বিভিন্ন উপকরণ যেমন খাদ্য, হাঁস, মুরগী, ছাগল, ভেড়া এবং ঘাসের বীজ-সার অথবা ঘাসের কাটিং প্রাপ্যতা সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করা ও সংগ্রহে সহায়তা করা
উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সভা ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করা এবং চাহিদামত প্রতিবেদন দাখিল করা।
প্রতিদিনের সম্পাদিত কার্যাদি ও সেবাদানের তথ্যাদি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করা।
উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট সকল দায়িত্ব পালন করা।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিঃ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এক ধরনের একীভূত যোগাযোগ ব্যবস্থা। টেলিযোগাযোগ, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এবং তৎসম্পর্কিত এন্টারপ্রাইজ সফটওয়্যার, মিডলওয়্যার তথ্য সংরক্ষণ, অডিও-ভিডিও সিস্টেম ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত ব্যবস্থা যার মাধ্যমে একজন ব্যবহারকারী খুব সহজে তথ্য গ্রহণ, সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ করতে পারে তাকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বলা হয়।

সরকারি কার্যক্রম বাস্তবায়নে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার :

সরকারি কার্যক্রম বাস্তবায়নে এখন ই-নথি এবং ওয়েবসাইট ব্যবহার করা হচ্ছে। যার ফলে দ্রুত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে। কম্পিউটার, ই-মেইল, স্ক্যানার মেশিন, প্রিন্টার মেশিন, বারকোড রিডার, ই-উপস্থিতি মেশিন, ট্যাবলেট, এনড্রয়েড ও আইওএস স্মার্টফোন ইত্যাদি যন্ত্রপাতি দাপ্তরিক কাজে ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে

যে যন্ত্রগুলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে ব্যবহৃত হয়ঃ

যে যন্ত্রগুলো তথ্য প্রযুক্তিতে ব্যবহৃত হয় তা হলো:
কম্পিউটার, স্মার্টফোন, ট্যাবলেট পিসি,
ডিজিটাল ক্যামেরা, ভিডিও ক্যামেরা,

ওয়েব ক্যাম, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, স্ক্যানার, মাউস, কীবোর্ড, প্রিন্টার, রাউটার, গ্রাফিক্স ট্যাবলেট, প্রেনড্রাইভ, মডেম ইত্যাদি।

কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ঃ

কম্পিউটার বানাতে সংশ্লিষ্ট যেসকল যন্ত্রপাতি অর্থাৎ পার্থিব যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয় যেমন মাদারবোর্ড, প্রসেসর, র‍্যাম, রম, মাউস, কীবোর্ড, মনিটর ইত্যাদিকে বুঝায়

সফটওয়্যারঃ

কম্পিউটারের যন্ত্রপাতিগুলো ব্যবহার করার জন্য এতে যে প্রোগ্রামগুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে বলা হয় সফটওয়্যার। যেমন: আমরা কম্পিউটারে এই বইটি লেখার জন্য একটি সফটওয়্যার ব্যবহার করছি, সেটা হলো মাইক্রোসফট অফিস ২০১৩। এটি একটি প্রোগ্রাম যাকে আমরা এপ্লিকেশন সফটওয়্যার বলি, এই সফটওয়্যারটি ব্যবহার করার জন্য কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার প্রয়োজন হয়

মোবাইল স্মার্ট ফোন এর পরিচিতি, ব্যবহারঃ

স্মার্টফোন হলো ৫ থেকে ৭ ইঞ্চি পরিমাপের ছোট এমন একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র যাতে কম্পিউটারের কাজটি করা সম্ভব।

স্মার্টফোনের ব্যবহারঃ

- ✓ উচ্চমানের ছবি তোলতে স্মার্টফোন ব্যবহার করা হয়।
- ✓ ইন্টারনেট ব্রাউজিং করা যায়,
- ✓ মাধ্যমে ডাটা এন্ট্রি এবং ই-মেইল করা যায়।
- ✓ সামাজিক যোগাযোগ (ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার) মাধ্যম ও ভিডিও (ইউটিউব) শেয়ারিং সাইট ব্যবহার করা যায়।
- ✓ স্মার্টফোনে ঘড়ি, আবহাওয়া বার্তা, ই-বুক পড়া, অনলাইন শপিং, বিভিন্ন গেইম, টিকেট কাটা, রেল টিকেট কাটা, কার্ড প্রসেসিং করা, সংবাদপত্রের অনলাইন ভার্সন ইত্যাদি সংযুক্ত করায় মানুষের জীবন হয়ে উঠেছে আরো সহজ ও আনন্দময়।

ইন্টারনেট পরিচিতি

ইন্টারনেট ঃ

ইন্টারনেট হলো পৃথিবী ব্যাপী বিস্তৃত পরস্পরের সাথে সংযুক্ত অনেকগুলো কম্পিউটার ও সার্ভার নেটওয়ার্কের সমষ্টি যা সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত, ইন্টারনেট প্রটোকল নামের এক প্রামাণ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে এখানে তথ্য আদান প্রদান করা হয়।

ওয়েবসাইট ঃ

ওয়েবসাইট বা ওয়েব সাইট হলো ওয়েব পৃষ্ঠা, ছবি, অডিও, ভিডিও ও অন্যান্য ডিজিটাল তথ্যের সমষ্টিকে বোঝায়, যা ইন্টারনেটের মাধ্যমে অ্যাক্সেস করা যায়। এটি একটি এইচটিএমএল ডকুমেন্ট যা এইচটিটিপি প্রটোকলের মাধ্যমে ওয়েব সার্ভার থেকে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ওয়েব ব্রাউজারে স্থানান্তরিত করে ব্যবহার করে থাকে

ওয়েব ব্রাউজার

ওয়েব ব্রাউজার হলো এমন একটি সফটওয়্যার যার মাধ্যমে একজন ব্যবহারকারী যেকোন ওয়েবপেইজ, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবে অথবা ওয়েবসাইটের যেকোনো লেখা, ছবি এবং অন্যান্য তথ্যের অনুসন্ধান, ডাউনলোড কিংবা দেখতে পারেন। কোনো ওয়েবসাইটে অন্তর্ভুক্ত লেখা এবং ছবি একই অথবা ভিন্ন ওয়েবসাইটের সাথে সংযুক্ত (হাইপারলিংক) থাকলে একটি ওয়েব ব্রাউজার একজন ব্যবহারকারীকে দ্রুত এবং সহজে এইসকল লিংকের মাধ্যমে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে অবস্থিত

অসংখ্য ওয়েবপেইজের সাথে তথ্য আদান-প্রদানে সাহায্য করে। এভাবে ওয়েবপেইজের ভিতরকার লেখা, ছবি, ভিডিও ইত্যাদির মধ্যে চলাচল করাকে ব্রাউজিং বলে।

সাফারি | গুগলক্রোম | মজিলা ফায়ারফক্স | ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার | অপেরা

সার্চ ইঞ্জিন (গুগল, ইয়াহু, আমাজন ইত্যাদি) ও তার ব্যবহার ঃ
ওয়েব সার্চ ইঞ্জিন অনুসন্ধান ব্যবস্থা হল ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের দুনিয়া হতে যে কোনো তথ্য খুঁজে বের করার প্রযুক্তি মাধ্যম সার্চ ইঞ্জিনের মাধ্যমে বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে তথ্য সংগ্রহ করে প্রদর্শন করা হয়ে থাকে।

ই-মেইল একাউন্ট খোলা এবং তার ব্যবহার ঃ ই-মেইল এর বর্ধিত রূপ হলো ইলেক্ট্রনিক মেইল। ইলেক্ট্রনিক মেইল বা ই-মেইল এ চিঠি, ভিডিও বার্তা, অডিও বার্তা, ছবি ইত্যাদি এক ঠিকানা থেকে অন্য ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়া যায় মুহূর্তের মাধ্যমেই। বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন কোম্পানী তাদের সার্ভারের মাধ্যমে এই ই-মেইল সেবা প্রদান করছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: গুগল মেইল, ইয়াহু মেইল এছাড়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইসবুক, টুইটার, ইমো, হোয়াটসএপ ইত্যাদির মাধ্যমেও ই-মেইল পাঠানো যায়। বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে ই-মেইল সম্পর্কে জানা ও ব্যবহার করা খুবই জরুরী।

নেতৃত্ব, জেন্ডার ও নারীর ক্ষমতায়ন

নেতার সংজ্ঞা:
সাধারণতঃ একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য জনগণকে যিনি পরিচালনা করেন তিনিই নেতা। পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রেখে একটি সংগঠিত গোষ্ঠী বা দলকে তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে যিনি পথ চলার অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন, সহযোগীদের উৎসাহ-উদ্দীপনা যোগান এবং সর্বোপরি পরিচালনা করেন তাকেই নেতা বলে।

নেতার কাজ:
- দলের প্রতিনিধি হয়ে কাজ করা।
- দলের ঐক্য ও আদর্শ রক্ষা করা।
- দলের উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণে মুখ্য ভূমিকা পালন করা।
- দলের সাংগঠনিক কাজ পরিচালনা করা।
- দলের নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে সহায়তা করা।
- দলের চাহিদা নির্ধারণ করা।
- দলের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা
- আর্থিক লেনদেন ও হিসাব রাখতে সাহায্য করা।
- দলের সভা পরিচালনা করা।
- দলের কাগজপত্র ও সম্পদ রক্ষা করা
- সদস্যদের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখা।

আদর্শ নেতার গুণাবলী:
১। সংগঠনের প্রতি দায়িত্বশীল হতে হবে।
২। নীতিবান ও সৎ হতে হবে।
৩। বুদ্ধিমান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে যোগ্য হতে হবে।
৪। শক্ত মনোবল সম্পন্ন হতে হবে।
৫। সাহসী হতে হবে।
৬। আত্মসমালোচক হতে হবে
৭। সহযোগী মনোভাবাপন্ন হতে হবে।
৮। পরিবর্তন গ্রহণের মানসিকতা থাকতে হবে।
৯। মিশুক বা বন্ধুভাবাপন্ন হতে হবে।
১০। ভাল চরিত্রের অধিকারী হতে হবে।

নেতৃত্ব:

নেতৃত্ব হচ্ছে একজন নেতার এমন কর্ম প্রক্রিয়া, যা দ্বারা তিনি তার দলীয় সদস্যদের পরিচালনা করে দলের লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করেন।

নেতৃত্বের ধরণ ঃ

ক) একনায়কত্ব বা স্বৈরাচারী নেতৃত্ব

খ) অংশগ্রহণমূলক বা গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব

নেতৃত্ব ব্যবস্থাপনা:

নেতার দায়িত্ব হচ্ছে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো। এই দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি লোকজন ও সুবিধাদি সংগঠিত করেন এবং সদস্যদেরকে কাজে নিয়োজিত করেন। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত সদস্যরা তাদের সর্বাত্মক চেষ্টা প্রয়োগ না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য এসব পদক্ষেপ যথেষ্ট নয়।

- ✓ একজন নেতা নির্বাচিত হন
- ✓ সদস্যদের সুবিধাদি সংগঠিত করা
- ✓ সদস্যদের দায়িত্ব নিয়োজিত করা
- ✓ সদস্যদের আচরণ পরিবর্তনে সহায়তা করা।
- ✓ সমিতির প্রতিনিধিত্ব করা।
- ✓ সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন করা।

জেন্ডার ও লিঙ্গ ঃ

সমাজে নারী ও পুরুষের মধ্যকার বিদ্যমান পার্থক্যকে চিহ্নিত করতে সমাজবিজ্ঞানীরা জেন্ডার শব্দটিকে ব্যবহার করেন। আর তাই জেন্ডার এবং লিঙ্গকে আপাতঃ দৃষ্টিতে সমার্থক মনে হলেও এর ব্যবহারিক পার্থক্য অনেক।

লিঙ্গ ও জেন্ডার:

লিঙ্গ বা সেক্স হচ্ছে প্রাকৃতিক বা জৈবিক কারণে সৃষ্ট নারী-পুরুষের বৈশিষ্ট্যসূচক বিভিন্নতা বা শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নারী ও পুরুষের স্বতন্ত্রতা কিংবা শরীরবৃত্তীয়ভাবে নির্ধারিত নারী পুরুষের বৈশিষ্ট্য। যা জন্মগত এবং অপরিবর্তনীয়। জেন্ডার হচ্ছে সামাজিকভাবে গড়ে ওঠা নারী-পুরুষের পরিচয়; সামাজিকভাবে নির্ধারিত নারী পুরুষের সম্পর্ক, সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত নারী পুরুষের ভূমিকা যা পরিবর্তনীয় এবং সমাজ সংস্কৃতি ভেদে বিভিন্ন হয়ে থাকে।

নারীর ক্ষমতায়ন

সামাজিক অসমতা ও বৈষম্য দূরীকরণে নারীকে পুরুষের সমকক্ষতায় সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার নামই নারীর ক্ষমতায়ন। নারীর ক্ষমতায়ন করতে প্রথম দুটি বিষয় বিবেচ্য- (১) নারীর অবস্থা ও (২) নারীর অবস্থান। নারীর অবস্থা বলতে বুঝায় নারীর বস্তুগত অবস্থা, যেমন পুষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও উপার্জন দ্বিতীয়ত নারীর অবস্থান বলতে বুঝায়, সরাসরি ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ, সম্পদের মালিকানা, অধিকতর পছন্দ অপছন্দ, অগ্রাধিকার, মর্যাদা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়নেনারীর অংশগ্রহন নিজের সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রভাবিত করার অধিকার সক্ষমতা ও যোগ্যতা এবং ন্যায্য সুযোগ অর্জন।

নারীর ক্ষমতায়নে জন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় নারীর সরাসরি অংশ গ্রহন নিশ্চিত করতে হবে।

এই প্রক্রিয়ায় রয়েছে ঃ

ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় নারী

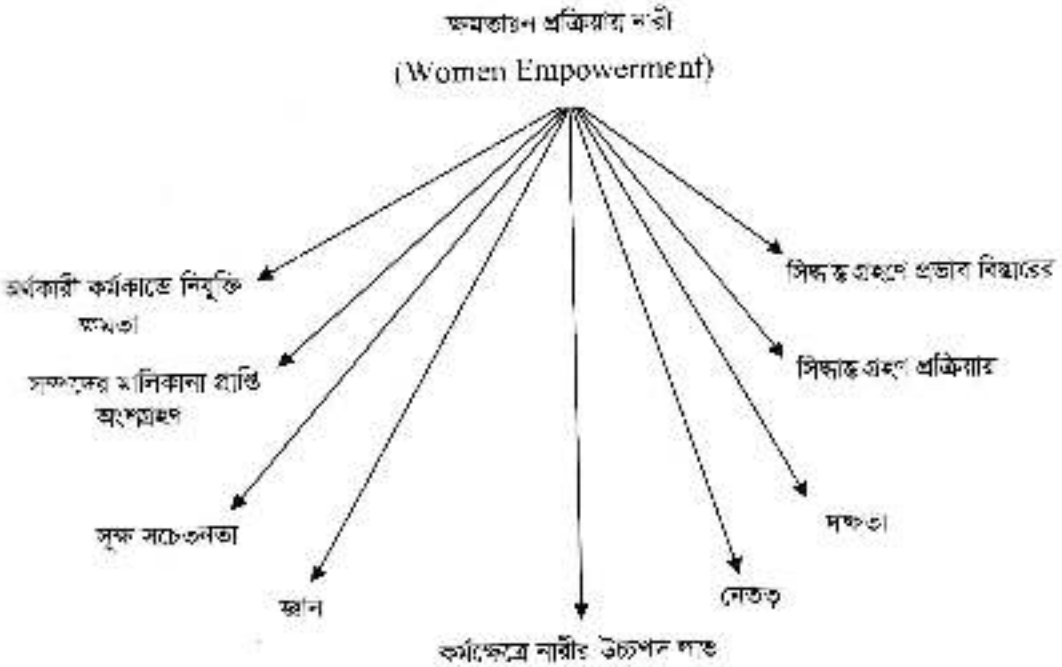

নারীর ক্ষমতায়নে বাধা

নারীর ক্ষমতায়নে কিছু বাধা রয়েছে। নারীকে ও এ বাধাগুলোকে অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে হবে। নারীর ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্য বাধা হচ্ছে ঃ

১. হীনমন্যতায় ভোগা
২. জ্ঞানের অভাব
৩. দক্ষতার অভাব
৪. সমাজের বিরূপ মনোভাব
৫. চিরাচরিত কাজ এবং ভূমিকা
৬. নেতৃত্বের অভাব
৭. শারীরিক অবস্থা
৮. আত্ম সম্মান বোধ
৯. আত্ম বিশ্বাসের অভাব
১০. পরনির্ভরশীলতা
১১. চিরাচরিত পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ

দল গঠন ও সংগঠন ব্যবস্থাপনা

দল

দল বলতে একই শ্রেণীর বা পেশার অথবা একই গোত্রের কয়েকজন মানুষ মিলিত হয়ে নিজের উন্নয়নের জন্য সংঘবদ্ধ কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করাকে বুঝায়। কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে কাজ করার জন্য সমমনা কিছু লোকের সমষ্টিকে দল বলে। কোন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সাধারনত একটি বড় দলকে পরিচালনা করা কষ্টসাধ্য। তাছাড়া দল বড় হলে দলের প্রত্যেক সদস্যের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায় না। পাশাপাশি সহায়তাকারী প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর সাথে ঘনিষ্টভাবে থেকে শেখাতে পারেন বা সহায়তা করতে পারেন

দলের উদ্দেশ্য

অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ঃ

- সঞ্চয়ী মনোভাব সৃষ্টি করা।
- ঋণদানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- আয় করার জন্য সম্পদ সংগ্রহনের সুযোগ সৃষ্টি করা।

সামাজিক উদ্দেশ্য ঃ

- ✓ দলের মধ্যে পারস্পরিক সম্মান ও একতা বৃদ্ধি করা ও সমাজে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় কাজ করা
- ✓ দারিদ্রের কারণ চিহ্নিত করা ও আর্থ সামাজিক স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য সচেতনতা সৃষ্টি করা
- ✓ দলের সদস্য/সদস্যাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করা
- ✓ প্রাতিষ্ঠানিক নির্ভরতা কমানো।
- ✓ নিজের সংগঠন করা
- ✓ দলের ঋণ কার্যক্রম গ্রহণ করা।
- ✓ এলাকার সামাজিক উন্নয়ন করা।
- ✓ দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
- ✓ নিজেদের উন্নয়ন করা।

সদস্য হওয়ার যোগ্যতাঃ

১. কোন নির্দিষ্ট এলাকায় নির্দিষ্ট সংখ্যক জনগণ একমত হয়ে যখন দল গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, সেই সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।
২. সদস্য হতে হলে অবশ্যই দলের কর্ম এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।
৩. কমপক্ষে ১৮ বছর থেকে উপার্জনক্ষম বয়সের নারী ও পুরুষ হতে হবে।
৪. আবেদনকারী যদি বছরে ১২ মাস পর্যন্ত প্রাণিসম্পদ নির্ভর এবং কায়িক শ্রম বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে (সেইসব পরিবারের পুরুষ, মহিলা ও যুবক, যুবতী) তারাই দলের সদস্য হতে পারবে।
৫. আবেদনকারী যদি গৃহিনী হয় দল করার জন্য উক্ত আবেদনপত্রে অবশ্যই স্বামী বা অভিভাবকের সম্মতি থাকতে হবে
৬. আবেদনকারীকে মানসিক ও শারীরিকভাবে সুস্থতার অধিকারী হতে হবে।
৭. আবেদনকারীকে নিয়মিত নির্দিষ্ট হারে সঞ্চয় জমা দিতে এবং নিয়মিত সভায় উপস্থিত থাকতে সম্মত থাকতে হবে।
৮. আবেদনকারী অন্য সংস্থার বা কোন দলের সদস্য হতে পারবে না।
৯. কোন পরিবার থেকে একাধিক ব্যক্তি একই দলের সদস্য/সদস্যা হতে পারবে না
১০. দলের সদস্যদের সমমনা, সমপ্রকৃতির (পেশা, সংস্কৃতি ইত্যাদি) এবং একই রকম সামাজিক অবস্থান বাঞ্ছনীয়।
১১. পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার মনোভাব থাকতে হবে।

১২. দলীয় নিয়ম কানুন মেনে চলার আগ্রহ থাকতে হবে।
১৩. আত্মনির্ভরশীলতার বিশ্বাসী হতে হবে।

দল ব্যবস্থাপনা:

- ❖ এমন একটি কার্য ব্যবস্থাকে বুঝায় যার মাধ্যমে দলসমূহ সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালিত হয়
- ❖ দল যে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির দ্বারা পরিচালিত হয় তাকে দল ব্যবস্থাপনা বলে।
- ❖ যে প্রক্রিয়া দলের প্রতিটি কর্মকান্ডকে পরিচালিত করে তাকেই দল ব্যবস্থাপনা বলে
- ❖ দলের লক্ষ্য অর্জনের জন্য দল যেভাবে কাজ করে/ পরিচালিত হয় তাই দল ব্যবস্থাপনা।

দল ব্যবস্থাপনা কাঠামো

দলের ব্যবস্থাপনার কাঠামোকে সাধারণতঃ ২ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমনঃ

১) সাধারণ সদস্য
২) কার্য -নির্বাহী পরিষদের সদস্য

১) সাধারণ সদস্য: দলের প্রত্যেক সদস্যই হচ্ছেন সাধারণ সদস্য প্রত্যেক সদস্যদের সমান অধিকার আছে। দলের বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাও সাধারণ সদস্য। এক কথায় সাধারণ সদস্য বলতে আমরা বুঝি একটি দলের প্রত্যেক সদস্যকে।

২) কার্য নির্বাহী পরিষদের সদস্য: দলের সকল সদস্য মিলে বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য নিয়ে যে কমিটি গঠন করা হয় তাদেরকে কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য বলা হয়। এদের দায়িত্ব হলো দলকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা। এই পরিষদের সদস্যরা তাদের কাজের জন্য অন্য সদস্যদের কাছে দায়বদ্ধ থাকে। দলের বিধিমালার উপর নির্ভর করবে কার্যনির্বাহী পরিষদ। মেয়াদকাল শেষ হলে সদস্যদের ভোটে পুনরায় কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করা হয়।

দল পরিচালনার কৌশল ঃ

- ✓ দল পরিচালনার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে সম্মত থাকা
- ✓ দলের সহকর্মীদের সাহায্য করার মনোভাব থাকা।
- ✓ সাফল্যের জন্য দলের সদস্যদের স্বীকৃতি দেয়
- ✓ সাফল্যের সুনাম সকলের মধ্যে ভাগ করে নেওয়া।
- ✓ সহকর্মীদের সাথে সব সময় নিজের কাজের সমন্বয় করা।
- ✓ দলের সদস্য হিসেবে কাজ করতে অবশ্যই পছন্দ করতে হবে।
- ✓ গণতান্ত্রিক দল ব্যবস্থাপনার প্রতি বিশ্বাস
- ✓ দলের ঐক্য বজায় রাখা ইত্যাদি।

দলের গঠনতন্ত্র তৈরীর নিয়মাবলী:

- ✓ দল গঠন হওয়ার প্রথম বছরের মধ্যেই গঠনতন্ত্র তৈরী করা প্রয়োজন।
- ✓ সভায় গঠনতন্ত্র তৈরীর জন্য সহায়ক প্রশ্নাবলী নিয়ে আলোচনা করা দরকার।
- ✓ উন্নয়নকর্মী সরাসরি প্রশ্নের উত্তর বলে দেবেন না। তাঁরা নিজেরা যাতে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পান সে জন্য সাহায্য করবেন
- ✓ প্রত্যেক সদস্য যাতে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর সময় নিয়ে চিন্তা করে দিতে পারেন সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।
- ✓ কোন প্রশ্ন বোঝা না গেলে উন্নয়নকর্মী উদাহরণসহ প্রশ্নের উত্তর বুঝিয়ে দিবেন।
- ✓ দলীয় সভায় অধিকাংশ সদস্য যেন উপস্থিত থাকেন সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।
- ✓ সবাই একমত হয়ে যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্নের উত্তর লিখবেন।

- ✓ যে কোন একজন লেখাপড়া জানা সদস্য প্রশ্নপত্র পূরণ করবেন।
- ✓ দলীয়ভাবে যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে গঠনতন্ত্রটি চূড়ান্ত রূপ লাভ করবে
- ✓ চূড়ান্ত গঠনতন্ত্রের শেষ পৃষ্ঠায় প্রত্যেক সদস্যের সম্মতিসূচক স্বাক্ষর থাকবে।

রেজিস্ট্রেশন

রেজিস্ট্রেশন হলো তালিকাভুক্তিকরণ। নির্দিষ্ট আইনের অধীনে তালিকাভুক্ত হলে এটি সরকারের একটি অংশে পরিণত হয়।

রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজনীয়তা

- ✓ রেজিস্ট্রেশন হলো একটি সরকারী স্বীকৃতি।
- ✓ ক্লাব বা সমিতি পরিচালনায় জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও উপযুক্ত হিসাব সংরক্ষণে বাধ্যবাধকতা থাকবে।
- ✓ সংগঠনের রেজিস্ট্রেশন থাকলে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা হতে আর্থিক সহায়তা, অনুদান ইত্যাদি পাওয়া সহজ হয়।
- ✓ যতদিন আইনের বিধান অনুযায়ী বিলুপ্তি না ঘটে ততদিন এর অস্তিত্ব বজায় থাকবে

রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য:

সমবায় সমিতি আইন ২০০১ এর আওতায় রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রয়োজনীয় দলিল দস্তাবেজ।

১। সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ এর ৫ নং বিধি অনুযায়ী ফরম নং-১ অনুসারে রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন পত্র। (ন্যূনতম ২০ জন সদস্যের স্বাক্ষরসহ, প্রত্যেকের বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর এবং প্রতি সদস্যের কমপক্ষে ৪০ শতাংশ জমি থাকতে হবে।)
২। প্রাথমিক সমিতি হিসেবে রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ ৩০০/- টাকার ট্রেজারী চালান।
৩। সমিতির নাম হবে প্রাণিসম্পদ সমবায় সমিতি।
৪। প্রথম সাধারণ সভার রেজুলেশন। সমিতির নামকরণ, সদস্য সংখ্যা, ২টি আর্থিক বছরের বাজেট, কোন ব্যাংকে একাউন্ট খোলা হবে ও কে/কারা পরিচালনা করবে তা রেজুলেশনে থাকতে হবে।
৫। ব্যাংক একাউন্ট।
৬। সমিতির ৩ (তিন) কপি উপ আইন (গঠনতন্ত্র)
৭। প্রাথমিক সমিতি হিসাবে ৩০০০/- টাকার পরিশোধিত শেয়ার এবং ৩০০০/- টাকার সঞ্চয় দেখাতে হবে এবং মূলধন সংক্রান্ত শেয়ার হোল্ডারদের তালিকা। (প্রতি সদস্যকে শেয়ার কিনতে হবে)
৮। প্রাথমিক সমবায় সমিতি পরিচালনার জন্য পরবর্তী ২ সমবায় বর্ষের বাজেট।
৯। কার্যনির্বাহী কমিটি ৬, ৯ বা ১২ সদস্য বিশিষ্ট অর্থাৎ ৩ দ্বারা বিভাজ্য হতে হবে।
১০। সদস্যদের পরিচিতি হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সনদপত্র।
১১। দুই বছর অন্যের সাহায্য ছাড়া সমিতি পরিচালনার অঙ্গীকারনামা।

পশু-পাখির রোগ দমন ও জীবনিরাপত্তা

পশু-পাখির রোগ দমনের মূলনীতি:

১. প্রতিরোধ: খামারে রোগ হতে না দেয়া। যেমন: টীকা প্রদান
২. রোগ দমন/ হ্রাসকরণ: যেমন খামারে রোগের বিস্তারকে কমিয়ে নিয়ে আসা।
৩. রোগ অপসারণ: রোগের ব্যাপকতাকে এমন পর্যায়ে কমিয়ে নিয়ে আসা যেখানে লক্ষে ১ টি পশু /পাখি রোগে আক্রান্ত হয়।
৪. নির্মূল/উচ্ছেদ : রোগের ব্যাপকতাকে শূন্যের কোঠায় নামিয়ে নিয়ে আসা/ চিরতরে নির্মূল করা।

১) রোগের ধারকের নিয়ন্ত্রণঃ

ক) প্রাথমিক পর্যায়ে দ্রুত রোগ নিয়ন্ত্রণের প্রথম ধাপ

খ) স্থানীয় স্বাস্থ্য- প্রশাসন ও কর্মীর মাধ্যমে কোন রোগকে নোটিশ করা

গ) ইপিডেমিওলজিক্যাল পর্যবেক্ষন-

- ✓ সংক্রমনের উৎস নির্ণয়করণ
- ✓ সংক্রমনের উপাদান চিহ্নিতকরণ, যেমন- পরিবেশ, জনসংখ্যা

ঘ) পৃথকিকরণঃ রোগ বিস্তারের সময়ে রোগ আক্রান্ত পশু-পাখিকে পৃথক করে রাখা।

ঙ) চিকিৎসাঃ চিকিৎসার মাধ্যমে জীবানুকে ধ্বংস করা।

চ) সঙ্গ নিরোধঃ রোগ নিয়ন্ত্রনের জন্য সম্ভাব্য রোগ আক্রান্ত (অনুমেয়) পশু-পাখিকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পৃথক করে রাখা

২) রোগ বিস্তারে বাধা প্রদানঃ

রোগ বিস্তারের চেইনকে ভেঙে ফেলা -

রোগের উৎসঃ

- ❖ পশু থেকে পশু
- ❖ পরিবেশ- মাটি, পানি, খাদ্য
- ❖ পশু থেকে মানুষ
- ❖ মানুষ থেকে পশু

৩) সংক্রামক রোগ ছড়ানোর মাধ্যমঃ

১. স্পর্শঃ বেশকিছু রোগ এভাবে ছড়ায়। যেমন: চোখ, ছত্রাকজনিত চর্মরোগ।

২. যৌন সংস্পর্শঃ এইডস, সিফিলিস, গনোরিয়া, হেপাটাইটিস (বি, সি), হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস ইনফেকশন যেটি জরায়ু মুখ ক্যান্সারের অন্যতম কারণ, লিম্ফোগ্রানুলোমা ভেনেরিয়াম।

৩. খাদ্য ও পানীয়ঃ টাইফয়েড, পোলিওমাইলাইটিস, হেপাটাইটিস (এ, ডি), কলেরা, ডায়রিয়া, আমাশয়, বিভিন্ন কৃমি সংক্রমণ।

৪. বায়ুবাহিতঃ যক্ষা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হুপিংকাশি, মেনিনজাইটিস, নিউমোনিয়া, ব্রংকাইটিস, ব্রংকিওলাইটিস, মাম্পস, কলেরা, হাম।

৫. ভেক্টরবাহিতঃ মশা-ডেঙ্গি, চিকুনগুনিয়া, ইয়েলোফিভার, ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়াসিস। মাছি উদরাময়, আমাশয়, কৃমি সংক্রমণ, কালাজ্বর

রোগ বিস্তারের পথ নির্ণয় ও প্রতিরোধ

- ❖ বাহক নির্মূলকরণ
- ❖ আক্রান্ত পশু-পাখির সংস্পর্শে না আসা
- ❖ দূষিত খাবার পানি থেকে দূরে থাকা
- ❖ ব্যক্তিগত সচেতনতা
- ❖ পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা করা

সংবেদনশীল পোষক ব্যবস্থাপনা ঃ

- ➢ টিকা প্রদান- প্রত্যক্ষ/ সক্রিয় টীকা- দীর্ঘমেয়াদী, যেমন- ক্ষুরা রোগের টীকা
- ➢ পরোক্ষ টিকা- স্বল্প মেয়াদী, যেমন- এটিএস
- ➢ রোগ পর্যবেক্ষনঃ
- ➢ প্রাণীর স্বাস্থ্য, উৎপাদন এবং রোগের নিয়মিত ও চলমান পর্যবেক্ষন
- ➢ পরিকল্পিত রোগ পর্যবেক্ষণ খামার ব্যবস্থাপনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান

নজরদারিকরণ: (কর্মপরিকল্পনার জন্য তথ্য সংগ্রহ)
রোগ প্রতিরোধ ও দমনের উদ্দেশ্যে রোগের এবং সংক্রমণের চলমান যাচাই- বাছাইকরণ

নজরদারির লক্ষ্য সমূহ-
১. দ্রুত রোগের প্রাদুর্ভাব নির্ণয়
২. প্রাথমিক রোগ নির্ণয়
৩. নির্দিষ্ট জনসংখ্যার মাঝে স্বাস্থ্যগত অবস্থা নির্ণয়
৪. রোগ প্রতিরোধ ও দমনে ক্রমান্বয়ীকরণ
৫. নতুন উদ্ভাবিত রোগ নির্ণয়
৬. রোগ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম মূল্যায়ন

বায়োসিকিউরিটি বা জীব নিরাপত্তা কী?

বায়োসিকিউরিটি বা জীব নিরাপত্তা ব্যবস্থা হচ্ছে একটি যৌথ ব্যবস্থাপনা যা নানা ধরনের কাজকর্মের মাধ্যমে একটি খামারের মধ্যে অথবা আন্তঃখামারের মধ্যে অথবা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে রোগ জীবাণুর বিস্তার প্রতিরোধ করে। বায়োসিকিউরিটি হলো প্রথম লাইনের প্রতিরক্ষা যা খামারে প্রবেশ করা নতুন রোগ প্রতিরোধ করে তাই বায়োসিকিউরিটি লঙ্ঘন হলে খামারে রোগের প্রবর্তনের ফলে আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।
খামারের জীব নিরাপত্তা বজায় রাখতে করনীয়-

- গবাদিপ্রাণির সংখ্যা অনুপাতে পর্যাপ্ত জায়গাসহ বাসস্থান তৈরী করতে হবে।
- গবাদিপ্রাণির বাসস্থান শুকনো এবং পর্যাপ্ত আলো-বাতাসযুক্ত স্থানে তৈরি করতে হবে। স্যাঁতস্যাঁতে অবস্থা মুক্ত রাখা।
- গবাদিপ্রাণির খামার বন্য প্রাণি বা অন্যান্য আক্রমনকারী প্রাণির হাত হতে সুরক্ষিত হতে হবে।
- খামারে অনুপ্রবেশ সংরক্ষিত হতে হবে।
- খামারে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে
- খামারের খাদ্য গুদাম আধুনিক হতে হবে
- খামারের খাবার পাত্র, পানির পাত্র প্রতিদিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- খামারে রোগ নিরোধের জন্য কোয়ারেন্টাইন কক্ষ রাখা গেলে রোগ ব্যবস্থাপনার বিশেষ উন্নয়ন নিশ্চিত করা যাবে
- নতুন গবাদিপ্রাণির খামারে সংযোজন করার ক্ষেত্রে কোয়ারেনটাইন করে প্রয়োজনীয় টিকা প্রদান করে অন্য গবাদিপ্রাণির সাথে মিশতে দিতে হবে
- খামারের কোন প্রাণি অসুস্থ হলে তাকে আইসোলেশন করে রেখে চিকিৎসা করাতে হবে।
- খামারের গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগীকে নিয়মিত টিকা প্রদান করতে হবে।
- কোন গবাদিপ্রাণির মৃত্যু হলে তার সঠিক ডিসপোজাল ও ডিসইনফেকশন নিশ্চিত করতে হবে
- বিশুদ্ধ ও জীবাণুমুক্ত পানি ও খাবার সরবরাহ করা।
- খামারের বাসস্থান, যন্ত্রপাতি, ব্যবহার্য উপকরণ নিয়মিত পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
- পোকামাকড় ধ্বংস করা।
- জীবাণু ধ্বংসের বিভিন্ন পদ্ধতি যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করা।
- খামারে ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত পোশাক ও জুতা জীবাণুমুক্ত করে পরিধান করতে হবে।
- বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন খামারের জীব-নিরাপত্তা উন্নয়নে এবং জ্বালানী খরচ সাশ্রয়ে ভূমিকা রাখবে
- মুরগীর খামারে অল ইন অল আউট পদ্ধতি নিশ্চিত করতে হবে। খামারে ২টি ব্যাচের মুরগি একই সাথে পালন করা যাবে না।
- খামারের প্রবেশপথে ফুটবাথ থাকতে হবে যাতে এন্টিসেপটিক মিশ্রিত পানি থাকতে হবে।
- খামারের অভ্যন্তরে মৃত মুরগির পোস্টমরটেম পরীক্ষা করা যাবে না। পোস্টমরটেম পরীক্ষা অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ান দ্বারা রোগ নির্ণয় কেন্দ্রে করাতে হবে।
- ভেটেরিনারিয়ান ব্যতীত অন্য কারো দ্বারা প্ররোচিত হয়ে খামারে ঔষধ প্রয়োগ করা যাবে না।

জীবাণুমুক্ত করনের উদ্দেশ্য

- বিভিন্ন প্রকারের রোগ বালাই প্রতিরোধ করা।
- রোগবালাই জনিত ক্ষতি হ্রাস করে খামারকে লাভজনক পর্যায়ে উন্নিত করা।

কুল বক্স

জীবাণুমুক্ত করনের বিভিন্ন পদ্ধতি ঃ

ফিউমিগেশন

সংরক্ষিত ফরমালিন ও পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট মিশিয়ে বিষাক্ত ধোঁয়া তৈরি করে জীবাণুনাশ করার পদ্ধতিকে ফিউমিগেশন বলে।

প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ঃ

- প্রতি ১০০ বর্গফুট জায়গার জন্য-
- ফরমালিন- ৫২.৫ গ্রাম,
- পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট- ১০৫ গ্রাম
- মাটির পাত্র- যে পরিমান ঔষধ হবে তার দ্বিগুন বেশি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ও চ্যাপ্টা হবে।

পদ্ধতি ঃ

- ঘরের জানালা দরজা ভালভাবে বন্ধ করে নিতে হবে।
- যে ব্যক্তি ফিউমিগেশন করবেন তাকে রাবারের হাতমোজা ও মুখে মাস্ক পরে নিতে হবে।
- মাটির পাত্রে ফরমালিন দিয়ে তাতে পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট মিশাতে হবে।
- এ অবস্থায় ২৪ ঘন্টা রেখে দিতে হবে।
- তারপর ঘরের জানালা দরজা খুলে দিতে হবে এবং ধোয়া সম্পূর্ণ রূপে বের হলে ঘরটি ব্যবহার করতে হবে

ফুটবাথ ব্যবহার ঃ

খামারের ঢোকার পথে জীবাণুনাশক দিয়ে পা ধৌত করণের পদ্ধতিকে ফুটবাথ বলে।

প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ঃ

পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট- ০.০১% দ্রবণ

পদ্ধতি ঃ

- খামারে ঢোকার পথে আয়তাকার ৩-৪ ইঞ্চি গভীর গর্ত করে সিমেন্ট দিয়ে আস্তর দিতে হবে।
- এই গর্তে ০.০১% পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট দ্রবণ ঢেলে দিতে হবে।
- খামারে প্রবেশকারী এই দ্রবণে পা ডুবিয়ে খামারে প্রবেশ করবে।
- এই পদ্ধতি জুতা বা পায়ে লেগে থাকা রোগজীবাণু ধ্বংস হয়।

কুল ভ্যান

টীকাবীজ প্রয়োগ ও রোগ প্রতিরোধ ঃ

গবাদিপশু ও হাঁস মুরগি প্রতিপালনের অন্যতম সমস্যা রোগ-বালাই। গবাদিপশু ও হাঁস রোগে আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে গৃহীত পদক্ষেপকে রোগ প্রতিরোধ বলা হয়। পশুপাখি অসুস্থ হওয়ার পর তাদেরকে আরোগ্য করতে চিকিৎসা ও ঔষধ ব্যয়তো আছেই, তদুপরি স্বাস্থ্য পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনাও কষ্টসাধ্য। সেজন্য স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থাপনা ও সুষম খাদ্য খাওয়ানোর পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধের টীকাবীজ দেয়া উচিৎ। পশুপাখির রোগ প্রতিরোধক টীকাবীজ বাংলাদেশেই পাওয়া যায়। প্রাণিসম্পদ বিভাগ মুক্ত এবং ভ্যাক্সিন উৎপাদন করে, তবে কিছু কিছু ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানী সরকারের পূর্বানুমতি নিয়ে কিছু কিছু রোগের ভ্যাকসিন আমদানী করে থাকে।

টিকার বিভিন্ন প্রকারভেদঃ

প্রস্তুত পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে টিকাকে প্রধানত ৩ শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা-

১) জীবিত টিকা	২) তেজহ্রাসিত টিকা	৩) নিষ্ক্রিয় বা মৃত টিকা
➢ জীবিত জীবাণু ব্যবহার করা হয়। ➢ অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করতে হয় ➢ দীর্ঘস্থায়ী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হয়। ➢ অপেক্ষাকৃত সস্তা।	➢ জীবাণুর তেজ হ্রাস করে এই টিকা তৈরি করা হয়।	➢ জীবাণুকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে নিষ্ক্রিয় করা হয়। যেমনঃ তাপ, রাসায়নিক পদার্থ ইত্যাদি। ➢ অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ➢ রোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকে।

টিকার বৈশিষ্ট্যঃ

- ❖ উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন অ্যান্টিজেনিসিটি।
- ❖ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া মুক্ত।
- ❖ দীর্ঘ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন।
- ❖ দামে সাশ্রয়ী

টিকাদান কর্মসূচিঃ

বিপুল পরিমান গবাদি-পশুকে একত্রে কোন একটি খোলা স্থানে অথবা খোলা মাঠে কোন একটি নির্দিষ্ট অথবা একাধিক টিকা প্রদান করাকে ভ্যাকসিনেশন কর্মসূচি বলে।

ভ্যাকসিন কার্যকর না হওয়ার কারণঃ

- ➢ যে রোগের টিকা দেওয়া হয় যদি পশু সেই রোগের জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে।
- ➢ কোন পশু বংশগত কারণে টিকার প্রতিরোধ গড়তে ব্যর্থ হতে পারে।
- ➢ অত্যাধিক পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত হলে
- ➢ মৃত টিকা বীজ বা মেয়াদ উত্তীর্ণ টিকায় পর্যাপ্ত প্রতিরোধ শক্তি সৃষ্টি করতে পারে না।
- ➢ নির্দেশমত টিকা সংরক্ষণ স্থানান্তর ও প্রয়োগ না হলে।
- ➢ ব্যবহৃত টিকার জীবাণু স্ট্রেইন ও পশুর আক্রান্ত জীবাণুর স্ট্রেইনের পার্থক্য হলে।

টিকাবীজ পরিবহন ঃ

পরাধিকাংশ সাধারণত গ্রামাঞ্চলে পালন করা হয় টিকা উৎপাদন কেন্দ্র বা বিক্রয় কেন্দ্র থেকে খামারগুলো বেশ দূরে অবস্থিত যেহেতু পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা টিকা সংরক্ষণ তাপমাত্রার চেয়ে বেশি তাই পরিবহণকালে সংরক্ষণ তাপমাত্রা ঠিক রাখতে কুলভ্যান, কুলবক্স বা থার্মোফ্লাস্কে বরফসহ বহন করতে হয়। এটা cool-chain রক্ষা করার জন্য সকল টিকার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বরফ ছাড়া বহন করা টিকা ব্যবহারে কোন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠে না। তাই পশুপাখিকে এ টিকা প্রদানের পরও একই রোগে এরা আক্রান্ত হতে পারে। তাই টিকাবীজ পরিবহণের সময় নির্দিষ্ট নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে। এখানে টিকা পরিবহণের নিয়মকানুন বর্ণনা করা হয়েছে। যথা–

১. টিকাবীজ পরিবহণের সময় থার্মোফ্লাস্কে বরফ দিয়ে একস্থান হতে অন্যস্থানে স্থানান্তর করতে হয়। এভাবে টিকাবীজ ১২ ঘন্টা পর্যন্ত সরবরাহ নেয়া যায়। তবে, বেশি সময়ের জন্য একস্থান হতে অন্যস্থানে নেয়ার সময় পথিমধ্যে আবার বরফ দিয়ে নিতে হবে।
২. বিদেশ থেকে আমদানির সময় শুষ্ক বরফ দিয়ে ভালভাবে টিকাবীজ প্যাকিং করতে হবে। প্যাকিংকৃত টিকাবীজ জাহাজের শীতল কক্ষে (cool room) রেখে স্থানান্তর করা হয়।

৩. থার্মোফ্লাস্ক বা কুলবক্সে করে বেশি সময় ধরে পরিবহনের সময় বরফ গলে যেতে পারে। তাই এসব ক্ষেত্রে পানি ফেলে আবার বরফ ভরে নিতে হবে। টিকা প্রয়োগের জন্য বহন করা টিকা সঠিক তাপমাত্রায় দেয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কুলবক্স বা ফ্লাস্কে রাখতে হবে।

৪. টিকা কুলবক্সের বা ফ্লাস্কের বাহিরে বের করে থয়িং (thawing) বা সঠিক তাপমাত্রায় আনার জন্য টিকা বের করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কুলবক্সে বা ফ্লাস্কে সংরক্ষণ করতে হবে।

৫. টিকার সঠিক পরিবহনের উপর নির্ভর করে এর অপচয় ও খাটতি। খুব কম সময়ের জন্য টিকা বীজ সরবরাহের সময়ও থার্মোফ্লাস্কে বরফ দিয়ে স্থানান্তর করা হবে।

টিকাবীজ সংরক্ষণ ঃ

প্রতিটি টিকার জন্য একটি নির্দিষ্ট সংরক্ষণ তাপমাত্রা আছে। ভুল সংরক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে সংরক্ষিত টিকা ব্যবহার করলে তা নির্দিষ্ট রোগের বিরুদ্ধে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে পারে না। টিকা প্রস্তুত প্রক্রিয়া অনুযায়ী টিকাবীজকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে

ক. হিমশুষ্ক (freeze dried) - সাধারণত হিমশুষ্ক টিকা ২°-৮° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ব্যবহারের পূর্ব পর্যন্ত রাখতে হয়।

খ. তরল সাসপেনশন (liquid suspension)- তরল টিকা ৪°-৮° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ব্যবহারের পূর্ব পর্যন্ত রাখতে হয়।

টিকা কোন সময়েই ডিপফ্রিজে রাখা যাবে না। রেফ্রিজারেটরে টিকা রাখার পর ফ্রিজের দরজা ঠিকমত বন্ধ হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। ফ্রিজের সুইচ, সকেট, প্লাগ ঠিকমত লাগানো আছে কিনা এবং ফ্রিজ ঠিকমত কাজ করছে কিনা তাও পরীক্ষা করে দেখতে হয়।

১. প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের নির্দেশমতে টিকা বীজ সংরক্ষণ করতে হবে। অবশ্যই রেফ্রিজারেটরের ঠান্ডা পরিবেশে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় টিকাবীজ সংরক্ষণ করে রাখতে হবে। এ নির্দিষ্ট তাপমাত্রার অতিরিক্ত অথবা অতি কম তাপমাত্রায় টিকাবীজ সংরক্ষণ করলে টিকার গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

২. টিকাবীজ ব্যবহারের মেয়াদ উত্তীর্ণ সময়সীমা থাকে। উক্ত সময়সীমার মধ্যেই টিকাবীজ ব্যবহার করে শেষ করতে হয়। মেয়াদ উত্তীর্ণ টিকা বীজ যতই যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করা হোক না কেন, এর গুণাগুণ নির্দিষ্ট সময় সীমার পর কোনক্রমেই থাকে না। তাই মেয়াদ উত্তীর্ণ টিকাবীজ সংরক্ষণ করে ব্যবহার করা উচিত নয়।

হিমশুষ্ক টিকাগুলি ব্যবহারের পূর্বে টিকাবীজ পরিস্রুত পানির সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করতে হয়। যে কোন টিকাবীজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যবহার করে শেষ করতে হয়। সাধারণত একটি টিকাবীজ এক থেকে দেড় ঘন্টার মধ্যে ব্যবহার করে শেষ করতে হয়। এ সময়ের পর গুলানো টিকাবীজ কখনোই নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করে পরবর্তীতে ব্যবহার করা যাবে না। তাই ব্যবহারের পর টিকার অবশিষ্টাংশ সংরক্ষণ করা যাবে না।

১. টিকা ব্যবহারের পর অতিরিক্ত টিকা পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা জীবাণুনাশক দিয়ে নষ্ট করে ফেলতে হবে

২. কেবলমাত্র সুস্থ ও সবল বাচ্চা /মুরগিকে টিকা দিতে হবে

৩. টিকা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন- সিরিঞ্জ, সুঁচ, বিকার ইত্যাদি পানিতে ফুটিয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হয়। কোন ক্ষেত্রেই জীবাণুমুক্ত করার জন্য জীবাণুনাশক ব্যবহার করা যাবে না।

৪. লাইভ ভাইরাস ভ্যাকসিন চোখে ড্রপ দেয়ার সময় নিচে কাগজ বিছিয়ে নেওয়া ভালো। অসাবধানতাবশত টিকা বীজের ফোঁটা কাগজে পড়তে পারে। পরবর্তীতে কাগজ পুড়িয়ে ফেলতে হয়।

৫. বাচ্চা সংগ্রহের সময় হ্যাচারি মুরগির কি কি টিকা প্রদান করেছে তা জানতে হবে।

টিকা প্রদানের বিভিন্ন উপকরণ সমূহ এবং তাদের কাজঃ

১. সিরিঞ্জ- ভায়ালে টিকা মিশ্রনের পানি ভরা ও টিকা প্রদানে ব্যবহৃত হয়।

২. টিকার ভায়াল- যে মধ্যে টিকা বীজ থাকে

৩. ডাইলুয়েন্ট পানি- যে পানির মাধ্যমে টিকা গুলানো হয়।

ভ্যাকসিন মিশ্রণঃ

টিকা ভায়ালের মধ্যে যে টিকা বীজ থাকে তার সাথে ডিস্টিলড পানি মিশিয়ে যে মিশ্রণ তৈরি করা হয় তাকে ভ্যাকসিন মিশ্রণ বলে। মিশ্রণ পদ্ধতি নিম্নরূপ-

- ➢ প্রথমে ডিস্টিলড পানি সিরিঞ্জের ভেতর নিয়ে তা ভায়ালের ভিতর প্রবেশ করানো হয়।
- ➢ এরপর টিকা বীজের সাথে ভালভাবে ঝাঁকিয়ে ডিস্টিলড পানির সাথে মেশানো হয়।
- ➢ অতঃপর মিশ্রণটি টিকা হিসাবে ব্যবহারের উপযোগী হয়।

ভ্যাকসিন প্রয়োগ পদ্ধতিঃ

গবাদি প্রাণিতে ভ্যাকসিন বা টিকা প্রধানত ৩ ভাবে দেয়া হয়। যেমন-
১) মাংসে, ২) চামড়ার নিচে এবং ৩) চোখে ফোঁটা আকারে।

গবাদিপ্রাণির টিকাদান কর্মসূচীঃ

টিকার নাম	পশুর প্রজাতি ও বয়স	টিকার মাত্রা ও প্রয়োগ পথ	মেয়াদ	সংরক্ষণ	প্রতিমাত্রার মূল্য(টাকা)
ক্ষুরা রোগের টিকা (বাইভ্যালেন্ট)	গবাদিপশু ৬ মাস ছাগল/ভেড়া ও ৩ মাস	৬ মিলি. ২ মিলি. চামড়ার নিচে	৬ মাস	৪-৮° সে. তাপমাত্রায় ৬ মাস	৩.১২৫
গো-বসন্ত টিকা	গরু/ছাগল	১ মিলি. চামড়ার নিচে	১ বৎসর	২৫° সে. তাপমাত্রায় ১ বৎসর ৪-৮° সে. তাপমাত্রায় ১ মাস	০.২০
বাদলা টিকা	গরু/মহিষ/ছাগল/ভেড়া ৫ মাস ও তদুর্ধ্ব	২-৫ মিলি চামড়ার নিচে	৬ মাস	৪-৮° সে. তাপমাত্রায় ৬ মাস	০.২০
তড়কা টিকা	গরু/মহিষ/ ২-২.৫ বৎসর ছাগল/ভেড়া	১-২.৫ মিলি. চামড়া নিচে	১ বৎসর		
গলা ফুলা টিকা	গরু/মহিষ ছাগল/ভেড়া প্রাপ্ত বয়স্ক ২ বছরের উপর)	অয়েল এডজুভেন্ট ২ মিলি, ১ মিলি চামড়ার নিচে এবং এলাম অধঃক্ষেপিত ৫ মিলি ২ মিলি মাংসপেশীতে	১ বৎসর	৪-৮° সে. তাপমাত্রায় ৬ মাস	০.২০

মুরগির টিকাদান কর্মসূচী

ভ্যাকসিনের নাম	ভ্যাকসিন প্রয়োগের বয়স	মিশ্রণের নিয়ম	প্রয়োগের পদ্ধতি	ভ্যাকসিনের রং
বিসিআরডিভি	৩-৭ দিন	প্রতি ভায়াল ভ্যাকসিন ফোটা পরিস্রুত পানিতে (ডিস্টিলড ওয়াটার) মিশিয়ে নিতে হবে।	আই ড্রপারের সাহায্যে চোখে ১ ফোটা	সবুজ
পিজিয়ন পক্স	৪-১০ দিন	৩ মিলি পরিস্রুত পানিতে (ডিস্টিলড ওয়াটার) মিশিয়ে নিতে হবে।	পাখার ত্রিকোণাকৃতি মাংসবিহীন চামড়ায় খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে	লাল
বিসিআরডিভি	২১ দিন	প্রতি ভায়াল ভ্যাকসিন ১০০ ফোটা পরিস্রুত পানিতে	আই ড্রপারের সাহায্যে ১ চোখে ১ ফোটা	সবুজ

		(ডিস্টিলড ওয়াটার মিশিয়ে নিতে হবে।		
ফাউল পক্স	২৮ দিন	৩ মি.লি. পরিশ্রুত পানিতে (ডিস্টিলড ওয়াটার মিশিয়ে	পাখার ত্রিকোণাকৃতি মাংসে বিহীন চামড়ায় সুঁচিয়ে সুঁচিয়ে	লাল
আর ডি ভি	৬০ দিন বয়সে ও পরবর্তীতে প্রতি ৬ মাস পর পর	১০০ মি.লি পরিশ্রুত (ডিস্টিলড ওয়াটার) পানিতে মিশিয়ে	১ মি.লি চামড়ার নীচে ইনজেকশন	সাদা
ফাউল কলেরা	৪৫ দিন এবং ১৫ দিন পর বুস্টার ডোজ। পরবর্তীতে প্রতি ৬ মাস পর পর	মিশানো অবস্থায় পাওয়া যায়	১ মি.লি. চামড়ার নীচে ইনজেকশন	সাদা

হাঁসের টিকাদান কর্মসূচী

ভ্যাকসিনের নাম	ভ্যাকসিন প্রয়োগের বয়স	মিশ্রণের নিয়ম	প্রয়োগের পদ্ধতি	ভ্যাকসিনের রং
ডাক প্লেগ	২৮ দিন এবং পরবর্তীতে প্রতি ৬ মাস পর পর	১০০ মি.লি পরিশ্রুত (ডিস্টিলড ওয়াটার) পানিতে মিশিয়ে	১ মি.লি রানের/বুকের মাংসে ইনজেকশন	বাদামী
ফাউল কলেরা	২ মাস এবং ১৫ দিন বুস্টার ডোজ। পরবর্তীতে প্রতি ৬ মাস পর পর	মিশানো অবস্থায় পাওয়া যায়	১ মি.লি চামড়ার নীচে ইনজেকশন	সাদা

টিকা প্রয়োগের সময় সাবধানতাঃ

- জীবাণুমুক্ত সিরিঞ্জ ব্যবহার করতে হবে।
- অসুস্থ পশুকে টিকা দেয়া যাবে না।
- সময় না হলে টিকা দেয়া যাবে না। যেমন- পশুর বয়স বিবেচনা
- ছায়াযুক্ত স্থানে টিকা দিতে হবে।
- বেশী পেট ভর্তি করে খাওয়ার পর টিকা দেয়া যাবে না।
- খুব দুর্বল পশুকে টিকা দেয়া যাবে না।
- পরিশ্রান্ত পশুকে বিশ্রাম প্রদান না করে টিকা দেয়া যাবে না।
- রৌদ্রযুক্ত জায়গায় টিকা দেয়া যাবে না।
- মেয়াদ উত্তীর্ণ টিকা দেয়া যাবে না।
- টিকা দেয়ার পূর্বে এবং পরে হাত ও যন্ত্রপাতি ধুয়ে নিতে হবে।

আমাদের দেশে ভ্যাকসিন/টিকা অকার্যকর হওয়ার কারণ ঃ

- টিকা প্রয়োগের সময় বাচ্চার শরীরে মায়ের কাছ থেকে পাওয়া এন্টিবডির পরিমান বেশী থাকলে।
- পূর্ব থেকেই যদি গবাদিপশু/হাঁস-মুরগি ঐ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে।
- ভ্যাকসিন সংরক্ষণে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ না করলে লাইভ ভ্যাকসিনের জীবাণু মারা যাবে ফলে ভ্যাক্সিন কার্যকর হবে না।
- নির্ধারিত মাত্রায় ভ্যাক্সিন প্রয়োগ না করা।
- যথা সময়ে মিশ্রিত ভ্যাক্সিন ব্যবহার না করা (সাধারনত ভ্যাক্সিন মিশ্রণের পর ২ ঘন্টার মধ্যে)।
- রোগাক্রান্ত বা অসুস্থ গবাদিপশু/হাঁস-মুরগিকে ভ্যাক্সিন করা।
- আবহাওয়া প্রভৃতি যে কোন ধরণের ধকল। যেমন- অতিরিক্ত গরম।
- ভ্যাক্সিন করার যন্ত্রপাতি পরিষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত না করা।

- ❖ ভ্যাক্সিনে সরাসরি সূর্যের কিরণ লাগা।
- ❖ জীবাণুর স্ট্রেইন-এর ভিন্নতার কারণে; যে স্ট্রেইন-এর বিরুদ্ধে টিকা দেয়া হয়েছে ঐ স্ট্রেইনের এন্টিজেন না হলে।
- ❖ জীবিত জীবাণুর টিকা মৃত হলে।
- ❖ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাসকারী ঔষধ বেশী সেবন করালে বা ব্যবহার করলে
- ❖ টিকা প্রয়োগের সময় পানির সাথে অন্য কোন রাসায়নিক পদার্থ যুক্ত হলে।
- ❖ উপযুক্ত বয়সে, সঠিকভাবে এবং পরিমানমতো টিকা প্রয়োগ না করলে।
- ❖ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে টিকা মিশ্রণ এবং প্রয়োগ নিশ্চিত না হলে

ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা সফলতার জন্য গবাদিপশু-পাখির যে সমস্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা প্রয়োজন ঃ

- গবাদি পশুকে নিয়মিত টিকা প্রদান করতে হবে
- অসুস্থ গবাদি পশুকে পৃথক করে চিকিৎসা ব্যবস্থা করতে হবে এবং সুস্থ হলে পালে ফিরিয়ে আনতে হবে
- ঘর/খাঁচা সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে
- গবাদি পশু অসুস্থ হলে আলাদা করে রাখতে হবে।
- মৃত গবাদি পশুকে মাটিতে পুতে ফেলতে হবে।
- ঘরের আশপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- সুষম খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হবে।
- বাজার থেকে হাঁস মুরগি ক্রয় করলে এক সপ্তাহ পর্যন্ত আলাদা করে রেখে এদের রোগ আছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে।
- ২-৩ মাস পর পর কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়াতে হবে
- অসুস্থ পশু-পাখি জবাই করলে নাড়ী-ভুড়ি, পালক মাটিতে পুতে ফেলতে হবে

প্রাণিসম্পদে পুষ্টি ব্যবস্থাপনা

রেশন

কোনো প্রাণিকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে যে খাদ্য সরবরাহ করা হয় তাকে রেশন বলে। রেশন দুই প্রকার।

- মেইনটিন্যান্স রেশন (Maintenance Ration)
- উৎপাদন রেশন (Production Ration)।

প্রাণি যখন কোনো কাজ করে না অর্থাৎ বিশ্রাম অবস্থায় থাকে তখন যে রেশন দেয়া হয় তাকে মেইনটিনান্স রেশন বলে। আবার যখন প্রাণিদেরকে মেইনটিন্যান্স (Maintenance) রেশনের সাথে তার উৎপাদন যেমন- দৈহিক বৃদ্ধি ও দুধ উৎপাদন, গর্ভাবস্থা চলাকালীন এর জন্য অতিরিক্ত রেশন সরবরাহ করা হয় তাকে উৎপাদন (Production) রেশন বলে। ইহা প্রাণির দৈহিক ওজন এবং উৎপাদনের উপর নির্ভর করে। উৎপাদন মাত্রা বেশি হলে দেখা যায় একই দৈহিক ওজন বিশিষ্ট প্রাণির প্রডাকশন রেশনের চাহিদা বেড়ে যায়।

আদর্শ রেশনের বৈশিষ্ট্যঃ

- প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সঠিক অনুপাতে বিদ্যমান থাকতে হবে
- রেশনে ব্যবহৃত উপকরণ অবশ্যই সুস্বাদু হতে হবে
- রেশনে যথাসম্ভব বেশি পরিমাণ উপকরণ যোগ করা উচিত
- রেশনের খাদ্য উপকরণগুলো বিষাক্ত পদার্থ বর্জিত হবে
- রেশন অবশ্যই রোচক হবে
- রেশন আয়তন বেশি হবে

- রেশনে বেশির ভাগ সবুজ ঘাসের ব্যবহার করা উচিৎ
- হঠাৎ করে রেশন পরিবর্তন আনা যাবে না
- প্রতিদিন একই সময়ে রেশন সরবরাহ করতে হবে
- রেশন তৈরির সময় অর্থনৈতিক দিক খেয়াল রাখতে হবে
- রেশনে ব্যবহৃত খাদ্য উপাদানগুলো যেন সহজলভ্য হয়
- একই জাতের ও একই বয়সের প্রাণিদের একই রেশন সরবরাহ করতে হবে
- রেশনে প্রয়োজনীয় খনিজ উপাদান বিদ্যমান থাকতে হবে

রেশন তৈরির বিবেচ্য বিষয়ঃ

যে কোন প্রাণির রেশন তৈরিতে কিছু বিষয় বিবেচনা করতে হয়। নিম্নে এগুলো উল্লেখ করা হলো।

- রেশন তৈরির উদ্দেশ্য কী তা জানতে হবে
- কোন বয়সের প্রাণির রেশন তৈরি করব তা জানতে হবে
- প্রাণিটি উৎপাদনের কোন স্তরে আছে তা জানতে হবে
- প্রাণিটি অসুস্থ হওয়া চলবে না
- রেশনে ব্যবহৃত খাদ্য উপকরণগুলোর রাসায়নিক গঠন জানতে হবে
- খাদ্য উপকরণে শক্তির হিসাব জানতে হবে
- খাদ্য উপকরণ সস্তা ও সহজলভ্য হতে হবে
- খাদ্য উপকরণে কোনো টক্সিক পদার্থ আছে কিনা তা জানতে হবে
- প্রাণির দৈহিক ওজন জানতে হবে
- প্রয়োজনীয় ভিটামিন জাতীয় খাদ্য উৎস অন্তর্ভুক্ত করতে হবে

সুষম খাদ্য (Balanced Diet)

সুষম খাদ্য বলতে আমরা ঐ খাদ্যকে বুঝি যাতে দেহের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সঠিক অনুপাতে বিদ্যমান থাকে। দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও উৎপাদনের জন্য সুষম খাদ্য অপরিহার্য।

খাদ্যের আন্তর্জাতিক শ্রেণিবিন্যাস ঃ

- শুকনো খড়কুটো ও রাফেজ- খাদ্যের এ শ্রেণিতে সকল ফডার এবং রাফেজ অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া অন্যান্য দ্রব্য যেগুলো ১৮% এর বেশি আঁশ বা ৩৫% কোষ প্রাচীর ধারণ করে, সেগুলো ও এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ফডার, রাফেজ এবং হে (লিগুম ও ননলিগুম), খড়, ফডার, ভুট্টা, স্টোভার, হালস, ইত্যাদি খাদ্যের শক্তির পরিমাণ কম। এগুলো এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এর কারণ কোষ প্রাচীরের আয়তন বেশি। চারণ ভূমি ঘাস, গাছেরপাতা, সাইলেজ সব সংরক্ষিত এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।
- এনার্জি ফিড- যে সকল দ্রব্যে আঁশ ও প্রোটিন এর পরিমাণ যথাক্রমে ১৮% এর কম এবং ২০% এর বেশি, সেগুলো এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। যেমন-দানাশস্য ও তাদের উপজাত।
- প্রোটিন সাপ্লিমেন্ট- খাদ্যের প্রোটিনের পরিমাণ ২০% এগুলো এ শ্রেণিরঅন্তর্ভুক্ত।
- মিনারেল বা খনিজ সাপ্লিমেন্ট
- ভিটামিন সাপ্লিমেন্ট
- অ্যাডিটিভস

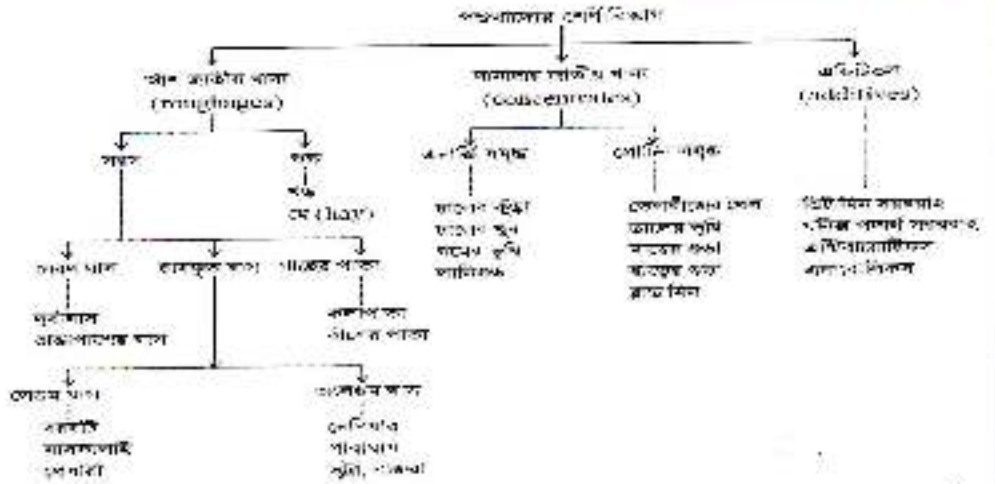

পশুখাদ্যের শ্রেণি বিভাগ

- আঁশ জাতীয় খাদ্য (roughages)
  - সবুজ
    - চারণ ঘাস
      - দূর্বাঘাস
      - রাস্তাপাশের ঘাস
    - চাষকৃত ঘাস
      - লেগুম ঘাস
        - খেসারি
        - মাসকলাই
        - খেসারী
      - অলেগুম ঘাস
        - নেপিয়ার
        - পারা ঘাস
        - ভুট্টা, জাম্বু
    - গাছের পাতা
      - কাঁঠাল পাতা
      - বাঁশের পাতা
  - শুষ্ক
    - খড়
    - হে (hay)
- দানাদার জাতীয় খাদ্য (concentrates)
  - শর্করা সমৃদ্ধ
    - চালের কুঁড়া
    - চালের খুদ
    - গমের ভুষি
    - ভুট্টা ভাঙা
  - প্রোটিন সমৃদ্ধ
    - সোয়াবিনের খৈল
    - ডালের ভুষি
    - সরিষার খৈল
    - তিলের খৈল
    - ব্লাড মিল
- এডিটিভস (additives)
  - ভিটামিন মিনারেল মিকচার
  - খনিজ পদার্থ সরবরাহ
  - এন্টিবায়োটিকস
  - প্রোবায়োটিকস

- বিভিন্ন প্রাণীর দৈহিক প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের খাদ্যের প্রয়োজন হয়। প্রাণিখাদ্য নিম্নোক্ত কারণে গুরুত্বপূর্ণ-
- স্বাস্থ্য সংরক্ষণ (maintenance) : পশুর দেহের তাপ সংরক্ষণ, শক্তি উৎপাদন, ক্ষয়পূরণ, রোগ প্রতিরোধ ও সর্বোপরি জীবন ধারণের জন্য খাদ্য অপরিহার্য
- দৈহিক বৃদ্ধিসাধন (growth) : বাড়ন্ত পশুর সঠিকভাবে দৈহিক বৃদ্ধির জন্য খাদ্য আবশ্যক
- বাচ্চা উৎপাদন (reproduction) : পশু সময়মত গরম হওয়া, গর্ভধারণ, বাচ্চা প্রসব এবং পশুর উর্বরতা রক্ষার জন্য সুষম খাদ্যের প্রয়োজন। এছাড়া গর্ভবতী পশুর গর্ভস্থ বাচ্চার দৈহিক বৃদ্ধির জন্য খাদ্যের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ
- দুধ উৎপাদন (milk production) : পশুর দুধ উৎপাদনের পরিমাণের উপর পশুখাদ্যের উপাদান ও পরিমাণ বৃদ্ধি আবশ্যক। বংশগত গাভীকে খাদ্য সরবরাহের উপর তার পরিমাণ ও মান নির্ভর করে
- প্রাত্যহিক কর্মক্ষমতা (daily work) : পশুর কাজের ধরন ও পরিশ্রমের উপর পশুখাদ্য সরবরাহ প্রয়োজন। অর্থাৎ পশু শক্তি ব্যবহারের প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যের দরকার পড়ে
- মাংস ও উল উৎপাদন (meat and wool production) : পশুর মাংস ও উল প্রোটিনযুক্ত, তাই উৎকৃষ্ট মানের মাংস ও উলের জন্য উপযুক্ত খাদ্য সরবরাহ প্রয়োজন। সুষম পশুখাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে ছয় প্রকার খাদ্য উপাদান থাকে। যথা- (ক) পানি (খ) শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট (গ) আমিষ বা প্রোটিন (ঘ) চর্বি বা স্নেহ পদার্থ (ঙ) খনিজ পদার্থ বা মিনারেলস এবং (চ) খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন।

ভুট্টা

সয়াবিন

রাইস পলিশ

ডিসিপি পাউডার

তিলের খৈল

ভুট্টা ভাঙা

খড়

নারিকেলের খৈল

গম ভাঙা

লবণ

কাঁচা ঘাস

ঝোলাগুড়

গবাদিপশুর খাদ্য সামগ্রীর শ্রেণিবিভাগ ঃ

পশু খাদ্যের প্রকৃতি অনুযায়ী পশু খাদ্য সামগ্রীকে সাধারণত দুই শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যথা- আঁশ জাতীয় খাদ্য এবং দানাদার খাদ্য। তবে অনেকে এডিটিভস কে আলাদা একটি ভাগ হিসেবে দেখেন। তাই গবাদি পশুর খাদ্যকে নিম্নোক্ত ভাগ করা হল।

১। **আঁশ বা ছোবড়া জাতীয় খাদ্য(Roughages)ঃ** যেসব খাদ্যে উচ্চমাত্রায় তন্তু বা আঁশ এবং নিম্ন মাত্রায় মোট হজমী উপাদান (TDN) থাকে তাদের আঁশ জাতীয় খাদ্য বলে। আঁশ জাতীয় খাদ্যে কম হজমী (less digestible) দ্রব্য বেশি থাকে এবং শক্তিদায়ক খাদ্য উপাদান খুব অল্প মাত্রায় থাকে। যেমন-খড়, কাঁচা ঘাস, লতা-পাতা ভূষা ইত্যাদি। আর্দ্রতার পরিমাণের উপর ভিত্তি করে এই জাতীয় খাদ্য আবার দুই ধরনের হতে পারে। যেমন-

ক. **শুষ্ক আঁশ জাতীয় খাদ্য (roughages) ঃ** এই জাতীয় খাদ্যে ১০-১৫% ভাগ জলীয় পদার্থ বা পানি থাকে। যেমন- ধানের খড়, গমের খড়, শুষ্ক ঘাস বা হে, ডাল জাতীয় গাছের শুঁটি ইত্যাদি

খ. **রসালো আঁশ জাতীয় খাদ্য ঃ** এই জাতীয় খাদ্যে ৬০-৯০% ভাগ জলীয় পদার্থ বা পানি থাকে। যেমন- বিভিন্ন প্রকার কাঁচা ঘাস, সাইলেজ, ফডার জাতীয় গাছের পাতা, মিষ্টি আলু, শসা, গাজর, পাতাকপি ইত্যাদি।

২। **ঘনীভূত বা দানাদার জাতীয় খাদ্য (Concentrates) ঃ** যেসব খাদ্য বা খাদ্য মিশ্রণে উচ্চ মাত্রায় নাইট্রোজেনমুক্ত এক্সট্রাক্ট এবং মোট সুপাচ্য পুষ্টিকর উপাদান (TDN) থাকে এবং নিম্ন মাত্রায় তন্তু প্রোটিন (fibre) থাকে তাকে ঘনীভূত বা দানাদার খাদ্য বলে। তাই ঘনীভূত বা দানাদার জাতীয় খাদ্য বা খাদ্য মিশ্রণ সাধারণত সুপাচ্য এবং পুষ্টিকর উপাদান সমৃদ্ধ। এগুলো সাধারণত কম আঁশযুক্ত ও শুষ্ক হয়। প্রধানত আমিষ এবং শর্করা জাতীয় পুষ্টি উপাদান সরবরাহের জন্য ব্যবহার করা হয়। যেমন- চাউলের কুড়া, গমের ভুষি, খৈল, ডালের খোসা ইত্যাদি। এই জাতীয় খাদ্য আবার দুই ধরনের হতে পারে। যেমন-

- এনার্জি সমৃদ্ধ ঘনীভূত খাদ্যঃ শস্যদানা, কৃষি শিল্পের উপজাত, লালীগুড় ইত্যাদি।
- প্রোটিন সমৃদ্ধ ঘনীভূত খাদ্যঃ উদ্ভিজ্জ প্রোটিন, প্রাণিজাত প্রোটিন ইত্যাদি

৩. **অ্যাডেটিভস (Additives) ঃ** পশুখাদ্যকে সুষম ও পরিপূর্ণ করার জন্য অ্যাডেটিভস হিসেবে ভিটামিন, খনিজ পদার্থ, এন্টিবায়োটিক্স এবং এনাবোলিকস মিশিয়ে খাওয়ানো হয়।

গবাদিপশুর খাদ্যে শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ নির্ণয় পদ্ধতি ঃ

শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ নির্ণয় ঃ গরুর দৈহিক ওজনের উপর নির্ভর করে ঐ গরুর প্রয়োজনীয় শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। সাধারণত ১০০ কেজি ওজনের একটি গরুর জন্য ২.০ থেকে ২.৫ কেজি শুষ্ক পদার্থের প্রয়োজন হয়। এ শুষ্ক পদার্থ আঁশযুক্ত এবং দানাদার খাদ্য হতে সরবরাহ করতে হবে। আঁশযুক্ত এবং দানাদার খাদ্য হতে মোট শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ নিম্নরূপ হওয়া প্রয়োজন।

মোট শুষ্ক পদার্থ ঃ

১. আঁশযুক্ত খাদ্য ২/৩ অংশ ঃ ক. শুকনো আঁশযুক্ত খাদ্য ২/৩ অংশ ও খ. তাজা আঁশযুক্ত খাদ্য ১/৩ অংশ
২. দানাদার খাদ্য ১/৩

৪০০ কেজি দৈহিক ওজনের একটি গরুর জন্য প্রয়োজনীয় মোট শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ নির্ণয়ের পদ্ধতি নীচে দেখানো হলো।

- দৈহিক ওজন =৪০০ কেজি
- মোট শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ=৪×২.৫=১০কেজি (হি: ২.৫/১০০ কেজি দৈহিক ওজন

- দানাদার খাদ্য হতে শুষ্ক পদার্থ=১০×২/৩=৬.৬৬ অর্থাৎ ৬.৫ কেজি।

যখন আঁশযুক্ত খাদ্য সেগুলো জাতীয় হবে তখন শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ নিম্নরূপ হবে ঃ

- শুষ্ক আঁশযুক্ত খাদ্য হতে=৬.৫×৩/৪=৪.৯৫ অর্থাৎ ৪.৯ কেজি
- ভেজা আঁশযুক্ত খাদ্য হতে=৬.৫×১/৪=১.৬৫ অর্থাৎ ১.৬কেজি।

যখন সাধারণ আঁশ জাতীয় খাদ্য হবে তখন নিম্নরূপ হবে

- শুষ্ক খড় খাদ্য হতে=৬.৬×২/৩ =৪.৪ কেজি।
- ভেজা আঁশযুক্ত খাদ্য হতে=৬.৬×১/৩=২.২ কেজি

৪০০ কেজি দৈহিক ওজনের একটি গরুর জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য তালিকা

	ক্রমিক নং	খাদ্য উপকরণ	পরিমাণ	শুষ্ক পদার্থ (%)	মোট দেয় শুষ্ক পদার্থ (কেজি)
আঁশ জাতীয় খাদ্য	১	খড়	৪.৫	৯০	৪.০৫
৬.৬৬ কেজি	২	সবুজ কাঁচা ঘাস	১৭.৫	১৫	২.৬২
দানাদার খাদ্য	৩	চালের কুঁড়া/গমের ভূষি	৩ কেজি	৯০	২.৭
৩.৫ কেজি	৪	তিলের খৈল	৯০০ গ্রাম	৯৫	০.৮
	৫	লবণ	৫০ গ্রাম		
	৬	পানি	১০ লিটার		১০.১৭

মোটা তাজাকরণের গরুকে কাঁচা ঘাস নিয়মিত দেওয়া সম্ভব না হলে ভিটা-ভিটামিন ব্যবহার করতে হবে।
ব্যবহার পদ্ধতি: ভিটা ভিটামিন খাদ্যের সাথে ২-৪ টা ট্যাবলেট নিয়মিত খাওয়াতে হবে

গবাদি পশুর সুষম খাদ্য প্রস্তুতের পূর্বশর্ত ঃ

গবাদি পশুর স্বাস্থ্য রক্ষা, কর্মক্ষমতা ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন পুষ্টিকর, পরিমিত দানাদার ও আঁশ জাতীয় খাদ্য। আঁশ জাতীয় খাদ্যের মধ্যে সবুজ ঘাস গবাদি পশুর স্বাস্থ্য রক্ষা, রোগ প্রতিরোধ, প্রজনন ক্ষমতা এবং উৎপাদন বৃদ্ধিতে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলাদেশের বেশির ভাগ গবাদি পশুর ঘরে খাদ্যশস্যের উপজাত খাইয়ে পালন করা হয়। এ সমস্ত পশু খাদ্যের প্রধান উৎস আঁশ যুক্ত খাদ্য খড় এবং দানা উপজাত। কৃষকের প্রধান উদ্দেশ্য জমিতে জন্মানো সামান্য আগাছা, ফসলের উপজাত, ভূসি, খড় ইত্যাদি খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে বিনা খরচে গবাদিপশু পালন করা। দুর্যোগ ও আপদকালীন সময়ের জন্য কোন কোন কৃষক বাড়ির পার্শ্বে পতিত জমিতে অথবা অন্য কোন খাদ্যশস্যের সাথে অথবা দুই ফসলের মধ্যবর্তী সময়ে কিছু পরিমাণ ঘাস জাতীয় খাদ্যের আবাদ করে থাকে। গবাদিপশুর খাদ্য যেভাবেই সরবরাহ করা হোক না কেন, সুষম খাদ্য প্রস্তুত করার জন্য নিম্নোক্ত শর্তগুলো বিবেচনা করা উচিত-

- খাদ্যে পশুর প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সমূহ সঠিক মাত্রায় থাকতে হবে
- যে সকল উপকরণ স্থানীয় বাজারে সহজে পাওয়া যায় এবং সস্তা খাদ্য তৈরির জন্য সে সব উপকরণ ব্যবহার করা উচিৎ
- খাদ্য অবশ্যই সুস্বাদু ও সহজ পাচ্য হতে হবে। বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সামগ্রী দিয়ে খাদ্য তৈরি করা উচিৎ
- খাদ্য টাটকা হতে হবে। তাছাড়া ময়লা, ছত্রাকপড়া, দুর্গন্ধ ইত্যাদি মুক্ত হতে হবে
- দুগ্ধবতী গাভীর খাদ্যে পর্যাপ্ত খনিজ পদার্থ থাকতে হবে। খনিজ পদার্থের অভাবে দুধ উৎপাদন হ্রাস পাবে এবং দুগ্ধদান কাল শেষে গাভী অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়বে
- খাদ্য প্রস্তুতের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন পশুর উদর পূর্তি হয়। খাদ্যের আয়তন বেশি হওয়া দরকার
- গবাদিপশুর জন্য কাঁচা ঘাস অত্যাবশ্যক। কাঁচা ঘাসে পর্যাপ্ত ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থ আছে, তাছাড়া সহজে হজম হয়
- খাদ্য উপাদান হঠাৎ করে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করা উচিৎ নয়, প্রয়োজনে ধীরে ধীরে দিনে দিনে বদলাতে হবে
- খাদ্য অবশ্যই সঠিকভাবে তৈরি করতে হবে, যেমন- খেসারী, মাসকলাই, ভুট্টা, গম, তৈল ইত্যাদি মিশ্রণের পূর্বে ভেঙ্গে নিতে হবে। তবে সুষম ভাবে মিশানো যাবে এবং সহজে হজম হবে
- আঁশ জাতীয় খাদ্য যেমন- খড়, কাঁচা ঘাস ইত্যাদি আস্ত না দিয়ে কেটে ছোট ছোট করে পশুকে খাওয়াতে হবে, এতে যেমন অপচয় কম হবে তেমনি পশুর খেতে সুবিধা হবে এবং হজমে সহায়ক হবে
- খাদ্য অবশ্যই অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক হতে হবে

গো-খাদ্য হিসেবে সবুজ ঘাস (ফডার) পরিচিতি ও চাষ পদ্ধতি

ঘাস চাষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ঃ

দুধ ও মাংস উৎপাদনে প্রধান খাদ্য উপকরণ হচ্ছে সবুজ ঘাস। অর্থাৎ সবুজ ঘাষছাড়া প্রাণির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা কঠিন। বর্তমানে দেশে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান চাষের ফলে খড় এর উচ্চতা আগের তুলনায় ৩-৪ গুন কমেছে পাশাপাশি খুটি ধান গাছে অধিক ধান উৎপাদনের ফলে খড়ের পুষ্টিমানও আগের তুলনায় কমে গেছে। অন্যদিকে কৃষকরা ধান চাষের প্রতি ঝুকে পড়াতে রবি মৌসুমে ডাল জাতীয় ফসল চাষের পরিমাণ আগের তুলনায় কয়েক গুন কমেছে। ফলে উচ্চ পুষ্টিমান সম্পন্ন ডাল জাতীয় ফসলের খড়ও এখন আর গবাদি প্রাণির খাদ্য হিসাবে পাওয়া যাচ্ছে না। অন্যদিকে কাঁচা ঘাস চাষের উৎস ছিল চারণ ভূমি বা পতিত জমি। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য বসত বাড়ি, রাস্তা-ঘাট, হাট-বাজার, স্কুল-কলেজ ইত্যাদি তৈরীতে চারণ ভূমি বা পতিত জমি ব্যবহার হচ্ছে ফলে গবাদিপ্রাণির কাঁচা ঘাস প্রাপ্তির উৎস কমে গেছে। এ অবস্থায় গবাদিপ্রাণির প্রধান খাদ্য কাঁচা ঘাস এর উৎস হিসেবে জমিতে ঘাস চাষ করার বিকল্প নেই। তাই অল্প জমিতে বেশী উৎপাদন পেতে উন্নত জাতের ঘাস চাষের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। উন্নত জাতের ঘাসের মধ্যে নেপিয়ার পাকচং, জেম্বাস, পারা, জার্মান ও ভুট্টা উল্লেখযোগ্য।

বিভিন্ন প্রকার ঘাস চাষ ঃ আমাদের দেশে যে সমস্ত জাতের ঘাস রয়েছে এর মধ্যে কতকগুলো স্থায়ী ঘাস এবং কতকগুলো অস্থায়ী বা মৌসুমী ঘাস। স্থায়ী ঘাস হচ্ছে সেই সমস্ত জাতের ঘাস যা একবার লাগালে কয়েক বছর বেঁচে থাকে। আর মৌসুমী বা অস্থায়ী ঘাস হচ্ছে, সেই সমস্ত ঘাস যা একবার লাগালে এক মৌসুম বেঁচে থাকে এবং একবার কেটে খাওয়ালেই শেষ হয়ে যায়। এই সমস্ত ঘাসের কতকগুলো শিমীশ পরিবারভুক্ত বা ঘাস জাতীয় এবং কতকগুলো দুই জাতীয় কতকগুলো গ্রীষ্মকালে জন্মে আবার কিছু শীতকালে জন্মে। তাই গো-খাদ্য উৎপাদন করতে হলে কোন ঘাস কি ধরণের এবং কি পদ্ধতিতে চাষাবাদ সে সম্বন্ধে ধারণা থাকা দরকার। আমাদের দেশের আবহাওয়ায় চাষ হয় এমন কিছু ঘাসের নাম ও উৎপাদন কলাকৌশল নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

ভুট্টার ঘাস ঃ

ভুট্টা একটি সবুজ গাছ গবাদি পশুর অত্যন্ত পুষ্টিকর ও উপাদেয় খাদ্য। আমাদের দেশে এখন প্রচুর ভুট্টা চাষ হচ্ছে।

চাষ পদ্ধতিঃ উঁচু নিচু কিন্তু পানি জমে না এমন জমিতে ভুট্টা চাষ করা যায়। সারা বছরই ভুট্টার চাষ করা যায়। কার্তিক অগ্রহায়ন মাস, শীতের শেষে, ফাল্গুন ও চৈত্র মাসেও পানি সেচ দিয়ে ভুট্টার চাষ করা যায়। অধিক শীত অধিক বৃষ্টি কোন অবস্থাতেই ভুট্টা ভালো জন্মে না। বীজ বপনের আগে ৫-৬ বার জমি চাষ করতে হয়। বিঘাপ্রতি ৫-৬ কেজি ভুট্টার প্রয়োজন পড়ে।

বপন প্রণালিঃ

ছিটিয়েভাবে বীজ বপন করা ভালো। দুই সারির মধ্যবর্তী দুরত্ব ১.৫-২ ফুট। ১০ ইঞ্চি পর পর বীজ বপন করতে হয়। জমি সবসময় আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

সারপ্রয়োগ ও পানিসেচঃ

জমি তৈরির সময় বিঘা প্রতি ১-২ ঘন গোবর সার, ১৫ কেজি ইউরিয়া, ৬ কেজি টিএসপি এবং ৫ কেজি এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। জমিতে নিয়মিত পানি সেচ দিতে হবে।

গবাদি প্রাণিকে খাওয়ানোর নিয়ম ও সংরক্ষণ ঃ

২.৫-৩ ফুট উঁচু হলেই ঘাস কেটে খাওয়ানো যায়। মোচা আসার পর সাইলেজ তৈরি করে রেখে দিলে সারা বছর পশুকে খাওয়ানো সম্ভব হয়।

ভুট্টার বহুমুখী ব্যবহারঃ

- দুধ উৎপাদন খরচ ৬০% কমে যায়
- বছর ব্যাপী উৎপাদন পাওয়া যায়।
- সাইলেজ তৈরি করে সংরক্ষণ করা যায়।
- শিম্বু জাতীয় ঘাসের সাথে চাষ করা যায়।

জার্মান ঘাস

জার্মান ঘাস এক প্রকার স্থায়ী ঘাস। এ ঘাসের কান্ডের গিটে শিকড় থাকে এবং শসা ঘাসের মত লাগানোর পর ঘাসের লতা সমস্ত জমিতে ছড়িয়ে পড়ে। এ ঘাস গরুর খুব পছন্দনীয়, দ্রুত-বর্ধনশীল ও উচ্চ ফলনশীল। বাংলাদেশে এ ঘাস আবাদের প্রচুর সুযোগ রয়েছে।

জমি নির্বাচন ঃ জার্মান ঘাস নিচু ও জলাবদ্ধ জমিতে চাষ করা যায়। জার্মান ঘাস দাঁড়ানো পানিতে জন্মানো যায়। যে সমস্ত জমিতে সারা বছর পানি থাকে অথবা কিছু কাল ডুবে থাকে, সেসব জমিতে এ ঘাস চাষ করা যায়। এছাড়া খাল, বিল, মজাপুকুর, নদীর ধার, ডোবা, নালাতে এই ঘাস চাষের জন্য উপযুক্ত।

রোপনের সময়ঃ মার্চ হতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এ ঘাস চাষের উপযুক্ত সময়।

রোপনের দূরত্বঃ সারি থেকে সারি গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ১-১.৫ ফুট

বংশবিস্তারঃ এ ঘাস হতে ভালো বীজ উৎপাদন হয় না। কাজেই কাটিং ও মোথা দ্বারা বংশ-বিস্তার করতে হয়।

চারা তৈরি ঃ গাছ পরিপক্ক হলে কান্ডের গিট হতে শিকড় বের হয়। এ রকম পরিপক্ক গাছের কান্ডকে ৩ টি গিট নিয়ে কাটিং করতে হয়। সমতল শুকনা জমিতে লাগালে কয়েকটি চাষ দিয়ে আগাছা মুক্ত করে কাটিং গুলো কাত করে অর্থাৎ ৪৫-৬০ ডিগ্রী কোণে লাগাতে হবে। এরপরে কয়েকটা চাষ দিয়ে জমি আগাছা মুক্ত করে নিতে হবে। এরপর নির্দিষ্ট দূরত্বে কোদাল দিয়ে গর্ত করে চারা বা কাটিং রোপন করতে হবে। মাটির নীচে একটি মাটির সমান এবং অপর গিট মাটির উপরে থাকে।

সার প্রয়োগ ঃ জার্মান ঘাস উর্বর জমিতে ভাল হয়। ভাল ফলনের জন্য জমিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে গোবর দিতে হবে। এবং চারা লাগানোর ২/৩ সপ্তাহ পর একর প্রতি ৪০ কেজি ইউরিয়া ছিটিয়ে দিতে হবে, প্রতিবার ঘাস কাটার পর একর প্রতি ৩৫-৪০ কেজি ইউরিয়া সার উপরে প্রয়োগ করতে হবে।

ঘাস কাটা ঃ জার্মান ঘাস দ্রুত-বর্ধনশীল। রোপনের ৫০-৬০ দিন পর প্রথম কাটার উপযোগী হয় এবং এরপর শীতকালে এ ঘাসের তেমন বৃদ্ধি ঘটে না।

ফলন ঃ জার্মান ঘাস বছরে প্রায় ৫ বার কাটা যায়। উর্বর জমিতে ও ভালো ব্যবস্থাপনায় বছরে একর প্রতি ৩০-৪৫ টন সবুজ ঘাস পাওয়া যায়।

হাইব্রিড নেপিয়ার ঘাস ঃ

১. হাইব্রিড নেপিয়ার পশু খাদ্য হিসাবে অত্যন্ত পুষ্টিকর ও উপাদেয় ঘাস। দেখিতে এক প্রকার স্থায়ী ঘাস দেখতে আখের মত, লম্বা ১৩ ফুট বা এর চেয়ে ও বেশি হয়ে থাকে। এ ঘাসের খাদ্য-মান অন্য অনেক ঘাসের চেয়ে বেশি প্রোটিন কনটেন্ট প্রায় ১৬%।

২. প্রতি ২৫-৩৫ দিনে এ ঘাস কাটা যায় এবং বছরে ৮ থেকে ১০ বার কাটা যায়। বছরে উৎপাদন প্রতি হেক্টরে প্রায় ৬০০ টন।

৩. নেপিয়ার থেকে এর উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হলো ঘাসের পাতা মসৃণ, মিষ্টি।

৪. রোপণ করা যায় বর্ষা মৌসুমে, ভাল ফলন ও পুষ্টি পেতে হলে সেচ ও সার সুবিধা থাকা ভাল।

৫. জমি থেকে কেটে এনে এ ঘাস সরাসরি পশুকে খাওয়ানো ভাল।

৬. একবার রোপণ করলে ২ বছর পর্যন্ত এর ফলন পাওয়া যায়। সারা বছরই এ ঘাস চাষ করা যায়।

চাষ পদ্ধতিঃ

১. এই ঘাস আবাদের জন্য উঁচু ও মাঝারি জমি যেমন বাড়ির পার্শ্বে উঁচু অনাবাদি জমি, পুকুরের পাড়, রাস্তার পাশে ও বেড়ী বাঁধ সবচেয়ে উত্তম। ডোবা, জলাভূমি কিংবা প্লাবিত হয় এমন অঞ্চলে এই ঘাস আবাদ করা যায় না।

২. সমতল জমিতে ৪-৫ টি চাষ ও মই দিয়ে জমি আগাছা মুক্ত করতে হবে। জমিতে বেশী পরিমাণ পচা গোবর বা জৈব সার দিয়ে মাটিতে ভালোভাবে মিশিয়ে জমি প্রস্তুত করতে হবে। জমি প্রস্তুত করার দুই সপ্তাহ পরে ঘাসের কাটিং বা চারা লাগাতে হবে।

৩. এই ঘাস আখের কাটিং এর মত কাটিং অর্থাৎ কান্ডের দুই মাথায় কমপক্ষে ২-৩ গিট রেখে কাটতে হবে। একসারিতে রোপণ করা উচিত। একটি গিট মাটির নীচে, মধ্যের গিট মাটির সমানে রেখে কাটিং আনুমানিক ৪৫ ডিগ্রি কৌণিক ভাবে লাগাতে হয়। এক সারি হতে অন্য সারির দূরত্ব ৪ ফুট এবং এক চারা হতে অন্য চারার দূরত্ব ৩ ফুট।

৪. পচা গোবর ও খামার জাত আবর্জনা, পচানো ঘাস হেক্টর প্রতি প্রায় ৩০০০/৪০০০ কেজি চাষের সময় ভালভাবে ছিটিয়ে দিলে মাটিতে পুরোপুরি মিশে যায়। বেশি ফলন পেতে হলে এর সাথে হেক্টর প্রতি ২২৫ কেজি ইউরিয়া, ১৫০ কেজিটি এসপি এবং ৭৫ কেজি মিউরেট অব পটাশ প্রয়োগ করতে হয়।

৫. রোপণের প্রায় ১০/১২ দিন পর হেক্টর প্রতি ৮০ কেজি ইউরিয়া সার দিলে ভাল হয়। প্রত্যেক কাটিং এরপর দুই সারির মাঝের জমি ভালভাবে লাঙ্গল বা কোদাল দিয়ে মাটি আলগা করে হেক্টর প্রতি ৫০ কেজি ইউরিয়া সার দিলে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

৬. সার ছিটাবার পরে দীর্ঘদিন খরা থাকার পর হঠাৎ অধিক বৃষ্টিপাতের পর দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়া ঘাস কেটে খাওয়ানো উচিত নয়।

পারা ঘাস ঃ

পারা মৌসুমী অঞ্চলের এক প্রকারের স্থায়ী ঘাস। এই ঘাস লম্বায় ১-২ মিটার উঁচু হয় এবং দেখতে অনেকটা দল ঘাসের মত। জলাবদ্ধ জমিতে এ ঘাস জন্মানো যায়। উঁচু জমিতে সেচের ব্যবস্থা করলে এ ঘাসের উৎপাদন ভাল হয়। আমাদের দেশে বন্যার পানিতে ডুবার পরও এই ঘাস নষ্ট হয় না। বাড়ির চারপাশে নিচু জায়গায় বাঁধের ঢালু অংশে, জমির আইলে, পুকুরের পাড়ে এ ঘাস উৎপাদন করা যায়। পারা ঘাস গবাদি প্রাণির খাদ্য হিসেবে ব্যবহার ছাড়াও পুকুরে গ্রাস কার্প মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে। ইহা পুষ্টিগুণ উচ্চ ফলনশীল এবং সুস্বাদু ঘাস।

চাষ পদ্ধতি ঃ

পারা ঘাস উঁচু, নীচু, ঢালু, জলাবদ্ধ, লোনা পানিতে এমনকি লোনা মাটি, যেখানে অন্য কোন ফসল হয় না, সেখানেও পারা ঘাস জন্মে। জমি চাষ পদ্ধতি নেপিয়ার ঘাসের মতই।

রোপণ প্রণালী ও সময় ঃ

তৈরি সমতল জমিতে সারি করে পারা ঘাস লাগাতে হয়। দুই সারির মধ্যবর্তী দূরত্ব ১.৫ ফুট। তবে এই ঘাসের সারি থেকে সারিতে কাটিংয়ের দূরত্ব তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই ঘাসের কাটিং বা মুথা লাগানো যায়।

সার প্রয়োগ ও পানি সেচঃ

পারা ঘাস লাগানোর ২-৩ সপ্তাহ পর একর প্রতি ৩০ কেজি ইউরিয়া দিতে হয়। পারা ঘাস পচা গোবর ও গো-শালা ধোয়া পচা পানিতে খুব ভাল হয়। রাসায়নিক সারের অভাবে ঘাস কাটার পর পচা গোবর জমিতে ছিটিয়ে দিলেও ভাল ফলন পাওয়া যায়। প্রতিবার ঘাস কাটার পর একর প্রতি ৩০-৩৫ কেজি ইউরিয়া দিলে ফলন বেশী হয়

ঘাস কাটা ও ফলনঃ

পারা ঘাস লাগানোর ৪০-৫০ দিন পরই ঘাস কেটে খাওয়ানো যায়। পরে অবস্থা অনুযায়ী ৪-৭ সপ্তাহ পর পর ঘাস কাটা যাবে। বছরে একর প্রতি পারা ঘাস উৎপাদন ৪০,০০০-৫০,০০০ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। গোড়া থেকে ৪"-৫" রেখে পারা ঘাস কাটতে হয়।

খাওয়ানোর নিয়ম ও সংরক্ষণঃ

এ ঘাস মাঠে গরু চড়িয়ে অথবা কেটে এনে খাওয়ানো যায়। তবে জমি থেকে কেটে এনে খাওয়ানোই ভাল। পারা ঘাস বাকিতে রাখা ভাল নয়, তবে সাইলেজ করে রাখা যায়।

হাইড্রোফনিক পদ্ধতিতে ঘাস চাষ

হাইড্রোফনিক মাটি ছাড়াই খাদ্যের চাষ

তথ্য-প্রযুক্তির উৎকর্ষতা এবং কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়নের ছোঁয়া লাগায় বর্তমানে আমাদের দেশেও মাটি বিহীন ঘাস চাষ শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট মাটির স্পর্শ ছাড়াই পানির উপর ফসল উৎপাদনের হাইড্রোফনিক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। প্রতি বছর জনসংখ্যা বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন কারণে আবাদ যোগ্য জমির পরিমাণ ব্যাপক হারে কমে যাচ্ছে। তাই মাটি ছাড়াই পশু খাদ্যের চাহিদা পূরণে হাইড্রোফনিক চাষ পদ্ধতি হতে পারে একটি উৎকৃষ্ট কৌশল। হাইড্রোফনিক পদ্ধতিতে বীজ হিসেবে গম, ছোলা, জোয়ার, ভুট্টা, সয়াবিন, মাষকলাই সহ বিভিন্ন শস্যের অংকুরোদগম বীজ ব্যবহার করে খাদ্যটি উৎপাদন করা যায়।

হাইড্রোফনিক ঘাস চাষ পদ্ধতি (ভুট্টা ঘাস)

১. প্রথম ভুট্টার বীজকে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে।
২. তারপর পানি ঝরিয়ে ভেজা চটের বস্তা অথবা কালো সুতি কাপড়ের ভেতরে করে ২৪ ঘন্টা অন্ধকার ঘরে রাখতে হয়।
৩. শেষে একপাশে ছিদ্র যুক্ত ট্রের ভেতরে পাতলা করে ঐ বীজ বিছিয়ে কালো কাপড় দিয়ে দুই দিন ঢেকে রাখতে হবে। এই দুই দিন খেয়াল রাখতে হয়, বাইরের আলো-বাতাস যেন না লাগে। কাপড়টি সবসময় ভেজা রাখতে হয়।
৪. তৃতীয় দিন কাপড় সরিয়ে আধাঘন্টা পরপর পানি ছিটাতে হবে।
৫. তারপর টিনশেডের একটি ঘরে বাঁশ বা কাঠের তাক বানিয়ে ট্রেগুলো সাজিয়ে রাখতে হয়।
৬. এক কেজি বীজ থেকে ৯ দিন পরে ৭ থেকে ৮ কেজি ঘাস পাওয়া যায়।
৭. পাঁচ বিঘা জমিতে যে পরিমাণ ঘাস উৎপাদন করা হয় ২৫০ ৩০০ বর্গফুটের একটি টিন শেডের ঘরে সেই পরিমাণ হাইড্রোফনিক খাদ্য উৎপাদন করা সম্ভব

উন্নত জাতের ঘাস হতে সাইলেজ তৈরীর প্রক্রিয়া

সাইলেজঃ

সাধারণভাবে বায়ুরোধক অবস্থায় সংরক্ষিত সবুজ ঘাসকে সাইলেজ বলা হয়ে থাকে। সাইলেজ হলো সংরক্ষিত সবুজ ঘাস। বায়ুহীন পরিবেশে পরিমিত আর্দ্রতাযুক্ত (৬০-৬৫%) অবস্থায় সবুজ ঘাসকে সংরক্ষণ করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত খাদ্যকে সাইলেজ বলে। যে মৌসুমে সবুজ ঘাসের আধিক্য থাকে, সে মৌসুমে সাইলেজ প্রস্তুত করা এবং সবুজ ঘাসের অভাবের সময় গবাদি পশুকে তার সরবরাহ নিশ্চিত করা। এতে কাঁচা ঘাসের অপচয় কম হয় এবং উহার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। সাইলেজ তৈরির মূলনীতি হলো, যখন উদ্ভিদ কোষ অক্সিজেন বিহীন অবস্থায় ফারমেন্টেটেড হয়, তখন ল্যাকটিক এসিড উৎপন্ন তৈরী হয়ে থাকে এবং এই ল্যাকটিক এসিড সবুজ ঘাস সংরক্ষণে সহায়তা করে থাকে।

সাইলেজের উপকারিতাঃ

১. সবুজ ঘাসকে রসালো অবস্থায় সংরক্ষণ করা যায় এবং সারা বছর কাঁচা ঘাস খাওয়ানোর নিশ্চয়তা পাওয়া যায়।
২. শক্ত ঘাসের মোটা কাণ্ড সবুজ অবস্থায় পশু খেতে পারে না, গাঁজন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার কারণে উহা নরম ও খাওয়ার উপযোগী হয়। ঘাসের সাইলেজে ৮৫% পুষ্টি পাওয়া যায়।
৩. এখানে ঘাসের সমস্ত অংশই সংরক্ষণ করা যায়। বর্ষা মৌসুমে কাঁচা ঘাস সংরক্ষণ করা কঠিন কিন্তু সাইলেজ সহজেই করা সম্ভব।
৪. সাইলেজ অত্যন্ত সুস্বাদু ও ল্যাকটিক এসিড থাকে। এটি আমিষ ও ভিটামিনের উৎস।
৫. সাইলেজের ঘ্রাণ পশুর খাদ্যের রুচি বাড়িয়ে দেয়।

অধিক উপযোগী ফডার ঃ

বিভিন্ন ধরনের ঘাস হতে সাইলেজ তৈরি করা হয়ে থাকে। সাইলেজ তৈরি করার জন্য সাধারণত নন লিগিউম জাতীয় ফডার বা সবুজ ঘাস (ওট, ভুট্টা, জোয়ার, নেপিয়ার) সবচেয়ে বেশি উপযোগী। তবে লিগিউম জাতীয় ফডার দিয়ে ও সাইলেজ তৈরি করা যেতে পারে। লিগিউম জাতীয় ফডার যেমন, খেসারি, লুসার্ন, কাউপি কিংবা মটি কলাই দিয়ে সাইলেজ তৈরী করতে হলে বিশেষ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়। যেমন, খেসারির সাথে ওট এবং কাউপির এর সাথে ভুট্টা মিশিয়ে অথবা গুড় মিশিয়ে সাইলেজ করা হয়। এভাবে সাইলেজ তৈরী করলে লিগুমিনাস ফডারে যে কার্বহাইড্রেট কম থাকে তার অভাব পূরণ করে কার্বহাইড্রেট পরিমান বৃদ্ধি পায় এবং পানির পরিমান কমে আসে। এর ফলে সাইলেজ ভাল ভাবে সংরক্ষিত হয়ে থাকে এবং গুড় ব্যবহার করলে তার পুষ্টিমানও বৃদ্ধি পায়।

বিভিন্ন ধরনের সাইলো পিট

১) টাওয়ার সাইলো, ২) প্লাস্টিক সাইলো, ৩) পিট সাইলো, ৪) সমান্তরাল সাইলো, ৫) অস্থায়ী সাইলো।

আমাদের দেশের কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে, সহজে ও কম খরচে একজন কৃষক যাতে সাইলেজ তৈরি করতে পারে তা সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করা হলো।

মাটির গর্ত পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে প্রচলিত ফডার ছাড়া ও অপ্রচলিত ফডার যেমন যেকোন ধরনের প্রাকৃতিক সবুজ ঘাস প্রভৃতিকে সাইলেজ হিসেবে সংরক্ষণ করা যায়। উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশে বর্ষা মৌসুমে যে পরিমাণ সবুজ ঘাস পাওয়া যায় তা এ পদ্ধতি অনুসরণ করে সাইলেজ করা যায়।

মাটির গর্ত তৈরী

একশত ঘনফুট (১০০) একটি মাটির গর্তে ২.৫-৩ টন সবুজ ঘাস সংরক্ষণ করা যায়। সাইলোপিট একটি উঁচু জায়গায় হতে হবে যাতে গর্তের মধ্যে পানি ঢুকতে না পারে। গর্তের গভীরতা ৩ ফুট, নিচে ৮ ফুট ও উপরে ১০ ফুট হতে হবে। গর্তের দৈর্ঘ্য সাধারণত সবুজ ঘাসের পরিমাণের উপর নির্ভর করে থাকে। গর্তের তলায় চার কোনা পাতিলের মত সমভাবে বাঁকা থাকলে ঘাস চাপতে সহজ হবে। মাটির গর্তে ঘাস সাজানোর সময় সাইলোর চারদিকে পলিথিন দিয়ে অথবা সাইলোর নীচে এবং চারদিকে খড় দিয়ে মাটি থেকে এর উপরে স্তরে স্তরে ঘাস সাজিয়ে সাইলেজ করলে ঘাস নিশ্চিতে অনেক দিন রাখা যায়।

সাইলেজ তৈরির পদ্ধতি

১. যে ঘাসের সাইলেজ প্রস্তুত করা হবে তা প্রথমে টুকরা টুকরা কেটে নিতে হবে।
২. সাইলোতে ঘাস দেওয়ার পূর্বে তলায় পলিথিন অথবা খড় বিছাতে হবে।
৩. টুকরা টুকরা করা সবুজ ঘাস সাইলো পিটের মধ্যে স্তরে স্তরে সাজাতে হবে যেন ভিতরে বাতাস না থাকে।
৪. কড়ার মত বেশী চাপাইয়া মাটির গর্তে রাখা যাবে সাইলেজ তত বেশি উন্নত মানের হবে।
৫. সাইলেজ মোলাসেস সহ অথবা মোলাসেস ছাড়া ও করা যেতে পারে।
৬. মোলাসেস ব্যবহার করলে, সবুজ ঘাসের শতকরা ৩-৪ ভাগ চিটাগুড় মেপে একটি পাত্রে নিতে হবে।
৭. তারপর ঘন চিটাগুড়ের মধ্যে ১:১ অথবা ২ : ৩ পরিমাণে পানি মিশালে ইহা ঘাসের উপর ছিটানোর উপযোগী হবে।
৮. ঝরনা বা হাত দ্বারা ছিটিয়ে এ মিশ্রণ ঘাসে সমভাবে মিশালো যাবে। প্রতি পরতে ৩০০ কেজি ঘাসের পরতে পূর্বের হিসেবে ৯ থেকে ১২ কেজি চিটাগুড় ও ৯ থেকে ১২ কেজি পানিতে মিশিয়ে উক্ত মিশ্রণ ঝরনা বা হাত দিয়ে সমভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।
৯. সবুজ ঘাসের সাথে শুকনো খড় ব্যবহার করলে এক স্তর কাচা ঘাস এবং এক স্তর খড় দিতে হবে।
১০. উপরের নিয়মে প্রতি ৩০ কেজি সবুজ ঘাসের সাথে ১৫ কেজি খড় দিতে হবে এবং ঘাস সাজানোর পর মোলাসেস দিতে হবে। খড়ের মধ্যে কোন মোলাসেস বা চিটাগুড় দিতে হবে না।
১১. গর্তটা সম্পূর্ণ ভাল ভাবে পা দিয়ে মাড়িয়ে ভাল ভাবে আটি সাঁটি করে ভিতরের বাতাস বের করে দিতে হবে। সবুজ ঘাস যত এঁটে সাজানো যাবে সাইলেজ তত সুন্দর হবে।
১২. সাইলো ভর্তি করে মাটির উপরে ৪-৫ ফুট পর্যন্ত ঘাস সাজাতে হবে।
১৩. সব শেষে পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। পলিথিন ঢাকার পর ৩-৪ ইঞ্চি পুরু করে মাটি দিতে হবে যাতে বাতাসে উড়ে না যায় বা অন্য কোন পশু দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ না হয়।
১৪. এখানে উল্লেখ্য যে সাইলো গর্ত একদিনেই সাজানো ভাল। তবে একদিনে বৃষ্টি অথবা অন্য কোন কারনে সাজানো সম্ভব না হলে প্রতিদিন অল্প অল্প করে ও কয়েকদিন ব্যাপি সাজিয়ে সাইলেজ তৈরি করা যায়।

ঝুড়ি বা ব্যাগ সাইলেজ

মাটির গর্ত ছাড়া ও পলিথিন ব্যাগে সাইলেজ তৈরি করা যায়। আমাদের দেশে যে সমস্ত কৃষক ক্ষুদ্র আকারের ডেইরী খামার পরিচালনা করেন তাদের জন্য পলিথিন ব্যাগে পদ্ধতি খুবই উপযোগী। এই পদ্ধতিতে একজন কৃষক তার প্রয়োজনের তাগিদে ৫০ কেজি থেকে ২০০ কেজি আকারের ব্যাগ সাইলেজ তৈরি করতে পারেন। এ ধরনের ব্যাগ সাইলেজ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অন্য স্থানে অতি সহজেই স্থানান্তর করা যায়। এ পদ্ধতিতে কৃষকের নিজস্ব কোন গবাদি পশু না থাকলে ও তিনি তার নিজস্ব জমিতে ঘাস উৎপাদন এবং ব্যাগ সাইলেজ করে বাজারে বিক্রি করতে পারবেন। কেননা ব্যাগ সাইলেজ অতি সহজেই পরিবহন করা যায়। মাটির গর্তে সাইলেজ তৈরীর যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, ব্যাগ পদ্ধতিতে ঠিক একই ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। ব্যাগ পরিপূর্ণ করার পর ভালভাবে মুখ বেধে রাখতে হবে। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট গবেষণা করে দেখেছেন যে, ব্যাগ পদ্ধতিতে যে কোনো সবুজ ঘাস এমনকি মেইজ স্টোভার সাইলেজ করে ৬ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করে রাখা যায়।

সাইলেজ তৈরীর সময় যে বিষয় খেয়াল রাখা উচিত

১. সাইলেজ তৈরির জন্য ঘাসে অবশ্যই ৩০-৩৫% শুষ্কপদার্থ (ড্রাইমেটার) থাকা প্রয়োজন।
২. নীচু জায়গায় সাইলো করা যাবে না।
৩. উপরের পলিথিন সুন্দর ভাবে এঁটে দিতে হবে যাতে কোন পানি সাইলেজ এর ভিতরে প্রবেশ না করে।
৪. চিটাগুড় পাতলা হলে পরিমাণ বাড়িয়ে পানি কম করে মিশাতে হবে যাতে আঠার মত ঘাসের গায়ে লেগে থাকে।
৫. ঘাস এবং খড় এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে ফাঁকা জায়গাগুলো যথাসম্ভব বন্ধ হয়ে যায়। বিশেষ করে, সাইলোর কোনাগুলো এবং পাশসমূহ পা দিয়ে পাড়িয়ে ঘাস সাজাতে হবে।
৬. গরু, কুকুর, শেয়াল হতে সাইলোর উপরের পলিথিন নষ্ট না করে সেদিকে খেয়াল করতে হবে।
৭. প্রয়োজনে সাইলেজ এডিটিভ বা প্রিজারভেটিভ সংযোজন

কয়েকটি সাইলেজ এডিটিভ বা প্রিজারভেটিভ নাম

১. চিটাগুড় ঃ ৩-৪% হারে
২. ইউরিয়া ঃ ০.৫% হারে
৩. লাইমস্টোন ঃ ০.৫-১% হারে
৪. জৈব এসিড ঃ ১% হারে
৫. ব্যাকটেরিয়াল কালচার ঃ প্রয়োজন মত

ভাল সাইলেজের বৈশিষ্ট্য

১) সাইলেজের রং হলুদাভ সবুজ, ২) ফল-আচারের ন্যায় অম্ল সুগন্ধ, ৩) পিএইচ ৩.৫-৪.৫

সাইলেজ খাওয়ানো: গবেষণায় দেখা গেছে যে, ১০০ কেজি ওজনের একটি ষাড় দৈনিক গড়ে তার দৈহিক ওজনের ১.৯২ হারে সাইলেজ শুষ্ক পদার্থ গ্রহণ করে থাকে। দুগ্ধবতী গাভী প্রতিদিন কি পরিমাণ দুধ উৎপাদন করে তার উপর ভিত্তি করে সাইলেজ সরবরাহ করতে হয়। গবেষণায় দেখা যায় যে, যেখানে সাইলেজ কে একক খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত, সেখানে একটি গাভী প্রতি ৫০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ৩ কেজি পরিমাণ সাইলেজ গ্রহণ করে থাকে। সাইলেজ এর সাথে কাচা ঘাস অথবা শুকনা খড় ও এক্ষেত্রে গবাদি পশুকে খাওয়ানো যেতে পারে। সাধারণ নিয়মে দুই ভাগ সাইলেজ এর সাথে এক ভাগ কাচা ঘাস ও এক ভাগ খড় মিশিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে।

সবুজ ঘাস প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও ব্যবহার

কাঁচা ঘাস সংরক্ষণ পদ্ধতি

মৌসুম ভিত্তিক কাঁচা ঘাস সংরক্ষণ করলে শুষ্ক মৌসুমে গো-খাদ্যের বিশেষ করে ঘাসের অভাব দূর করে গরুর স্বাস্থ্য রক্ষা ও উৎপাদন অব্যাহত রাখা সম্ভব। বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমাদের দেশের কৃষক সহজে ও স্বল্প খরচে কাঁচা ঘাস সংরক্ষণ করে শুষ্ক মৌসুমে গরুর জন্য গো-খাদ্য সরবরাহে অব্যাহত রাখতে পারেন। সংরক্ষিত এ ঘাসের গুনগত ও খাদ্যমান কাঁচা ঘাসের চেয়ে বেশী।

প্রাথমিক প্রস্তুতি প্রথমে উঁচু জায়গায় মাটিতে গর্ত তৈরি করতে হবে। গভীরতা এবং গর্তের আকার হবে ঘাসের পরিমাণ অনুযায়ী।

উপকরণ

১. কাঁচা ঘাস : গর্ত ভর্তি হয় এমন পরিমাণ।
২. চিটাগুড়: প্রতি ১০০ কেজি কাচা ঘাসের জন্য ৩-৪ কেজি চিটা-গুড়
৩. পানি: চিটা-গুড়ের সমপরিমাণ বা সামান্য বেশী।
৪. পলিথিন: গর্তটিতে সম্পূর্ণ বিছিয়ে গর্ত ভর্তি ঘাস ঢেকে দেওয়া যায় এই পরিমাণ।
৫. চিটা-গুড় মিশ্রিত পানি ছিটানোর ঝর্ণা - ১ টি।

প্রস্তুত প্রণালীঃ

১. প্রথমে গর্তে পলিথিন বিছাতে হবে। পলিথিনের পরিমাণ এরূপ যেন উপরিভাগের অংশ দ্বারা গর্ত ভর্তি ঘাস ঢেকে দেয়া যায়।
২. এবার গর্তে ঘাস ছড়িয়ে দিতে হবে। প্রথম ৪০ কেজি ঘাস গর্তে প্রবেশ করিয়ে তার উপর ১ কেজি চিটাগুড় ও ১ লিটার পানির মিশ্রণ ঝর্ণা দ্বারা ঘাসের উপর সমভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।
৩. চিটাগুড় মিশ্রিত পানি ঘাসের উপর ছড়ানোর পর পা দিয়ে উত্তম রূপে মাড়িয়ে যথাসম্ভব ঘাসের ভিতরের বাতাস বের করে দিতে হবে। পুনরায় প্রথম স্তরের মত একই পরিমাণ ঘাস ছড়িয়ে একই পরিমাণ চিটাগুড় মিশ্রিত পানি ছিটাতে হবে।
৪. গর্তটি ঘাস দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ভরাট না হওয়া পর্যন্ত অনুরূপ ভাবে পরতে পরতে ঘাস সাজাতে হবে। গর্তটি ঘাস দ্বারা পূর্ণ হলে ঘাসের স্তূপটি বাড়তি পলিথিন দ্বারা এমনভাবে ঢেকে দিতে হবে যেন বাতাস ঢুকতে না পারে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পরবর্তী সময়ে পলিথিন ছিঁড়ে না যায় বা কোন ছিদ্রের সৃষ্টি না হয়।
৫. লক্ষ্য রাখতে হবে যেন বৃষ্টির পানি গর্ত ভর্তি ঘাসে প্রবেশ করতে না পারে।
৬. গর্ত ভর্তি করার ১৫ দিন পর এ ঘাস পশুকে খাওয়ানোর উপযোগী হয়। সংরক্ষিত এ ঘাসের গুণগত মান সাধারণ ঘাস হতে বেশী এবং গরুর জন্য অত্যন্ত পছন্দনীয়।

ভিজা খড় সংরক্ষণ পদ্ধতি

বর্ষা মৌসুমে অনেক সময় ফসল আহরণের পর অবশিষ্ট ভিজা খড় শুকানো সম্ভব হয় না এবং পচে নষ্ট হয় অথবা ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হয়। ফলে গুণগত মান নষ্ট হয়। ভিজা খড় না শুকিয়ে সংরক্ষণ করা যায়। সংরক্ষিত এই ভিজা খড়ের পুষ্টিমান সাধারণ খড়ের তুলনায় বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়।

সংরক্ষণের উপায়ঃ

১. ভিজা খড় সংরক্ষণের জন্য উঁচু, প্রাণির মেলা অথবা পানি মুক্ত সহজে হয় এমন স্থান নির্বাচন করা উচিত।
২. ৬ ফুট ব্যাসের বৃত্তাকার গর্ত ১২ ফুট গভীর হতে হবে।
৩. ভিজা খড় সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের (প্রতি ১০০ কেজি খড়ের জন্য পরিমাণ মতো পলিথিন, ১.৫-২ কেজি ইউরিয়া) সমাবেশ ঘটাতে হবে।
৪. খড় সংরক্ষণের জন্য নির্বাচিত স্থানে পলিথিন বা পুরানো খড়কুটা বিছাতে হবে।
৫. এবারে ভিজা খড় ছড়িয়ে প্রতি ১০০ কেজি ভিজা খড়ের উপর ১.৫-২.০ কেজি ইউরিয়া ভালভাবে ছিটিয়ে পরতে পরতে ভিজা খড়ের স্তূপ সাজাতে হবে, খড় বেশী ভিজা হলে প্রতি ৩ স্তর পর ১ স্তর শুকনা খড়ের স্তর সাজাতে হবে।
৬. অতঃপর সম্পূর্ণ স্তূপটি পলিথিন দ্বারা এরূপে আবৃত হবে যেন কোনভাবেই স্তূপের ভিতর বাতাস প্রবেশ করতে না পারে; এজন্য স্তূপের চার পাশের বাড়তি পলিথিন মাটি দ্বারা বন্ধ করে দিতে হবে।
৭. লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে কাক, চিল, পলিথিনে কোন ছিদ্র সৃষ্টি করতে না পারে। এভাবে খড় সংরক্ষণ করলে সংরক্ষণের দুই সপ্তাহ পর হতেই সংরক্ষিত খড় গবাদি পশুকে খাওয়ানো যায়, সংরক্ষিত এ খড় ১ বৎসর পর্যন্ত পশুকে খাওয়ানো যাবে।

শুকনো খড় ও সংরক্ষিত ভিজা খড়ের পুষ্টি-মানের তুলনাঃ

পুষ্টি ও কার্যাবলী	শুকনো খড়	সংরক্ষিত খড়
প্রোটিন বা আমিষ	৪-৫%	৯-১২%
হজমের পাচ্যতা	২৭%	৬৫%
বিপাকীয় শক্তি (প্রতি কেজিতে)	৭ মেগাজুল	১০ মেগাজুল
প্রতি ১০০ কেজি দৈহিক ওজনে খাদ্য গ্রহণ	১.৭২ কেজি	২.৫ কেজি

গো খাদ্য হিসেবে ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র (ইউ এম এস)

শুধু শুকনা খড় খাওয়ালে যে কোন ধরণের গবাদী পশুর দৈহিক ওজন কমতে থাকে। অথচ কৃষকের হাতের কাছেই আমিষের উৎস হিসাবে ইউরিয়া এবং শর্করা ও খনিজের উৎস হিসাবে মোলাসেস বা চিটা গুড় বা নালি রয়েছে। ইউ এম এস খাওয়ালে গরুর ওজন ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, গরু আগ্রহ ভরে খায় এবং সর্বোপরি এটি একটি সহজ ও লাভজনক প্রযুক্তি।

প্রয়োজনীয় উপাদানঃ

১. পলিথিন ১টি (৬ ফুট ১২ ফুট)
২. বালতি ১টি (৫ লিটার পানি ধরে এমন)
৩. নিক্তি ১ টি (২৫ গ্রাম, ১ কেজি পাথর সহ)
৪. দা ১ টি খড় কাটার জন্য

ইউ. এম. এস তৈরীর পদ্ধতিঃ

১. উপাদান গুলির অনুপাত সর্বদা সঠিক রাখতে হবে অর্থাৎ ১০০ ভাগ ইউ.এম.এস এর শুষ্ক পদার্থের মধ্যে ৮২ ভাগ খড়, ১৫ ভাগ মোলাসেস এবং ৩ ভাগ ইউরিয়া থাকতে হবে। সহজ ভাষায় ১০ কেজি খড়ের জন্য ৫ লিটার পানি, ২.৫ কেজি মোলাসেস এবং ৩০০ গ্রাম ইউরিয়া লাগবে।
২. প্রথমে খড়, মোলাসেস ও ইউরিয়ার পরিমাণ মেপে নিতে হবে।
৩. মোলাসেস ও ইউরিয়া ওজনের পর প্রয়োজন মত পরিমাণ পানিতে এমন ভাবে মিশাতে হবে যাতে সম্পূর্ণ দ্রবণটি খড়ের সাথে সহজে মিশানো যায়।
৪. শুকনো খড়কে পলিথিন বিছানো বা পাকা মেঝেতে সমভাবে বিছিয়ে ইউরিয়া মোলাসেস দ্রবণটি আস্তে আস্তে ঝাঁঝরি বা হাত দিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে এবং সাথে সাথে খড়কে উল্টিয়ে দিতে হবে যাতে খড় দ্রবণ চুষে নেয়। এভাবে স্তরে স্তরে খড় সাজাতে হবে এবং ইউরিয়া মোলাসেস দ্রবণ সমভাবে মিশিয়ে নিতে হবে।

ব্যবহার পদ্ধতিঃ

১। ইউরিয়া মোলাসেস খড় সাথে সাথে খাওয়ানো যায় অথবা একবারে ২-৩ দিনের তৈরি খড় সংরক্ষণ করে আস্তে আস্তে খাওয়ানো যায়।
২। তবে ২-৩ দিনের খড় একবারে তৈরী করলে ইউএমএস পলিথিন দ্বারা ভালভাবে ঢেকে রাখতে হবে।

খাওয়ানোর পরিমাণঃ

গরু যে পরিমাণ খেতে পারে সে পরিমাণ ইউ এম এস সরবরাহ করতে হবে। তবে প্রথমে আস্তে আস্তে অভ্যস্ত করিয়ে নেওয়া ভাল।

ইউএমএস খাওয়ানোর ফল

ইউএমএস বাছুর বা বাড়ন্ত গরু, দুগ্ধবতী বা গর্ভবতী গরু ও মহিষকে খাওয়ানো যায়। গাভীকে শুকনো খড়ের পরিবর্তে ইউএমএস খাওয়ালে গাভী প্রতি দৈনিক দানাদার খাদ্যের পরিমাণ ১.৫ কেজি কমিয়েও দুধের উৎপাদন ১ লিটার বাড়ানো যায়।

সাবধানতা

ইউরিয়া, মোলাসেস, খড় ও পানির অনুপাত সঠিক হতে হবে। ইউরিয়ার পরিমাণ বেশি হলে পশু ইউরিয়া বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হতে পারে, ইউ এম এস খাওয়ানোর পর পরই পশুকে পেট ভরে পানি খেতে দেওয়া ঠিক হবেনা।
বিশেষ ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র খাওয়ানোর ১ ঘন্টা আগে বা পরে পশুকে কোন পানি পান করতে দেয়া যাবে না।

ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক

ছাঁচের মাপ

২ কেজি ওজনের ব্লক তৈরীতে ব্যবহৃত ছাঁচের মাপ দৈর্ঘ্য-৬ ইঞ্চি এবং উচ্চতা ৪ ইঞ্চি। ১০ কেজি ব্লকের মধ্যে ৫-৬ কেজি মোলাসেস বা চিটাগুড়, ২.৫-২.৬ কেজি গমের ভুষি, ৮০-৯০ গ্রাম ইউরিয়া এবং ৫০০-৬০০ গ্রাম চুনা (খাবার চুন) নেয়া থাকে।

পদ্ধতিঃ

১. প্রথমে ৫-৬ কেজি চিটাগুড় একটি পাত্রে নিতে হবে। লোহার কড়াই বা ড্রামের অর্ধাংশ বা এ জাতীয় শক্ত পাত্র হলে ভাল হয়।
২. ২.৫-৩ কেজি গমের ভুষি মেপে নিতে হবে।
৩. এবার ৩৫ গ্রাম লবণ (ভিটামিনযুক্ত) মেপে নিতে হবে।
৪. ৮০-৯০ গ্রাম ইউরিয়া আলাদা মেপে নিন।
৫. ওজনকৃত ৫০০ গ্রাম চুনের গুড়া, ইউরিয়া ও লবণ ভালভাবে মিশিয়ে নিন
৬. এবার তাপে রাখা কড়াইটি চুলার থেকে নামিয়ে নিন এবং ভালভাবে নাড়াচাড়া করুন। যতক্ষণ না নালি বা চিটাগুড়ো আঠালো জমাট ভাব আসে।
৭. ৫ নং বর্ণিত মিশ্রণটি গরম নালি বা চিটাগুড়ের সাথে মিশিয়ে দিন এবং পরে ওজনকৃত গমের ভুষি ঢেলে দিন ও একটি শক্ত কাঠি বা হাতল এর সাথে নাড়াচাড়া করে ভুষি ও ৫ নং বর্ণিত মিশ্রণ সম্পূর্ণভাবে মিশিয়ে নিন
৮. নালি, ভুসি, চুনা ইউরিয়া ও খনিজ দ্রব্য মিশ্রিত মিশ্রণ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ (ছাঁচের আকার ও ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী) নিয়ে ব্লক তৈরি করুন
৯. মিশ্রণটি ছাঁচে ঢালার পরে ছাঁচের মাপ অনুযায়ী তক্তা উপরে রেখে চাপ দিতে থাকুন যেন মিশ্রণটি শক্ত জমাট বাঁধা একটি ব্লকে পরিণত হয়
১০. সাবধানতার সহিত ব্লকটিকে ছাঁচ থেকে তুলে ৩০ মিনিট পর্যন্ত বাইরে রেখে দিলে ব্লকটি শক্ত হয়ে যায়। একসাথে অনেকগুলি বানানোর প্রয়োজন হলে সদ্য প্রস্তুতকৃত ব্লকটি পলিথিনের দ্বারা ঠিক আচ্ছাদিত করুন।

খাওয়ানোর নিয়মঃ

ইউরিয়া মোলাসেস ব্লকের উপর মোড়ানো পলিথিন সম্পূর্ণভাবে খুলে দেখুন।
ব্লকটিকে একটি শুকনো পাত্রে বা শুকনো কাঠের ছাঁচে রেখে পশুপাখিকে খেতে দিন।
ব্লকটিকে অবশ্যই অবস্থায় খেতে দিতে হবে এবং গরু মহিষের বেলায় দৈনিক ৩০০ গ্রাম ও ছাগল বা ভেড়ার ক্ষেত্রে ১০০ গ্রাম খেতে দিতে হবে।
খেতে না চাইলে ব্লকের উপর ভুষি ও লবণ ছিটিয়ে দিতে হবে।

ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক খাওয়ানোর উপকারিতা

- ইউএমবি একটি শক্তিশালী ও প্রোটিন সমৃদ্ধ জমাট খাদ্য যাতে প্রয়োজনীয় খনিজ ও ভিটামিন দেয়া আছে।
- ইউএমবি খাওয়ালে গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়ার দৈহিক ওজন বৃদ্ধি, শক্তি ও দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।
- খড় জাতীয় পশু খাদ্যের পাচ্যতা এবং গ্রহণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং খাদ্যের পুষ্টিমান বৃদ্ধি করে
- ১ কেজি ১টি ব্লকে সাধারণত ৯ মেগাজুল শক্তি ও ২৪০ গ্রাম প্রোটিন থাকে।

বিঃ দ্রঃ ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক খাওয়ানোর ১ ঘন্টা আগে বা পরে পশুকে কোন পানি পান করতে দেয়া যাবে

হাঁস পালন

ক্ষুদ্র খামারে হাঁস পালনের উদ্দেশ্যঃ

- দুস্থ, কর্মহীন ও বিধবা মহিলাদের কর্মসংস্থানে সাহায্য করা
- প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ করা
- পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণ করা
- হাঁসের ডিম এবং খাদ্য হাঁস বাজারে বিক্রি করে বাড়তি অর্থ দিয়ে জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন
- খামারীগণ ঘরে বসে স্বল্প পুঁজি খাটিয়ে অধিক লাভবান হতে পারে

হাঁসের খামার স্থাপনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় সমূহ ঃ

- খামারের জন্য নির্বাচিত স্থান বসত ঘর হতে দূরে শুষ্ক, উঁচু, সুষ্ঠু পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা বিদ্যমান এমন স্থান হতে হবে
- যাতায়াতের সুবিধা থাকতে হবে
- পর্যাপ্ত আলো ও বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে
- বিদ্যুত সরবরাহ থাকতে হবে
- আশেপাশে পঁচা ডোবা ও নর্দমা মুক্ত হতে হবে
- বাজারজাতকরণের সুবিধা থাকতে হবে

উন্নত জাতের হাঁসের জাত ও বৈশিষ্ট্য ঃ

বাংলাদেশে পালিত উন্নত জাতের কয়েকটি হাঁসের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

দেশি জাত ঃ

- পালকের রং সাদা ও কালো হয়ে থাকে
- একটি হাঁসী বছরে মাত্র ৭০-৮০ টি ডিম দেয়
- উন্নত ব্যবস্থাপনায় আবদ্ধ অবস্থায় এরা বছরে ২০০-২০৫ টি ডিম দেয়
- প্রাপ্ত বয়স্ক হাঁসার গড় ওজন ২.২৫-২.৫০ কেজি এবং হাঁসীর গড় ওজন ১.২৫-১.৫০ কেজি

দেশি জাত

খাকী ক্যাম্পবেল ঃ

- পালকের রং খাকী
- ঠোঁট নীলাভ বা কালচে
- একটি হাঁসী বছরে ২৫০-৩০০ টি ডিম দেয়
- প্রাপ্ত বয়স্ক হাঁসার গড় ওজন ২.২৫-২.৫০ কেজি এবং হাঁসীর গড় ওজন ১.২৫-১.৫০ কেজি

খাকী ক্যাম্পবেল

জিনডিং ঃ

- হাঁসার পালকের রং কালো ও সাদা মিশ্রিত
- হাঁসির পালকের রং খাকীর মাঝে কালো ফোঁটা
- ঠোঁট নীলাভ বা হলদে
- একটি হাঁসী বছরে ২৭০-৩২৫ টি ডিম দেয়
- প্রাপ্ত বয়স্ক হাঁসের গড় ওজন ২.০০-২.৫০ কেজি এবং হাঁসীর গড় ওজন ১.২৫-১.৫০ কেজি

জিনডিং

পিকিং ঃ

- হাঁসের পালকের রং সাদা
- ডিমের রং সাদা
- বার্ষিক ডিম উৎপাদন গড়ে ১৫০ টি
- প্রাপ্ত বয়স্ক হাঁসার গড় ওজন ৪.৫ কেজি
- প্রাপ্ত বয়স্ক হাঁসির গড় ওজন ৪.০ কেজি পিকিং

পিকিং

ইন্ডিয়ান রানার :

- হাঁসের পালকের রং সাদা বা বিভিন্ন রংয়ের মিশ্রণ
- ডিমের রং সাদা
- বার্ষিক ডিম উৎপাদন গড়ে ১৮০ টি
- প্রাপ্ত বয়স্ক হাঁসের গড় ওজন ১.৫-২.০ কেজি

ইন্ডিয়ান রানার

মাসকোভি :

- হাঁসের পালকের রং সাদা ও কালো মাসকোভি
- মাথায় লাল ঝুঁটি
- ডিমের রং সাদা
- বার্ষিক ডিম উৎপাদন গড়ে ১২০ টি
- প্রাপ্ত বয়স্ক হাঁসের গড় ওজন ৫ কেজি এবং হাঁসির গড় ওজন ৪.০ কেজি

ইন্ডিয়ান রানার

হাঁসের বাসস্থান ও ব্যবস্থাপনা

বাসস্থান :

- বাসস্থান এমন জায়গায় হতে হবে যা ঝড়, বৃষ্টি ও ঠাণ্ডা থেকে মুক্ত থাকে
- জায়গাটি অবশ্যই খোলামেলা স্থানে হতে হবে
- ঘর বন্যা ও জলাবদ্ধতা থেকে মুক্ত উঁচু জায়গায় স্থাপন করতে হবে
- পর্যাপ্ত আলো ও মুক্ত বাতাস চলাচলের সুযোগ থাকতে হবে
- আশে পাশের খামার, বসতবাড়ী ও রাস্তা হতে দূরে খামার স্থাপন করতে হবে
- এক খামার হতে অন্য খামারের দূরত্ব কমপক্ষে ২০০ মিটার হওয়া উত্তম
- এক শেড হতে অন্য শেডের দূরত্ব কমপক্ষে ৫ মিটার হওয়া উত্তম
- খামারের প্রয়োজনীয় মালামাল পরিবহন, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকতে হবে
- বিশুদ্ধ পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা থাকতে হবে
- বিষ্ঠা ও লিটার ব্যবস্থাপনার সঠিক ব্যবস্থা থাকতে হবে
- মুরগীর খামারের সন্নিকটে হাঁসের খামার স্থাপন করা যাবে না
- প্রতিটি হাঁসের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমাণ হাঁসের জাত ও পালন পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল
- আবদ্ধ অবস্থায় প্রতিটি হাঁসের জন্য সাধারণত ৩-৪ বর্গফুট এবং রান টাইপ পালন ব্যবস্থায় প্রতিটি হাঁসের জন্য ১৫ বর্গফুট জায়গার প্রয়োজন হয়

ঘরের তাপ :

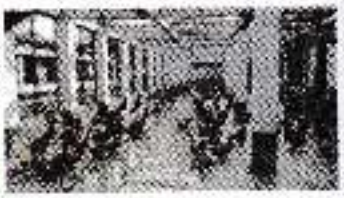

ঘরের তাপ ৪.৪ ডিগ্রী সেঃ এর কম বা ৩৭.৮ ডিগ্রী সেঃ এর বেশী হলে তা হাঁসের জন্য ক্ষতিকর। ঘরের তাপ সাধারণত ১২.৮ ডিগ্রী সেঃ থেকে ২৩.৯ ডিগ্রী সেঃ পর্যন্ত উত্তম।

ঘরের আর্দ্রতা:

ঘরের আর্দ্রতা হাঁস উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। আবহাওয়া ভাল থাকলে হাঁসের শারীরিক বৃদ্ধি, লোম গজানো এবং ডিমের উৎপাদন ভাল হয়। তাছাড়া অপ্রাকৃতিক পরিবেশ ডিম উৎপাদনে ক্ষতি করে। হাঁস সাধারণত ৭০% আর্দ্রতা সহ্য করতে পারে। আর্দ্রতা শতকরা ৩০% এর কম হলে পালক ঝরে যায়। ঘরের আর্দ্রতা ৭০% এর উর্ধ্বে হলে কক্সিডিয়া ও কৃমির উৎপাত বাড়ে এবং হাঁসকে অস্থির অবস্থায় দেখা যায়। প্রতিকারের একমাত্র উপায় হচ্ছে লিটার শুকনা রাখা এবং বায়ু চলাচলের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা।

ঘরের আলো (কৃত্রিম) ঃ

সঠিক আলোক ব্যবস্থাপনা হাঁসের দৈহিক গঠন, বৃদ্ধি এবং ডিম উৎপাদনে সহায়তা করে। ৬ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত হাঁসের বাচ্চার জন্য রাতে আলোর ব্যবস্থা রাখা বাঞ্ছনীয়। তবে মাঝে মাঝে আলো বন্ধ করে এদেরকে অন্ধকারের সাথে পরিচিত করাতে হবে। আলোক সরবরাহ সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা করা হলে খাদ্য বেশি খাবে এবং দৈহিক ওজন বৃদ্ধি পাবে। ডিম দেয়া হাঁসের জন্য ১৪-১৬ ঘণ্টা আলো সরবরাহ উত্তম।

ঘরের বাতাস চলাচল ব্যবস্থা (ভেন্টিলেশন) ঃ

দেয়ালের শতকরা ৪০ ভাগ হিসেবে ঘরের লম্বালম্বি বেড়ার তারের জালের ব্যবস্থা বা বাঁশের সাহায্যে ছিদ্র যুক্ত বেড়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

ঘরের লিটার (বিছানা) ঃ

ঘরের মেঝে পাকা হলে ভাল হয়। অন্যথায় মাটি ভিত্তির উপর ইট বিছিয়ে দিতে হবে। লিটার বা বিছানা সর্বদা শুকনা রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। সুতরাং আর্দ্রতা শোষণ করতে পারে এমন কিছু লিটার হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। ধানের খড়, ধানের তুষ, কাঠের গুড়া ইত্যাদি লিটার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। ধানের তুষ বা কাঠের গুড়া ব্যবহার করলে উঁচু লিটার (৩"-৪") ব্যবহার না করে পাতলা লিটার (১"-২") ব্যবহার করতে হবে।

হাঁসের খাদ্য ব্যবস্থাপনা

হাঁস খামার স্থাপনের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়ন করতে হলে খামারের পুষ্টি ব্যবস্থাপনা সঠিক হতে হবে। কেননা, খামারের ব্যয়ের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ এই অংশের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। এই খরচের শতকরা ৭০ ভাগের অতিরিক্ত হলে খামারে লোকসানের হার বৃদ্ধি পায়। খামার ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনাকালে খাদ্য খরচ শতকরা ৬০ হতে ৭০ ভাগের মধ্যে সীমিত রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

হাঁস-মুরগির খাদ্যের বেশীর ভাগ শর্করা পুষ্টি উপাদান যেমন দানাদার শতকরা ৪০ হতে ৬০ ভাগ এবং উপজাত অংশ শতকরা ১০ হতে ৩০ ভাগ ব্যবহার করা হয়। হাঁসের প্রতি কেজি খাদ্যে সাধারণত ২৭৫০ থেকে ৩০০০ কি. ক্যালরি শর্করা ব্যবহার করতে হয়।

আমিষ জাতীয় খাদ্য দেহ কোষ তৈরীতে সহায়তা করে। দেহের ক্ষয় প্রাপ্ত কোষ গঠন ও নবায়নের জন্য আমিষ প্রয়োজন হয়। তাছাড়া দেহের পালক উৎপাদন ও বিভিন্ন গ্রন্থি হতে হরমোন ও এনজাইম তৈরীতে আমিষ কার্যকরী ভূমিকা রাখে। আমিষের ২২ ধরনের এমাইনো এসিডের মধ্যে ৫ টি অত্যাবশ্যকীয় এমাইনো এসিড হিসাবে চিহ্নিত করা হয় যা কৃত্রিমভাবে খাদ্যে সংযোজন করতে হয়। হাঁসের খাদ্যে প্রাণিজ উৎস ও উদ্ভিদ উৎস হতে আমিষ জাতীয় খাদ্য মিশ্রণ করে তৈরী করা হয়ে থাকে।

উদ্ভিজ উৎসের খাদ্য হিসাবে সাধারণত সয়াবিন মিল, তিলের খৈল, তৈল বীজের খৈল, তুলা বীজের খৈল, সবুজ শাকসব্জি, ডালভাঙ্গা, খেসারী ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে প্রাণিজ উৎস হতে সাধারণত শুটকি মাছের গুড়া, প্রোটিন কনসেনট্রেট, শামুক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। হাঁসের খাদ্যে সাধারণত শুরুতে ২০-২২% এবং ৮ সপ্তাহ বয়সের পর থেকে ১৬-১৭% আমিষ ব্যবহৃত হয়। বাচ্চা হাঁস পালনে অধিক আমিষ সরবরাহ করলে দ্রুত ওজন বৃদ্ধি হয়। তবে এতে উৎপাদন খরচ বেড়ে যেতে পারে। সাধারণত মাংস উৎপাদনে হাঁস পালনে অধিক আমিষ সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

সাধারণত খাদ্যে উপস্থিত বিভিন্ন উপাদান হতে হাঁস ভিটামিন সংশ্লেষণ করতে পারে কিন্তু সরবরাহকৃত খাদ্য উপাদানে অনেক সময় পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রয়োজনীয় উপাদান থাকে না বিধায় কৃত্রিমভাবেও ভিটামিন খাদ্যে সংযোজন করতে হয়। ভিটামিন দ্রবণীয়তার ভিত্তিতে ২ প্রকার। যথাঃ পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন (বি গোষ্ঠি ও সি) এবং চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন (এ, ডি, ই ও কে)। সাধারণত কৃত্রিমভাবে খাদ্যে ভিটামিন বি, থায়ামিন, রিবোফ্লাবিন, নিয়াসিন, ভিটামিন এডিওই, প্যান্টোথেনিক সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

হাঁসের খাদ্যে মাইক্রো এবং ম্যাক্রো খনিজ পদার্থ পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। এসকল উপাদান সমূহ হলো ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, সালফার, পটাসিয়াম, সোডিয়াম, ক্লোরাইড, ম্যাগনেশিয়াম, আয়রণ, কপার, আয়োডিন, কোবাল্ট, জিংক, ম্যাংগানিজ ও সেলেনিয়াম ইত্যাদি। দেহ কোষের শতকরা ৬০-৭০ ভাগ পানি। খাদ্যের সাথে পর্যাপ্ত

পানি সরবরাহ অত্যন্ত জরুরী। পানির অভাব হাঁসের উৎপাদন, উৎপাদনশীলতা কমায়, দৈহিক বৃদ্ধি বিঘ্নিত করে, রোগ সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি ও মৃত্যুহার বৃদ্ধির মাধ্যমে খামারের ব্যয় বৃদ্ধি ও লোকসান বৃদ্ধি করতে পারে। পানি খাদ্য বস্তু নরম ও সহজে পরিপাকযোগ্য করে তোলে, খাদ্যের পুষ্টি উপাদান দেহের বিভিন্ন স্থানে পরিবহন, দেহে উৎপাদিত ক্ষতিকর পদার্থ অপসারণ এবং সর্বোপরি খাদ্য বিশ্লেষণ, বিপাক, হরমোন, এনজাইম ও রক্ত তৈরীতে ভূমিকা রাখে।

হাঁসের জন্য পুষ্টি নির্দেশনা

পুষ্টি উপাদান	বাচ্চা হাঁস (১-৬ সপ্তাহ)	বাড়ন্ত হাঁস (৭-১৯ সপ্তাহ)	ডিমপাড়া হাঁস (২০-৭২ সপ্তাহ)
বিপাকীয় শক্তি (কি.ক্যালরি/কেজি)	২৯০০	৩০০০	২৭৫০
প্রোটিন%	২০-২২	১৭-১৯	১৬
চর্বি%	৫	৫	৫
ক্যালসিয়াম%	১	১	৩
ম্যাংগানিজ (মিগ্রা/কেজি)	৫০	৫০	৪০
ফসফরাস%	০.৪৬	০.৩৫	০.৪০
লাইসিন	১.১৬	০.৮০	০.৯৪
আর্জিনিন	০.৯৪	১	০.৫০
থ্রিওনিন	০.৭৪	০.৩৬	০.৬০
নিয়াসিন (মিগ্রা/কেজি)	৫৫	৪০	৫৫
মিথিওনিন+সিস্টিন %	০.৭৬	০.৭৭	০.৮০
পেনটোথেনিক এসিড (মিগ্রা/কেজি)	১৫	১০	২০
ভিটামিন-এ আইইউ	১০০০০	৮০০০	১২০০০
ভিটামিন-ডি৩ (মিগ্রা/কেজি)	৬০০	২২.৫	৬২.৫
ভিটামিন-ই আইইউ		২৬.৫৭	
রিবোফ্লাভিন (মিগ্রা/কেজি)	১০	৪	১০
পাইরিডক্সিন (মিগ্রা/কেজি)	৩	৩	৩
ভিটামিন কে (মিগ্রা/কেজি)	২.৫	২.০	২.৫

বিভিন্ন বয়সের হাঁসের জন্য প্রস্তুতকৃত খাদ্য তালিকা

খাদ্য উপাদান	বাচ্চা হাঁস (১-৬ সপ্তাহ)	বাড়ন্ত হাঁস (৭-১৯ সপ্তাহ)	ডিমপাড়া হাঁস (২০-৭২ সপ্তাহ)
গম ভাঙ্গা (কেজি)	৩৬-৩৭	৩৭	৩৭
ভুট্টা ভাঙ্গা (কেজি)	১৮	১৮	১৬
চালের কুড়া (কেজি)	১৭-১৮	১৭	১৭
সয়াবিন মিল (কেজি)	২২	২২	২৩
প্রোটিন কনসেনট্রেট (কেজি)	২	২	২
ঝিনুক গুড়া/লাইম স্টোন (কেজি)	২	২	৩.৫
ডিসিপি (কেজি)	১.২৫	১.২৫	০.৭৫
ভিটামিন-খনিজ মিশ্রণ (কেজি)	০.২৫	০.২৫	০.২৫
লাইসিন (কেজি)	০.১০	০.১০	০.১০
মিথিওনিন (কেজি)	০.১০	০.১০	০.১০
লবন (কেজি)	০.৩০	০.৩০	০.৩০
মোট পরিমান (কেজি)	১০০	১০০	১০০

হাঁসের বাচ্চার ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা

ব্রুডিং এর অর্থ তাপ প্রদান করা। বাচ্চা ফুটার পর থেকে ৪ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত কৃত্রিমভাবে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বাচ্চা পালনকে ব্রুডিং বলে। এই বয়সে পালক না হওয়ায় বা ছোট থাকায় শরীর আবৃত থাকে না, এ জন্য শরীরের তাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য কৃত্রিম তাপের প্রয়োজন হয়। ব্রুডিংকালে বাচ্চাকে সঠিক তাপমাত্রায় লালন পালন করতে হয়। সাধারণত ১ম সপ্তাহে ৯৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট, ২য় সপ্তাহে ৯০ ডিগ্রী ফারেনহাইট, ৩য় সপ্তাহে ৮৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট, ৪র্থ সপ্তাহে ৮০ ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপমাত্রায় ব্রুডিং করতে হয়। ব্রুডিং এর জন্য নির্ধারিত স্থানটি শুষ্ক ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। নির্দিষ্ট তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নির্ধারিত স্থানটি হার্ডবোর্ড/চিক গার্ড দ্বারা বেষ্টিত করতে হয়। উপরে একটি হোভার স্থাপন করতে হয়। হোভারে বৈদ্যুতিক বাল্ব লাগানো থাকে। হোভারের অবস্থান উঠা-নামা করানোর মাধ্যমে ব্রুডারগার্ড এর অভ্যন্তরের তাপমাত্রা কমানো বা বাড়ানো হয়ে থাকে। সাধারণত ৭-৮ ফুট ব্যাস বিশিষ্ট একটি জায়গায় ৪০০-৫০০ টি হাঁসের বাচ্চার ব্রুডিং করা হয়ে থাকে।

ব্রুডিং এর উদ্দেশ্যঃ

- ব্রুডিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেননা এই সময়টা সঠিকভাবে পালন করা গেলে খামারে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা সম্ভব
- সঠিক ব্রুডিং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক
- বিভিন্ন পীড়ন থেকে রক্ষা করা যায়
- সকল বাচ্চা সমভাবে বাড়তে পারে
- বংশগত বৈশিষ্টের পূর্ণ বিকাশ ঘটে
- ভ্যাকসিন রেসপন্স বেশী পাওয়া যায়

তাপমাত্রা কম হওয়ায় বাচ্চা দলভুক্ত হয়েছে	তাপমাত্রা বেশি হওয়ায় বাচ্চা ব্রুডারের বেষ্টনের দিকে সরে গেছে	তাপমাত্রা সঠিক হওয়ায় বাচ্চা সব জায়গায় আছে

ব্রুডিং এর পূর্ব প্রস্তুতি ঃ

- বাচ্চা আসার ৬-৭ দিন আগেই হাঁস পালনের জন্য নির্বাচিত খামার/ঘর জীবাণুমুক্ত করতে হবে, এক্ষেত্রে প্রথমে ঘরের অভ্যন্তরস্থ সকল পুরাতন মালামাল, লিটারসহ অন্যান্য উপাদান ঘরের বাহিরে স্থানান্তর করতে হবে
- এবার ঘরের পর্দা বের করে নিতে হবে, ঘরের ভেতর ও বাহিরে মাকড়শার জাল থাকলে ভালভাবে পরিষ্কার করতে হবে
- ঘরের সকল উপকরণ ডিটারজেন্ট দিয়ে ভালভাবে ধৌত করতে হবে
- খামারের চারপাশে বাহিরে ৫ ফুট পর্যন্ত চুন ছিটাতে হবে
- এবার প্রথমে পরিষ্কার পানি দিয়ে খামারের মেঝে ভিজাতে হবে এবং ডিটারজেন্ট মিশানো পানি বা চুন পানি ছিটিয়ে ২৪ ঘন্টা রেখে দিয়ে পরবর্তীতে ভালোভাবে ঘষে মেঝে পরিষ্কার করতে হবে
- তারপর জীবাণুনাশক মিশ্রিত পানি দিয়ে মেঝে পুনরায় পরিষ্কার করতে হবে, এক্ষেত্রে জীবাণুনাশক ছিটিয়ে কয়েক ঘন্টা রেখে দিয়ে পরবর্তীতে ভালভাবে ঘষে পরিষ্কার করে পরিষ্কার পানি দিয়ে খামারের সকল সারফেস পরিষ্কার করতে হবে

- এবার খামারে আয়োডিন বা অন্য কোন এন্টিসেপটিকস (উদাহরণঃ ভিরকন বা টিমসেন) দিয়ে স্প্রে করতে হবে, পরবর্তীতে ভালোভাবে ঘর শুকাতে হবে
- ঘর শুকিয়ে গেলে খামারে প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ প্রবেশ করাতে হবে, উপাদানসমূহ প্রবেশের আগেই এগুলো ভালোভাবে জীবাণুনাশক/এন্টিসেপটিক মিশ্রিত পানি দিয়ে অবশ্যই পরিষ্কার ও শুকিয়ে নিতে হবে
- এপর্যায়ে খামারের বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থাপন ও পরীক্ষা করে নিতে হবে
- খামারে ব্রুডারগার্ড, হোভার স্থাপনের মাধ্যমে ব্রুডিং সরঞ্জাম স্থাপন করতে হবে
- বাচ্চা আসার ৩-৪ ঘন্টা আগে ব্রুডারের সকল সরঞ্জাম (লিটার, পেপার, হোভার, চিকগার্ড, খাবার পাত্র, পানির পাত্র, হোভারে বৈদ্যুতিক বাল্ব লাগানো) নির্দিষ্ট স্থানে সংযোজন ও কার্যকরীতা নিশ্চিত করতে হবে
- বাচ্চা আসার ৩ ঘন্টা আগেই হোভারের লাইট চালু করতে হবে যাতে ব্রুডারগার্ডের অভ্যন্তরে তাপমাত্রা ৯৫ ডিগ্রি ফারেনহাইটের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারে

বাচ্চা হাঁসের ব্যবস্থাপনা

ব্রুডিং ঃ

- বাচ্চা খামারে আসার ১ ঘন্টা আগে পানির পাত্রে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হবে, যাতে পানির তাপমাত্রা ৯৫ ডিগ্রি ফারেনহাইটের কাছাকাছি পৌঁছে, পানিতে ০.২৫% গ্লুকোজ (২৫গ্রাম/লিটার) মিশানো যেতে পারে যা দুর্বল বাচ্চাদেরকে সবল করে তুলবে।
- এবার খামারে আসা বাচ্চার বক্সসমূহ হোভারের নিচে স্থাপন করে কিছুক্ষণ (১০ মিনিট) রেখে দিতে হবে যাতে করে বাচ্চার গায়ের তাপমাত্রা ব্রুডিং তাপমাত্রার সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠে, এক্ষেত্রে শুরুতেই বাচ্চার বক্স খামারে প্রবেশের সময় বক্স এর উপর এন্টিসেপটিক স্প্রে করে নিতে হবে এবং বক্সের ওজন নিয়ে রাখা ভালো, এতে করে বাচ্চার গড় ওজন ও গ্রেড সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। সাধারণত একটি ভালো বাচ্চার গড় ওজন ৩৫-৪৫ গ্রাম হয়ে থাকে।
- বাচ্চা ব্রুডারে ছাড়ার সময় বাচ্চার ঠোঁট পানিতে ছোয়াতে হবে, তাতে প্রতিটি বাচ্চাই তার খাওয়ার পানির স্থান চিনতে পারে
- খাবার পাত্রে ১ম দুই-তিন ঘন্টা পর্যন্ত খাবার সরবরাহ না করাই ভালো কেননা বাচ্চা আনার সময় পেটে যে ইয়ক থাকে তা দ্রুত শুকাতে সহায়তা করে।
- বাচ্চা আসার পর ১-২ দিন পেপারে ছিটিয়ে খাবার সরবরাহ করতে হবে এবং তার পর থেকে নির্ধারিত খাবার পাত্র বা ট্রেতে খাবার সরবরাহ করতে হবে।
- ১ম সপ্তাহে প্রতি ১০০ বাচ্চার জন্য একটি খাবার পাত্র এবং ১ টি পানির পাত্র দিতে হবে।
- ২য় সপ্তাহ হতে ৩০ দিন বয়স পর্যন্ত প্রতি ৪০ টি বাচ্চার জন্য ১ টি খাবার পাত্র এবং ৫০ টি বাচ্চার জন্য ১ টি পানির পাত্র দিতে হবে।
- ৩০ দিন পর হতে প্রতি ৩০ টি বাচ্চার জন্য ১ টি খাবার পাত্র এবং ৪০ টি বাচ্চার জন্য ১ টি পানির পাত্র দিতে হবে।
- চার সপ্তাহ পর্যন্ত হাঁসের বাচ্চা পানিতে ছাড়া উচিত নয়। ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত ঘরে প্রতিপালন করে তারপর পানিতে ছাড়বার অভ্যাস করতে হবে, পানিতে ছাড়বার সময় প্রথম ১ম দিনেই সারা দিন পানিতে রাখা ঠিক নয়, ধীরে ধীরে পানিতে চলার অভ্যাস করাতে হবে, গরমকালে দুই সপ্তাহ পরেই পানিতে ছাড়া যেতে পারে।

ব্রুডিং ব্যবস্থাপনায় তাপমাত্রা ও আপেক্ষিক আর্দ্রতাঃ

ব্রুডার ঘরের আদর্শ তাপমাত্রা ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা বয়স ভেদে পরিবর্তন করতে হয়। সাধারণত শুরুতে ৯৫ ডিগ্রি তাপমাত্রা দিয়ে শুরু করে ধীরে ধীরে কমাতে হয়। বয়স ভেদে ব্রুডিং তাপমাত্রা ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা নিম্ন ছকে দেখা হলোঃ

সাধারণত ব্রুডারের তাপমাত্রা বেড়ে গেলে বাচ্চা ব্রুডারের হোভারের নিচ থেকে সরে যায় এবং তাপমাত্রা কমে গেলে বাচ্চাসমূহ হোভারের নীচে এসে জড়ো হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে হোভার উঠা-নামা করে ব্রুডারের অভ্যন্তরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

বয়স	তাপমাত্রা (ডিগ্রী ফারেনহাইট)	আপেক্ষিক আদ্রতা%
১ম সপ্তাহ	৯৫	৫৫-৬০
২য় সপ্তাহ	৯০	৫৫-৬০
৩য় সপ্তাহ	৮৫	৫৫-৬০
৪র্থ সপ্তাহ	৮০	৫৫-৬০
৫ম সপ্তাহ	৭৫	৬০-৭০

আলোক ব্যবস্থাপনা ঃ

১ম সপ্তাহে ব্রুডার হতে ৪-৫ ফুট উঁচুতে এবং ২য় সপ্তাহ হতে ৭-৮ ফুট উঁচুতে ১০০ ওয়াটের ৪ টি বাল্ব ঝুলিয়ে দিতে হবে। প্রথম থেকেই প্রতিরাতে আধা ঘন্টা- এক ঘন্টা আলো বন্ধ রেখে বাচ্চাগুলোকে অন্ধকারের সাথে পরিচিত করানো উচিত। তা না হলে রাতে হঠাৎ আলো বন্ধ হয়ে গেলে পাইলিং জনিত সমস্যায় (বাচ্চা ভয়ে জড়ো হয়ে) চাপাচাপিতে বাচ্চা মারা যেতে পারে।

বায়ু চলাচল ব্যবস্থাপনা ঃ

ব্রুডার ঘরে বায়ু চলাচল অত্যন্ত জরুরী। ব্রুডার ঘরের দূষিত বায়ু নিষ্কাশন ও বিশুদ্ধ বায়ু সরবরাহ থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাপের উৎস হতে নির্গত কার্বন মনোক্সাইড ও বাচ্চা কর্তৃক নির্গত কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস জমা হয়ে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে। তাছাড়া ঘরে সৃষ্ট অ্যামোনিয়া গ্যাস ঘরে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করতে পারে। এই জন্য মাঝে মাঝে অল্প সময়ের জন্য পর্দা খুলে গ্যাস নির্গমন, বিশুদ্ধ বায়ুর প্রবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঃ

ডিম হতে সদ্য ফুটন্ত বাচ্চার পেটে ইয়কের কিছু অংশ থেকে যায় যা থেকে প্রথম ২-৩ দিন কোন খাদ্য গ্রহণ ছাড়াই বাচ্চা বেঁচে থাকতে পারে। তবে ডিম থেকে ফুটে বাচ্চা বের হওয়ার পর দেরীতে খাদ্য ও পানি সরবরাহ করলে এদের পরবর্তীতে দৈহিক বৃদ্ধি হার কমে যেতে পারে এবং মৃত্যুহার বেড়ে যেতে পারে। এজন্যই বাচ্চা ফুটে বের হওয়ার পর অতিদ্রুত খামারে স্থানান্তর করতে হবে, প্রথমে পানি এবং পরবর্তীতে খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

- প্রথম দিন পানিতে গ্লুকোজ মেশাতে হবে
- প্রথম ১-২ দিন পানিতে বি-ভিট মিন ও স্যালাইন দিতে হবে।
- ব্রুডারে ছাড়ার পর হতে ১-২ দিন ভাঙ্গা ভুট্টা (ছোট আকারের) করে পেপারের উপর ছিটিয়ে সরবরাহ করতে হবে।
- ৩য় দিন হতেই খাদ্য খাবার পাত্রে সরবরাহ করতে হবে
- প্রতি বাচ্চা ১ম সপ্তাহে গড়ে ১৫ গ্রাম, ২য় সপ্তাহে ৪০ গ্রাম, ৩য় সপ্তাহে গড়ে ৭৫ গ্রাম, ৪র্থ সপ্তাহে ৯০ গ্রাম, ৫ম সপ্তাহে ১ [illegible] ১০০ গ্রাম পর্যন্ত খাদ্য খেতে পারে।
- প্রথম ২ সপ্তাহ পর্যন্ত খাদ্য শেষ হওয়ার সাথে সাথেই খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে এবং দৈনিক ৩-৪ বার খাদ্য দিতে হবে
- প্রথম ২ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণ ২২% এবং বিপাকীয় শক্তির পরিমাণ ২৭৫০ কিলোক্যালরী হতে হবে। তার পর হতে প্রতি সপ্তাহে ১% হারে প্রোটিনের পরিমাণ কমাতে কমাতে ১৬% এ নামবে এবং এই হারে বাজারজাত করণের পূর্ব পর্যন্ত চলতে থাকবে।

পানি ব্যবস্থাপনা ঃ

- খামারে পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ থাকতে হবে
- প্রতিদিন কমপক্ষে ৩ বার পরিমাণমত পানি সরবরাহ করতে হবে।
- পানি বিশুদ্ধ হতে হবে। প্রয়োজনে পানিতে ৩ পিপিএম হারে ক্লোরিণ প্রয়োগ করতে হবে
- খামারে পয়ঃনিষ্কাশনের যথাযথ ব্যবস্থা থাকতে হবে

বাড়ন্ত হাঁসের ব্যবস্থাপনা

বাড়ন্তকালীন সময়ে গ্রোয়িং হাঁসের ব্যবস্থাপনাঃ সাধারণত ৭-১৯ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত সময়কালকে বাড়ন্ত স্টেজ হিসেবে ধরা হয়। তবে ৮ সপ্তাহ হতে শুরু করে ডিম উৎপাদন পর্যন্ত সময়ই হাঁসের বাড়ন্ত সময়কাল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এসময়ে সঠিক ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এসময়ের ব্যবস্থাপনার উপরই নির্ভর করে খামারের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা। বাচ্চার শারীরিক গঠন ১২ সপ্তাহ বয়সের মধ্যে হয়ে থাকে। সুতরাং এই সময়ের পরিচর্যার উপর নির্ভর করে ডিম পাড়ার হার।

আলোক ব্যবস্থাপনা ঃ

- বাড়ন্তকালে কৃত্রিম আলো প্রদানের প্রয়োজনীয়তা নেই। সাধারণত ৬ সপ্তাহ বয়স থেকে কৃত্রিম আলো প্রদান সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দিতে হয়
- প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম আলোর প্রয়োজনীয়তা বাড়ন্ত অবস্থার সাথে এবং দিনের দৈর্ঘ্যের পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে
- বাড়ন্তকালে দিনের আলো ব্যতীত অপরিকল্পিতভাবে রাতে ঘরে আলো প্রদান করলে আগাম যৌন পরিপক্কতা আসবে এবং ডিম পাড়া শুরু হবে। যা পরবর্তীতে ডিম পাড়ার হারের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে এবং নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে

খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঃ

একটি হাঁসকে কি পরিমাণ খাবার দিতে হবে বা খাবে তা অনেকগুলো বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

- খাদ্য গ্রহণের হার খাদ্যে বিদ্যমান পুষ্টিমানের উপর নির্ভর করে
- ঘরের তাপমাত্রা, আদ্রতা, আলোকের পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়ও খাদ্য গ্রহণের মাত্রা পরিবর্তন করতে পারে
- খাদ্যে নির্ধারিত পরিমাণে আমিষ, ক্যালরি থাকতে হবে
- খাদ্যে সঠিক মাত্রায় অ্যামিনো এসিড, কার্বোহাইড্রেট, পানি, ফ্যাট, খনিজ লবণ ও ভিটামিন থাকতে হবে
- খামারের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও খাদ্য গ্রহণের উপর প্রভাব ফেলে
- কাঁচামাল এর গুণগতমান ও প্রক্রিয়াকরণ সঠিক না হলে খাদ্যের গুণগতমান কমে যায়
- এসকল বিষয় সঠিকভাবে নিশ্চিত করা না গেলে খামারে মৃত্যুহার বাড়বে, উৎপাদন কমবে
- কোনভাবেই মেয়াদোত্তীর্ণ খাবার খামারে সরবরাহ করা যাবে না, কেননা, মেয়াদোত্তীর্ণ খাবারে ফাঙ্গাস প্রাপ্ত হবে যা খামারে রোগের প্রাদুর্ভাব সৃষ্টি করতে পারে
- ৬ সপ্তাহ পর্যন্ত দৈনিক ৩ বার টাটকা খাবার সরবরাহ করতে হবে
- ৬ সপ্তাহ পর হতে প্রয়োজনীয় খাদ্য দৈহিক ওজনের সাথে সমন্বয় করে সরবরাহ করতে হবে
- বস্তার মুখ খোলার পর দ্রুততার সাথে খাদ্য শেষ করতে হবে
- খাদ্যের বস্তা বাঁশ বা কাঠের তৈরী পাটাতনের উপর শুষ্ক ও আলো-বাতাসযুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে
- খাদ্য ও পানির পাত্র প্রতিদিন ভালোভাবে ধৌত করতে হবে

পানি ব্যবস্থাপনা ঃ

- বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ সঠিক আছে কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে।
- বয়স বাড়ার সাথে সাথে পানির পাত্রের উচ্চতা বাড়াতে হবে ।
- হাঁসের সংখ্যা অনুপাতে পানির পাত্রের সংখ্যা ঠিক রাখতে হবে।
- দৈনিক কমপক্ষে ৪ বার পানি সরবরাহ করতে হবে
- পানির পাত্র প্রতিদিন পরিষ্কার করতে হবে।
- সুযোগ থাকা সাপেক্ষে হাঁসকে পানিতে চড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

নোটঃ আমাদের দেশে সাধারণত হাঁসকে দিনের বেলা পানিতে চড়ানো হয় এবং প্রতিদিন সকাল ও রাতে খাদ্য সরবরাহ করা হয়।

ডিম পাড়া হাঁসের ব্যবস্থাপনা

ডিমপাড়া হাঁস বাছাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ডিমপাড়া হাঁস বাছাইয়ে যেসকল বিষয় বিবেচনা করতে হবে তা হলো ঃ

- বাছাইকৃত হাঁসের ওজন প্রায় সমান হতে হবে
- সতেজ ও সবল হতে হবে এবং উজ্জ্বল/চকচকে, নরম ও মসৃণ হতে হবে
- চোখ বড় উজ্জ্বল ও সতেজ হতে হবে
- চামড়া পাতলা, নরম ও চর্বিহীন হতে হবে
- মলদ্বার বড়, পুরু ও ভেজা হতে হবে

ঘরের তাপমাত্রা ব্যবস্থাপনা ঃ

ডিমপাড়া হাঁসের ঘরের আদর্শ তাপমাত্রা ১৫-২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের দেশের তাপমাত্রায়ও হাঁস সহনশীল ও উৎপাদনশীলতা ঠিক থাকে। তবে তাপমাত্রা বেড়ে গেলে ডিম পাড়ার হার কমে যেতে পারে।

ডিমপাড়া হাঁসের খাদ্য ও পানি ব্যবস্থাপনা ঃ

- একটি ফ্লকে কি পরিমাণ খাবার দিতে হবে বা খাবে তা অনেকগুলো বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যথাঃ খাদ্যে বিদ্যমান পুষ্টিগুণ, ঘরের তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, আলোকের পরিমাণ ও বয়স ইত্যাদি
- সাধারণত প্রতিটি হাঁস ১ম ৮ সপ্তাহে ৪-৫ কেজি, ১৯ সপ্তাহ পর্যন্ত ১২-১৩ কেজি খাদ্য খায়
- একটি প্রাপ্ত বয়স্ক হাঁস দৈনিক ১৩০-১৫০ গ্রাম খাদ্য খেয়ে থাকে
- খাদ্যে নির্ধারিত পরিমাণে আমিষ, ক্যালরি, অ্যামাইনো এসিড, পানি, ফ্যাট, খনিজ লবন ও ভিটামিন থাকতে হবে
- খামারের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাও খাদ্য গ্রহণের উপর প্রভাব ফেলে
- কাঁচামাল এর গুণগতমান ও প্রক্রিয়াকরণ সঠিক না হলে খাদ্যের গুণগত মান কমে যায়
- এসকল বিষয় সঠিকভাবে নিশ্চিত করা না গেলে খামারে মৃত্যুহার বাড়বে, উৎপাদন কমবে
- কোনভাবেই মেয়াদউত্তীর্ণ খাবার খামারে সরবরাহ করা যাবে না। কেননা, মেয়াদউত্তীর্ণ খাবারে ফাঙ্গাস থাকে যা খামারে রোগের প্রাদুর্ভাব সৃষ্টি করতে পারে
- খাদ্যের বস্তা বাঁশ বা কাঠের তৈরী পাটাতনের উপর শুষ্ক ও আলো-বাতাসযুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে
- খাদ্য ও পানির পাত্র প্রতিদিন ভালোভাবে ধৌত করতে হবে

ডিমপাড়ার বাসা স্থাপন ও আলোক, ব্যবস্থাপনা

ডিম পাড়ার বাসা ঃ

- মেঝে বা মাচায় হাঁস পালন করলেও ঘরে সাধারণত ডিম পাড়ার বাসা দিতে হয় না।
- সাধারণত হাঁস লিটার এর উপর ডিম পাড়ে
- হাঁস সাধারণত রাতে এবং সকাল ৯ টার মধ্যেই ডিম পাড়ে
- তবে লিটার বা মাচা পদ্ধতিতে হাঁস পালন করলে ডিমপাড়ার ১-২ টি বক্স দিলে সুফল পাওয়া যায়
- প্রতিদিন একই সময়ে একই ব্যক্তি ডিম সংগ্রহ করতে হবে। কোন অবস্থাতেই অপরিচিত ব্যক্তি খামারে প্রবেশ করতে পারবে না

আলোক ব্যবস্থাপনা ঃ ডিম পাড়া হাঁস তথা সকল বয়সের হাঁসের আলোক ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা আলোক ব্যবস্থাপনার সাথে খামারের হাঁসের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, মৃত্যুঝুঁকি, যৌন প্রাপ্তি, দৈহিক গঠন, ডিম উৎপাদন ইত্যাদি সম্পর্কিত

প্রয়োজনীয় আলোক তালিকা		
বয়স (সপ্তাহ)	আলোক (ঘণ্টা)	আলোর প্রখরতা (লাক্স)
১-২	২৪	২০-৩০
৩	২৩	২০-৩০
৪	২২	২০-৩০
৫	২১	১০-২০
৬	২০	
৭	১৯	
৮	১৮	
৯-১৯	১২	২০-৬০
২০	১৩	
২১	১৩.৫	
২২	১৪	
২৩	১৪.৫	
২৪	১৫	
২৫-ডিমপাড়া শেষ পর্যন্ত	১৬	

হাঁসের খামারে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা

বায়োসিকিউরিটি মেনে চলে সংক্রমণ হ্রাস করাই লাভজনক খামার ব্যবস্থাপনার প্রথম শর্ত। খামারে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরী। কেননা, রোগ চিকিৎসা ব্যয়বহুল, কোন কোন রোগের নিশ্চিত চিকিৎসা নেই, চিকিৎসার মাধ্যমে রোগ নিরাময় হওয়া সত্ত্বেও অনেক সময় কাঙ্খিত উৎপাদনশীলতা অব্যাহত রাখা কঠিন। তাছাড়া, রোগের কারণে মৃত্যুঝুঁকি রয়েছে। সকল রোগের টিকা পাওয়া যায় না। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রোগসমূহের (যে সকল রোগের মৃত্যুঝুঁকি বেশি) টিকা পাওয়া যায়। এসকল রোগের বিরুদ্ধে সঠিক সময়ে টিকা প্রদান করা গেলে রোগ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে লাভজনক ও টেকসই বাণিজ্যিক খামার করা সম্ভব। হাঁসের টিকা প্রদান কার্যক্রম ছকে প্রদান করা হলো।

প্রয়োজনীয় টিকা নিম্নের ছকে দেয়া হলো :

দিন	টিকা
২১-২৮ দিন	ডাক প্লেগ
৩৫-৪২ দিন	ডাক প্লেগ বুস্টার
তারপর থেকে প্রতি ৬ মাস পর পর ডাক প্লেগ রোগের টিকা প্রদান করতে হবে।	
৪২-৬০ দিন	ডাক কলেরা
১৪ দিন পর	ডাক কলেরা বুস্টার
তারপর থেকে প্রতি ৬ মাস পর পর ডাক কলেরা রোগের টিকা প্রদান করতে হবে।	
তাছাড়া ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শক্রমে ইডিএস, আইএলটি, এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের টিকা প্রদান করা যেতে পারে।	

খামারে অন্যান্য বিবেচ্য বিষয় :

- খামারে সপ্তাহে একদিন করে ২ বেলা বি-ভিটামিন, দুই বেলা ভিটামিন এডিথ্রিই প্রদান করতে হবে।
- প্রতি ৩৫-৪০ দিন পরপর কৃমিনাশক প্রদান করতে হবে।

হাঁসের গুরুত্বপূর্ণ রোগ, লক্ষণ ও করণীয়

হাঁসের রোগ সমূহকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন, ১). ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ জাতীয় রোগ, ২). ভাইরাস জনিত রোগ, ৩). পরজীবি জনিত রোগ (প্রটোজোয়া জনিত রোগ, কৃমি জনিত রোগ, উকুন-আঁটালির আক্রমণ), ৪). ছত্রাক জনিত রোগ, ৫). বংশগত রোগ ইত্যাদি।

ডাক প্লেগ

ডাক প্লেগ বা ডাক ভাইরাল এন্টারাইটিস একটি মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি। বাংলাদেশে প্রতি বছর এ রোগে বিপুল পরিমাণ হাঁস মারা যাওয়ার তথ্য রয়েছে। হার্পিস ভাইরাস এ রোগের কারণ। এ রোগে প্রধানত বয়স্ক হাঁস আক্রান্ত হলেও অপেক্ষাকৃত কম বয়সের হাঁস এ রোগে মারা যায়।

কি ভাবে এ রোগ ছড়ায়ঃ

১. প্রধানত আক্রান্ত হাঁসের সংস্পর্শে সুস্থপ্রাণি আক্রান্ত হয়।
২. এ ভাইরাস দূষিত খাদ্যদ্রব্য ও পানির সাহায্যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বা এক খামার থেকে অন্য খামারে ছড়ায়।
৩. ডিম সংগ্রহকারী যারা এক খামার থেকে অন্য খামারে যাতায়াত করে এদের মাধ্যমে রোগের বিস্তার লাভ ঘটে।

রোগের লক্ষণঃ

হঠাৎ করে আক্রান্ত হওয়া এবং অধিক মৃত্যুর হার এ রোগের বৈশিষ্ট্য। আক্রান্ত হাঁসের খুব পিপাসা হয় এবং বার বার অল্প অল্প পানি পান করতে থাকে। আক্রান্ত হাঁস নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং চেহারা উস্কো খুসকো ভাব লক্ষ্য করা যায়। পাতলা পায়খানা সবুজ থেকে হলুদ বর্ণ ধারণ করে এবং প্রায়শই রক্ত যুক্ত থাকে। মৃত হাঁসের পায়ুপথ রক্ত দ্বারা আবৃত থাকে নাসারন্ধ্র এবং নাক দিয়ে রক্ত ঝরতে থাকে। পুরুষ হাঁসের জননেন্দ্রিয় বের হয়ে আসতে পারে এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে রক্তক্ষরণ দেখা যায়। খাদ্যনালী এবং বৃহদন্ত্রে পচন হতে পারে। আক্রান্ত হাঁস অন্ধকারে থাকতে ভালবাসে এবং আলো দেখলে ভয় পায়। ডিম পাড়া হাঁসির ডিম পাড়া বন্ধ হয়ে যায়। মৃত্যুর হার ক্ষেত্র বিশেষে ১০০% পর্যন্ত হতে পারে।

প্রতিরোধ ব্যবস্থাঃ

১. আক্রান্ত হাঁসের জন্য কোন চিকিৎসা নেই।
২. নিয়মিত ডাক প্লেগ টিকা প্রয়োগ করে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়

এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা

ইহা ভাইরাসজনিত মারাত্মক রোগ। আমাদের দেশে হাই প্যাথজেনিক ও লো প্যাথজেনিক ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে। হাঁসে এ রোগ সাধারণত কোন লক্ষণ দেখা না গেলেও হাই প্যাথজেনিক জীবাণু সংক্রমণের খামারে মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে।

রোগের লক্ষণ ঃ

- সাধারণত কোন লক্ষণ প্রকাশের আগেই মারা যেতে পারে
- মৃত্যু হার ১০০% পর্যন্ত হতে পারে তবে সাধারণত ৬০-৮০% হয়ে থাকে
- মাথা, মুখ ফুলে যেতে পারে। পায়ের লোমহীন অংশে, ঝুঁটিতে রক্ত জমাট হয়ে কালো হয়ে যেতে পারে

চিকিৎসা ঃ

- যেহেতু এ রোগে লক্ষণ প্রকাশের আগেই হঠাৎ মারা যায়, সেহেতু এ রোগের চিকিৎসা প্রদানের সুযোগ কম। তবে লক্ষণ দেখা গেলে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ মোতাবেক সঠিক রোগ নির্ণয়ের জন্য রোগ নির্ণয় কেন্দ্রে প্রেরণ করতে হবে। এরোগ নিশ্চিত হলে খামারের সকল হাঁস বিনষ্ট করে সঠিকভাবে ডিসইনফেকশন ও ডিকন্টামিনেশন করতে হয়।

রোগ প্রতিরোধ ঃ

- টিকা প্রদানই এই রোগ প্রতিরোধের একমাত্র পথ
- টিকা প্রদানের সাথে সাথে খামারের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, জীব-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী

ব্রুডার নিউমোনিয়া

এ রোগ ফাংগাস সংক্রমণ জনিত রোগ। এ রোগে আক্রান্ত হাঁসের ফুসফুসে সাদা দাগ প্রায় দেখা যায়, শ্বাসকষ্ট হয় এবং বাচ্চা মৃত্যুহার বেড়ে যায়। সাধারণত লিটার হিসেবে ব্যবহৃত ধানের তুষ বা কাঠের গুড়া ছত্রাক আক্রান্ত থাকলে, খাদ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণ না করলে এবং ব্রুডিং সঠিক না হলেই এ রোগ বিস্তার হয়

রোগের লক্ষণ ঃ

- সাধারণত কোন লক্ষণ প্রকাশের আগেই মারা যেতে পারে
- বাচ্চা হাঁস একত্রে জড়ো হয়ে থাকে, শ্বাস-প্রশ্বাসের হার বেড়ে যেতে পারে, দুর্বল হয়ে যায় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই মারা যায়

চিকিৎসা ঃ

- তু এ রোগের লক্ষণ প্রকাশের পর পানিতে তুঁতে দিয়ে চিকিৎসা প্রদান করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শক্রমে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে।

রোগ প্রতিরোধ ঃ

- প্রয়োজনীয় পরিমাণের অধিক দানাদার খাদ্য সরবরাহ না করা
- শুষ্ক ও আলোযুক্ত স্থানে খাদ্য সংরক্ষণ করতে হবে
- খামারের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, জীব-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী
- লিটার হিসেবে ব্যবহৃত ধানের তুষ বা কাঠের গুড়া ছত্রাক মুক্ত হতে হবে

ডাক কলেরা

এ রোগ ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ জনিত রোগ। ইহা সেপটিসেমিক রোগ। পাস্তুরেলা মাল্টোসিডা টাইপ এ জীবাণু সংক্রমণে এ রোগ হয়।

রোগের লক্ষণ ঃ

- সবুজ বা হলুদ রঙের ডায়রিয়া।
- সকল বয়সের হাঁস এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে।
- অধিক মৃত্যুহার।

চিকিৎসা ঃ

- এ রোগের লক্ষণ দেখা গেলে এন্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে ভেটেরিনারিয়ান দ্বারা রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

রোগ প্রতিরোধ ঃ

- প্রয়োজনীয় পরিমাণের অধিক দানাদার খাদ্য সরবরাহ না করা
- শুষ্ক ও আলোযুক্ত স্থানে খাবার সংরক্ষণ করতে হবে
- খামারের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, জীব-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী
- টিকা প্রয়োগ করতে হবে

ডাক সেপ্টিসেমিয়া/এনাটিপেস্টিপার/নিউ ডাক ডিজিস

এ রোগ ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ জনিত রোগ। ইহা সেপটিসেমিক রোগ। পাস্তুরেলা এনাটিপেস্টিপার জীবাণু সংক্রমণে এ রোগ হয়।

রোগের লক্ষণ ঃ

- আর্থ্রাইটিস, ডায়রিয়া, শ্বাসতন্ত্রে প্রদাহ ও স্নায়োবিক বৈকল্য
- ২-৮ সপ্তাহ বয়সী হাঁসে এ রোগের লক্ষণ দেখা যায়
- মৃত হাঁসের ফুসফুসে জমাট রক্ত, স্ফীতাকার যকৃত, স্প্লিনোমেগালি হয়ে থাকে
- অধিক মৃত্যু হার

চিকিৎসা ঃ

- এ রোগের লক্ষণ দেখা গেলে এন্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে, এক্ষেত্রে ভেটেরিনারিয়ান দ্বারা রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে

রোগ প্রতিরোধ ঃ

- প্রয়োজনীয় পরিমাণের অধিক দানাদার খাদ্য সরবরাহ না করা
- শুষ্ক ও আলোযুক্ত স্থানে খাবার সংরক্ষণ করতে হবে
- খামারের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, জীব-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী

ডাক ভাইরাল হেপাটাইটিস

এ রোগ ভাইরাস সংক্রমণ জনিত রোগ। ইহা পিকরনা ভাইরাস সংক্রমণের ফলে হয়ে থাকে।

রোগের লক্ষণ ঃ

- সবুজ পায়খানা, চোখ বন্ধ করে রাখে, বসে থাকে ও স্নায়োবিক বৈকল্য।
- অধিক মৃত্যু হার।

চিকিৎসা ঃ

- এ রোগের লক্ষণ দেখা গেলে লক্ষণের উপর ভিত্তি করে সিম্পটোমেটিক চিকিৎসা প্রদান করতে হবে, এক্ষেত্রে ভেটেরিনারিয়ান দ্বারা রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

রোগ প্রতিরোধ ঃ

- টিকা প্রদান করতে হবে, ৩-১১ সপ্তাহ বয়সে ১ম টিকা এবং ৪ সপ্তাহ পর বুস্টার টিকা প্রদান করতে হবে
- খামারের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, জীব-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী।

হার্ডওয়্যার ডিজিজ

এ রোগ সংক্রমণ জনিত রোগ নয়, হাঁস সাধারণত চকচকে বস্তু খেতে পছন্দ করে। ফলে কোন মেটালিক বস্তু খেয়ে ফেললে এ রোগ হতে পারে।

মাইকোটক্সিকোসিস

ভেজা খাদ্যে ফাঙ্গাস জন্মালে খাদ্যে টক্সিন তৈরী হতে পারে। টক্সিন যুক্ত খাবার খাওয়ার ফলে হাঁসে মাইকোটক্সিকোসিস হতে পারে। এ রোগ হলে হাঁসে মৃত্যুহার বাড়তে পারে। মৃত হাঁসের যকৃত ভঙ্গুর হয়, পাকস্থলীতে ক্ষত দেখা দিতে পারে। এরোগে এন্টিটক্সিন, টক্সিন বাইন্ডার দিয়ে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে।

বটুলিজম

ইহা ক্লোস্ট্রিডিয়াম টক্সিনজনিত একটি রোগ। খাদ্য সংরক্ষণ সঠিক না হলে খাদ্যে প্রোটিন জাতীয় অংশে এনারোবিক কন্ডিশনে ক্লোস্ট্রিডিয়াম বটুলিনাম নামক ব্যাকটেরিয়া বটুলিনাম নামক টক্সিন তৈরী করে। এই টক্সিন হাঁসের মৃত্যুর কারণ হয়ে দেখা দেয়। সাধারণত টিটাভড় ও পর্যাপ্ত স্যালাইন সরবরাহের মাধ্যমে এ রোগের ক্ষতিকর প্রভাব কিছুটা কমানো সম্ভব হয়ে থাকে।

কৃমিজনিত সমস্যা

হাঁসে কৃমি জনিত রোগ প্রায়শই দেখা যায়। সাধারণত গোলকৃমি (এসকারিয়াসিস), গেপ ওয়ার্ম, টেপ ওয়ার্ম জাতীয় কৃমি সংক্রমণ দেখা যেতে পারে। এ রোগ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ৩০-৬০ দিন পরপর কৃমিনাশক প্রদান করতে হবে।

বাড়ন্ত হাঁস পালনে আয়-ব্যয়ের হিসাব

খরচের খাত	পরিমাণ
স্থায়ী খরচ	
ঘর তৈরী (১০০ হাঁস)	৮০০০/-
খাবার পাত্র, পানির পাত্র, ইলেকট্রিক সরঞ্জামাদি, ব্রুডার ইত্যাদিসহ আনুষঙ্গিক ব্যয়	৩০০০/-
মোট	১১০০০/-
আবর্তক ব্যয়	
১০০ টি বাচ্চা ক্রয় বাবদ @৩০ টাকা/বাচ্চা	৩০০০/-
খাদ্য খরচ ১৪ সপ্তাহ পর্যন্ত ৯ কেজি/হাঁস হিসাবে ৯*১০০=৯০০ কেজি ২৫ টাকা/কেজি	২২৫০০/-
বিদ্যুৎ খরচ	১০০০/-
ঔষধ ও ভ্যাকসিন খরচ	১০০০/-
আনুষঙ্গিক খরচ	১০০০/-
মোট	২৮৫০০/-
সর্বমোট ব্যয়	
স্থায়ী খরচের ১/১০ হিসেবে প্রতি ব্যাচ (একবারের স্থায়ী খরচে ১০ টি ব্যাচ পালন করা যাবে)	১১০০/-
আবর্তক খরচ	২৮৫০০/-
প্রতি ব্যাচে মোট খরচ	২৯৬০০/-
আয়	
৯৫ টি বাড়ন্ত হাঁস (৫% মৃত্যু ধরে এবং প্রতিটির গড় বিক্রয় মূল্য ৫০০ বিক্রয় বাবদ	৪৭৫০০/-
লিটার বিক্রয় বাবদ আয়	৫০০/-
মোট আয়	৪৮০০০/-
নীট মুনাফা	১৮৪০০/-
সঠিক বাজার পাওয়া গেলে এবং নিয়মতভাবে পালন করা গেলে নীট মুনাফা অধিক পাওয়া যায়।	

মুরগি পালন

ক্ষুদ্র খামারে মুরগি পালনের উদ্দেশ্য ঃ

- দুস্থ, কর্মহীন ও বিধবা মহিলাদের কর্মসংস্থানে সাহায্য করা
- প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ করা
- পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণ করা
- মুরগির ডিম এবং মুরগি বাজারে বিক্রি করে নগদ অর্থ দিয়ে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন
- খামারীগণ ঘরে বসে স্বল্প পুঁজি খাটিয়ে আর্থিক লাভবান হতে পারে

মুরগির খামার স্থাপনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় সমূহঃ

- খামার তৈরীর জন্য নির্বাচিত স্থান লোকালয়/আবাসিক ঘনবসতি এলাকা হতে দূরে শুষ্ক, উঁচু, সুষ্ঠু পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা বিদ্যমান এমন স্থান হতে হবে
- যাতায়াতের সুবিধা থাকতে হবে
- পর্যাপ্ত আলো ও বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে
- বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা থাকতে হবে
- আশেপাশে পঁচা ডোবা ও নর্দমা মুক্ত হতে হবে
- বাজারজাতকরণের সুবিধা থাকতে হবে

মুরগির জাত পরিচিতি

জাত ঃ সাধারণ দেশী

দেশি মুরগি

প্রাপ্তি স্থান ঃ বাংলাদেশের সর্বত্র পাওয়া যায়। সচরাচর যে সকল মোরগ-মুরগি গ্রামে গঞ্জে, হাটে বাজারে দেখা যায়, তার প্রায় সবই এ জাতের অন্তর্ভুক্ত।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য ঃ এই জাতের মোরগ-মুরগি নির্দিষ্ট কোন রং এর অন্তর্ভুক্ত হয় না। তথাপি পর্যায়ক্রমে নিয়মতান্ত্রিক বাছাই এর মাধ্যমে লালচে বাদামি বা লালচে কালো রং এর মুরগি বর্তমানে সংখ্যায় বেশী পাওয়া যায়। তবে কালো এবং সোনালী রংয়ের মুরগিও আছে। এদের পা লোমহীন ও পায়ের নলা হলদেটে। তবে কালো রংয়ের পায়ের নলাও দেখা যায়। চামড়া হলদেটে। একক ঝুঁটি বিশিষ্ট এবং ঝুঁটির রং লাল। তবে বাদামী বা ধূসর বর্ণের ঝুঁটিও দেখা যায়। সাদা এবং লালের মিশ্রণযুক্ত কানের লতি বেশী দেখা যায়। একটি পূর্ণ বয়স্ক মোরগের ওজন ১.৫ কেজি হতে ২.৫ কেজি এবং মুরগির গড় ওজন ১.২-২.০ কেজি। বৎসরে প্রতিটি মুরগি গড়ে ৬০-৯০ ডিম দেয়। প্রতিটি ডিমের ওজন ৪০-৪৫ গ্রাম। ডিমের রং হালকা লাল থেকে গাঢ় বাদামী। মুরগি ডিম পাড়া শেষে ডিমে তা দিতে বসে। তবে নিয়ন্ত্রিত সিস্টেম বা আবদ্ধ অবস্থায় পালনের জন্য এই বৈশিষ্ট্যটি অনেকাংশে কমে গেছে। রোগ বালাই কম হয়। দৈনিক গড়ে ৭৫-৮০ গ্রাম খাদ্য খায়। প্রথম ডিম পাড়ার বয়স ৫-৬ মাস।

জাত ঃ হিলি

প্রাপ্তি স্থান ঃ চট্টগ্রাম জেলায় বিশেষ করে পার্বত্য এলাকায় এই জাতের মুরগি পাওয়া যায়। বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি [illegible] অঞ্চলের এই জাতের মুরগি পাওয়া যায়।

হিলি মুরগি

সাধারণ বৈশিষ্ট্য ঃ এই জাতের মোরগ-মুরগি সাধারণত সাদার মধ্যে কালো ছিটাযুক্ত হয়ে থাকে। তবে ধূসর এবং লালচে মুরগিও দেখা যায়। এই জাতের মুরগি তুলনামূলকভাবে দেশী জাতের মুরগি হতে বড় হয়ে থাকে। একক ঝুঁটি বিশিষ্ট এবং ঝুঁটির রং লাল। তবে বাদামী বা ধূসর বর্ণের ঝুঁটিও দেখা যায়। এদের পা লোমহীন ও পায়ের নলা সাদাটে। তবে হলুদ এবং কালো রংয়ের পায়ের নলাও দেখা যায়। চামড়া হলদেটে। সাদা এবং লালের মিশ্রণযুক্ত কানের লতি দেখা যায়। একটি পূর্ণ বয়স্ক মোরগ-মুরগির গড় ওজন যথাক্রমে ২.০ কেজি হতে ৩.৫ কেজি এবং ১.৫-২.০ কেজি। বছরে প্রতিটি মুরগি গড়ে ১৩০-১৪০ ডিম দেয়। প্রতিটি ডিমের ওজন ৬০-৪২ গ্রাম। ডিমের রং হালকা বাদামী। মুরগি ডিম পাড়া শেষে ডিমে তা দিতে বসে। তবে ইনটেনসিভ সিস্টেমে বা আবদ্ধ অবস্থায় পালনের জন্য এই বৈশিষ্ট্যটি অনেকাংশে কমে গেছে। রোগ-বালাই কম হয়। দৈনিক গড়ে ৮৫-৯০ গ্রাম খাদ্য খায়। প্রথম ডিম পাড়ার বয়স ৫-৬ মাস।

জাত ঃ আসিল

প্রাপ্তি স্থান ঃ বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার সড়াইল এলাকায় এই ধরণের মুরগি দেখা যায়।

আসিল মুরগি

সাধারণ বৈশিষ্ট্য ঃ এই জাতের মোরগ-মুরগি গাঢ় বাদামী রংয়ের হয়ে থাকে। লোমহীন পা, দেশী মোরগ হতে ওজনে বেশি এবং লড়াইয়ের জন্য বিখ্যাত। একটি পূর্ণ বয়স্ক মোরগ-মুরগির গড় ওজন যথাক্রমে ২.৫-৪ কেজি এবং ১.৭-২.৫ কেজি। বছরে প্রতিটি মুরগি গড়ে ৩০-৩৫ ডিম দেয়। প্রতিটি ডিমের ওজন ৪০-৪৫ গ্রাম। রোগ-বালাই কম হয়। দৈনিক গড়ে ১৩০ গ্রাম খাদ্য খায়। প্রথম ডিম পাড়ার বয়স ৮-১০ মাস।

জাত ঃ সোনালী

প্রাপ্তি স্থান ঃ বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় এই ধরণের মুরগির খামার দেখা যায়।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য ঃ আমাদের দেশে ১৯৯৬ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত গবেষণার ফলে আর.আই.আর জাতের মোরগের সাথে ফাউমি জাতের মুরগির মিলনের মাধ্যমে সোনালী জাতের মুরগির সৃষ্টি করা হয়। এই জাতের মোরগের গায়ের রং সোনালীর মধ্যে কালো, গলায় সাদা ফোটা ফোটা। মুরগির গায়ের রং হলুদ কালো। আকারে মাঝারি। ডিমের খোসা ক্রিম বর্ণের। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে বেশী। ডিম উৎপাদনকারী জাত হিসেবে পরিচিত। এ জাত আমাদের দেশীয় আবহাওয়ায় পালনের উপযোগী। পূর্ণ বয়স্ক একটি মোরগ ও মোরগীর ওজন যথাক্রমে ২.০-২.৫ কেজি এবং ১.৫-২.০ কেজি। এদের বার্ষিক গড় ডিম উৎপাদন ১৫০-২০০ টি। তবে সাম্প্রতিক সময়ে মাংস উৎপাদনের জন্য এ মোরগ-মুরগি পালনের পরিমাণ অধিক পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

সোনালী মুরগি

মুরগির বাচ্চার ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা

বাচ্চা ফুটার পর থেকে ৪ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত কৃত্রিমভাবে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বাচ্চা পালনকে ব্রুডিং বলে। ব্রুডিংকালে বাচ্চাকে সঠিক তাপমাত্রায় পালন করতে হয়। সাধারণত ১ম সপ্তাহে ৯৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট, ২য় সপ্তাহে ৯০ ডিগ্রি ফারেনহাইট, ৩য় সপ্তাহে ৮৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট, ৪র্থ সপ্তাহে ৮০ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রায় ব্রুডিং করতে হয়। ব্রুডিং এর জন্য নির্ধারিত স্থানটি শুষ্ক ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। নির্দিষ্ট তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নির্ধারিত স্থানটি চিকগার্ড দ্বারা বেষ্টিত করতে হয়। উপরে একটি হোভার স্থাপন করতে হবে। হোভারে বৈদ্যুতিক বাল্ব লাগানো থাকে। হোভারের অবস্থান উঠা-নামা করানোর মাধ্যমে চিকগার্ড এর অভ্যন্তরের তাপমাত্রা কমানো বা বাড়ানো হয়ে থাকে। সাধারণত ৭-৮ ফুট ব্যাস বিশিষ্ট একটি জায়গায় ৪০০-৫০০ টি দেশী মুরগির বাচ্চার ব্রুডিং করা হয়ে থাকে।

ব্রুডিং এর উদ্দেশ্য ঃ

- ব্রুডিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেননা এই সময়টি সঠিকভাবে পালন করা গেলে খামারে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা সম্ভব
- সঠিক ব্রুডিং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক
- বিভিন্ন পীড়ন থেকে রক্ষা করা যায়
- সকল বাচ্চা সমভাবে বাড়তে থাকে
- বংশগত বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ বিকাশ ঘটে
- ভ্যাক্সিনের কার্যকারীতা বেশী পাওয়া যায়

ব্রুডিং এর পূর্ব প্রস্তুতি ঃ

- বাচ্চা আসার ৬-৭ দিন আগেই মুরগি পালনের জন্য নির্বাচিত খামার/ঘর জীবাণুমুক্ত করতে হবে, এক্ষেত্রে প্রথমে ঘরের অভ্যন্তরে সকল পুরাতন মালামাল, লিটারসহ অন্যান্য উপাদান ঘরের বাহিরে স্থানান্তর করতে হবে
- এবার ঘরের পর্দা খুলে নিতে হবে, ঘরের ভেতর ও বাহিরের মাকড়শার জাল থাকলে ভালভাবে পরিষ্কার করতে হবে
- ঘরের সকল উপকরণ ডিটারজেন্ট দিয়ে ভালভাবে ধৌত করতে হবে
- খামারের চারপাশে বাহিরে ৫ ফুট পর্যন্ত চুন ছিটাতে হবে এবং ডিসইনফেকটেন্ট ছিটাতে হবে
- এবার প্রথমে পরিষ্কার পানি দিয়ে খামারের মেঝে ভিজাতে হবে এবং ডিটারজেন্ট মিশানো পানি বা চুন পাউডার ছিটিয়ে ২৪ ঘন্টা রেখে দিয়ে পরবর্তীতে ভালোভাবে ঘসে মেঝে পরিষ্কার করতে হবে
- তারপর জীবাণুনাশক মিশ্রিত পানি দিয়ে মেঝে পুনরায় পরিষ্কার করতে হবে এক্ষেত্রে জীবাণুনাশক ছিটিয়ে কয়েক ঘন্টা রেখে দিয়ে পরবর্তীতে ভালভাবে ঘষে পরিষ্কার করে পরিষ্কার পানি দিয়ে খামারের সকল জায়গা পরিষ্কার করতে হবে
- এবার খামারে আয়োডিন বা অন্য কোন এন্টিসেপটিক (উদাহরণস্বরূপ ঃ ভিরকন বা টিমসেন) দিয়ে স্প্রে করতে হবে, পরবর্তীতে ভালোভাবে ঘর শুকাতে হবে
- ঘর শুকিয়ে গেলে খামারে প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ প্রবেশ করাতে হবে, উপাদানসমূহ প্রবেশের আগেই এগুলো ভালোভাবে ডিসইনফেকটেন্ট/এন্টিসেপটিক মিশ্রিত পানি দিয়ে অবশ্যই পরিষ্কার ও শুকিয়ে নিতে হবে
- এপর্যায়ে খামারের বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থাপন ও পরীক্ষা করে নিতে হবে
- খামারে চিকগার্ড, হোভার স্থাপনের মাধ্যমে ব্রুডিং সরঞ্জাম স্থাপন করতে হবে
- বাচ্চা আসার ৩-৪ ঘন্টা আগে ব্রুডারের সকল সরঞ্জাম (লিটার, পেপার, হোভার, চিকগার্ড, খাবার পাত্র, পানির পাত্র, হোভারে বৈদ্যুতিক বাল্ব লাগানো) নির্দিষ্ট স্থানে সংযোজন ও কার্যকারীতা নিশ্চিত হতে হবে
- বাচ্চা আসার ৩ ঘন্টা আগেই হোভারের বাতি চালু করতে হবে যাতে চিকগার্ডের অভ্যন্তরে তাপমাত্রা ৯৫ ডিগ্রি ফারেনহাইটের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারে।

বাচ্চা মুরগি ব্যবস্থাপনা

ব্রুডিং :

- বাচ্চা খামারে আনার ১ঘন্টা আগে পানির পাত্রে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হবে, যাতে পানির তাপমাত্রা ৯৫ ডিগ্রি ফারেনহাইটের কাছাকাছি পৌঁছে, পানিতে ০.২৫% গ্লুকোজ (২৫ গ্রাম/লিটার) মিশানো যেতে পারে যা দুর্বল বাচ্চাদেরকে সবল করে তুলবে।
- এবার খামারে আনা বাচ্চার বক্সসমূহ হোভারের নিচে স্থাপন করে কিছুক্ষণ (১০ মিনিট) রেখে দিতে হবে যাতে করে বাচ্চার গায়ের তাপমাত্রা ব্রুডিং তাপমাত্রার সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠে, এক্ষেত্রে শুরুতেই বাচ্চার বক্স খামারে প্রবেশের সময় বক্স এর উপর এন্টিসেপটিক স্প্রে করে নিতে হবে এবং বক্সের ওজন নিয়ে রাখা ভালো, এতে করে বাচ্চার গড় ওজন ও গ্রেড সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। সাধারণত একটি ভালো বাচ্চার গড় ওজন ৩৫-৪০ গ্রাম হয়ে থাকে।
- বাচ্চা ব্রুডারে ছাড়ার সময় বাচ্চার ঠোঁট পানিতে ডোবাতে হবে, তাতে প্রতিটি বাচ্চাই তার খাওয়ার পানির স্থান চিনতে পারে
- খাবার পাত্রে ১ম দুই-তিন ঘন্টা পর্যন্ত খাবার সরবরাহ না করাই ভালো কেননা বাচ্চা জন্মের সময় পেটে যে ইয়ক থাকে তা দ্রুত শুকাতে সহায়তা করে
- বাচ্চা আসার পর ১-২ দিন পেপারে ছিটিয়ে খাবার সরবরাহ করতে হবে এবং তার পর থেকে নির্ধারিত খাবার পাত্র বা ট্রেতে খাবার সরবরাহ করতে হবে
- সাধারণত ১ম সপ্তাহে প্রতি ১০০ বাচ্চার জন্য একটি খাবার পাত্র এবং ১ টি পানির পাত্র দিতে হবে
- ২য় সপ্তাহ হতে ৩০ দিন বয়স পর্যন্ত প্রতি ৪০ টি বাচ্চার জন্য ১ টি খাবার পাত্র এবং ৫০ টি বাচ্চার জন্য ১ টি পানির পাত্র দিতে হবে
- ৩০ দিন পর হতে প্রতি ৩০ টি বাচ্চার জন্য ১ টি খাবার পাত্র এবং ৪০ টি বাচ্চার জন্য ১ টি পানির পাত্র দিতে হবে

ব্রুডিং ব্যবস্থাপনায় তাপমাত্রা ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা

ব্রুডার ঘরের আদর্শ তাপমাত্রা ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা বয়সভেদে পরিবর্তন করতে হয়। সাধারণত শুরুতে ৯৫ ডিগ্রি তাপমাত্রা দিয়ে শুরু হয়ে ধীরে ধীরে কমাতে হয়। বয়সভেদে ব্রুডিং তাপমাত্রা ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছকে দেয়া হলো

বয়স	তাপমাত্রা (ডিগ্রি ফারেনহাইট)	আপেক্ষিক আর্দ্রতা%
১ম সপ্তাহ	৯৫	৫৫-৬০
২য় সপ্তাহ	৯০	৫৫-৬০
৩য় সপ্তাহ	৮৫	৫৫-৬০
৪র্থ সপ্তাহ	৮০	৫৫-৬০
৫ম সপ্তাহ	৭৫	৬০-৭০

সাধারণত ব্রুডারের তাপমাত্রা বেড়ে গেলে বাচ্চা ব্রুডারের হোভারের নিচ থেকে সরে যায় এবং তাপমাত্রা কমে গেলে বাচ্চাসমূহ হোভারের নীচে এসে জড়ো হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে হোভার উঠা-নামা করে ব্রুডারের অভ্যন্তরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে

তাপমাত্রা কম হওয়ায় বাচ্চা জড়ো হয়েছে	তাপমাত্রা বেশি হওয়ায় বাচ্চা ব্রুডারের দেয়ালের দিকে সরে গেছে	তাপমাত্রা সঠিক হওয়ায় বাচ্চা সব জায়গায় আছে

আলোক ব্যবস্থাপনা ঃ

১ম সপ্তাহে ব্রুডার হতে ৪-৫ ফুট উঁচুতে এবং ২য় সপ্তাহ হতে ৭-৮ ফুট উঁচুতে ১০০ ওয়াটের ৪ টি বাল্ব ঝুলিয়ে দিতে হবে। প্রথম থেকেই প্রতিরাতে এক ঘন্টা এক ঘন্টা আলো বন্ধ রেখে বাচ্চাগুলোকে আঁধারের সাথে পরিচিত করানো উচিত। তা না হলে রাতে হঠাৎ আলো বন্ধ হয়ে গেলে পাইলিং জনিত সমস্যায় (বাচ্চা ভয়ে জড়ো হয়ে) চাপাচাপিতে বাচ্চা মারা যেতে পারে।

বায়ু চলাচল ব্যবস্থাপনা ঃ

ব্রুডার ঘরে বায়ু চলাচল অত্যন্ত জরুরী। ব্রুডার ঘরের দূষিত বায়ো নিষ্কাশন ও বিশুদ্ধ বায়ু সরবরাহ থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাপের উৎস হতে নির্গত কার্বন মনো অক্সাইড ও বাচ্চা কর্তৃক নির্গত কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস জমা হয়ে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে। তাছাড়া ঘরে সৃষ্ট অ্যামোনিয়া গ্যাস ঘরে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করতে পারে। এই জন্য অল্প সময়ের জন্য পর্দা খুলে গ্যাস নিষ্কাশন ও বিশুদ্ধ বায়ুর প্রবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঃ

ডিম হতে সদ্য ফুটন্ত বাচ্চার পেটে ইয়োকটির কিছু অংশ থেকে যায় যা থেকে প্রথম ২-৩ দিন কোন খাদ্য গ্রহণ ছাড়াই বাচ্চা বেঁচে থাকতে পারে। তবে ডিম থেকে বাচ্চা ফুটে বের হওয়ার পর দেরীতে খাদ্য ও পানি সরবরাহ করলে এদের পরবর্তীতে দৈহিক বৃদ্ধি হার কমে যেতে পারে এবং মৃত্যুহার বেড়ে যেতে পারে। এ কারণে বাচ্চা ফুটে বের হওয়ার পর অতিদ্রুত খামারে স্থানান্তর করতে হবে, প্রথমে পানি এবং পরবর্তীতে খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

- ➢ ১ম দিন পানিতে গ্লুকোজ মেশাতে হবে।
- ➢ ১ম ১-২ দিন পানিতে বি-ভিটামিন, ভিটামিন- সি ও স্যালাইন দিতে হবে।
- ➢ ব্রুডারে ছাড়ার পর হতে ১-২ দিন ভুট্টাভাঙ্গা (ছোট আকারের) পেপারের উপর ছিটিয়ে সরবরাহ করতে হবে।
- ➢ ৩য় দিন হতেই খাদ্য খাবার পাত্রে সরবরাহ করতে হবে।
- ➢ প্রতি বাচ্চা ১ম সপ্তাহে গড়ে দৈনিক ৫ গ্রাম, ২য় সপ্তাহে ১০ গ্রাম এবং তারপর হতে প্রতিসপ্তাহে আরো ৫ গ্রাম বেশী হারে খাদ্য খায়। এভাবে ৮ম সপ্তাহে প্রতিটি বাচ্চা দৈনিক গড়ে ৪০ গ্রাম খাবার খায়।
- ➢ প্রথম ২ সপ্তাহ পর্যন্ত খাদ্য শেষ হওয়ার সাথে সাথেই খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে দৈনিক ৩-৪ বার খাদ্য দিতে হবে। ৩য় সপ্তাহে দৈনিক ৩ বার এবং তার পর থেকে দৈনিক ২ বার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

পানি ব্যবস্থাপনা ঃ

- ➢ খামারে পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ থাকতে হবে।
- ➢ প্রতিদিন কমপক্ষে ৩ বার পরিমাণমত পানি সরবরাহ করতে হবে।
- ➢ পানি বিশুদ্ধ হতে হবে। প্রয়োজনে পানিতে ৩ পিপিএম মাত্রায় ক্লোরিন প্রয়োগ করতে হবে।
- ➢ খামারে পয়ঃনিষ্কাশনের যথাযথ ব্যবস্থা থাকতে হবে।

বাড়ন্ত মুরগির ব্যবস্থাপনা

বাড়ন্তকালীন সময়ে পুলেট এর ব্যবস্থাপনা ঃ

সাধারণত ৮-১৬ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত সময়কালকে মুরগির পুলেট স্টেজ হিসাবে ধরা হয়। তবে ৮ সপ্তাহ হতে শুরু করে ডিম উৎপাদন পর্যন্ত সময়ই মুরগির পুলেট স্টেজ। এসময়ে পোষণ-মুরগীর সঠিক ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এসময়ের ব্যবস্থাপনার উপরই নির্ভর করে পরবর্তী উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা। বাচ্চার শারীরিক গঠন ১২ সপ্তাহ বয়সের মধ্যে হয়ে থাকে। সুতরাং এই সময়ের পরিচর্যার উপর নির্ভর করে ডিম পাড়ার হার উল্লেখ্য, এ সময়ে প্রয়োজন অনুসারে ঠোঁট কাটার ব্যবস্থা করতে হবে।

আলোক ব্যবস্থাপনা ঃ

- ➢ বাড়ন্তকালে কৃত্রিম আলো প্রদানের প্রয়োজনীয়তা নেই, সাধারণত ১৩ সপ্তাহ বয়স থেকে কৃত্রিম আলো প্রদান সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দিতে হয়।
- ➢ প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম আলোর প্রয়োজনীয়তা মুরগির বাড়ন্ত অবস্থার সাথে এবং দিনের দৈর্ঘ্যের পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে

- বাড়ন্তকালে দিনের আলো ব্যতীত অপরিকল্পিতভাবে রাতে ঘরে আলো প্রদান করলে অকালে যৌন পরিপক্কতা অর্জন করবে এবং ডিম পাড়া শুরু হবে, যা পরবর্তীতে ডিম পাড়ার হারের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে এবং নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে
- বাচ্চা উঠার পর থেকেই প্রতি সপ্তাহে এক বা দুটা করে কৃত্রিম আলো কমাতে হয় যা ১৩ তম সপ্তাহে কৃত্রিম আলো একেবারে বন্ধ করতে হবে

খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঃ

একটি ফ্লকে কি পরিমাণ খাবার দিতে হবে বা হবে তা অনেকগুলো বিষয়ের উপর নির্ভর করে-

- মুরগির খাদ্য গ্রহণের হার খাদ্যে বিদ্যমান পুষ্টিগুণের উপর নির্ভরশীল।
- ঘরের তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, অ্যামোনিয়া পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়ও খাদ্য গ্রহণের হার পরিবর্তন করতে পারে
- খাদ্যে নির্ধারিত পরিমাণে প্রোটিন, ক্যালোরি থাকতে হবে।
- খাদ্যে সঠিকমাত্রায় অ্যামাইনো এসিড, কার্বোহাইড্রেট, পানি, ফ্যাট, খনিজ লবণ ও ভিটামিন থাকতে হবে
- খামারের পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা ও খাদ্য গ্রহণের উপর প্রভাব ফেলে
- কাঁচামাল এর গুণগতমান ও প্রক্রিয়াকরণ সঠিক না হলে খাদ্যের গুণগতমান কমে যায়।
- কোনভাবেই মেয়াদউত্তীর্ণ খাবার খামারে সরবরাহ করা যাবে না।
- ৬ সপ্তাহ পর্যন্ত দৈনিক ৩ বার টাটকা খাবার সরবরাহ করতে হবে
- ৯ সপ্তাহ পর হতে প্রয়োজনীয় খাদ্য দৈহিক ওজনের সাথে সমন্বয় করে সরবরাহ করতে হবে
- খাদ্যের মুখ খোলার পর দ্রুততার সাথে খাদ্য শেষ করতে হবে
- খাদ্যের ব্যাগ বাঁশ বা কাঠের তৈরী পাটাতনের উপর শুষ্ক ও আলো-বাতাসযুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে
- খাদ্য ও পানির পাত্র প্রতিদিন ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে

৯-১৬ সপ্তাহ পর্যন্ত বাড়ন্ত মুরগির পুষ্টি

পুষ্টি উপাদান	চাহিদার
বিপাকীয় শক্তি (কি.ক্যালরি/কেজি)	২৮০০
প্রোটিন%	১৬
চর্বি%	৩.৫
আঁশ%	৫.১
ভস্মীয় অংশ%	১১
ক্যালসিয়াম	০.৯০
সোডিয়াম	০.০৬
পটাসিয়াম	০.২২
ক্লোরাইড	০.৭৫
ফসফরাস	০.২৩
লাইসিন	০.৯১
মিথিওনিন	০.৪০
মিথিওনিন+সিস্টিন	০.৮০
ট্রিপটোফেন	০.১৪
ভিটামিন-এ আইইউ	১৩২৭.৫
ভিটামিন-ই আইইউ	২৬.৪৭
ফলিক এসিড গ্রাম	০.৯০

৯-১৬ সপ্তাহ বয়সী বাড়ন্ত মুরগির খাদ্য তালিকাঃ

খাদ্য উপাদান	পরিমাণ (কেজি)
ভুট্টা	৫৬
চালের কুড়া	১৫
সয়াবিন মিল	৯.৫০
গমের ভুষি	৯.৫০
ঝিনুকের খোসা	১.৮১
লাইমস্টোন	১.৪০
ডিসিপি	০.৮০
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.২৫
লাইসিন	০.১০
মিথিওনিন	০.১০
লবণ	০.২৫
মোট	১০০

বাড়ন্ত মুরগির প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ

বয়স (সপ্তাহ)	শারীরিক ওজন (গ্রাম)	খাদ্য গ্রহণ (গ্রাম/মুরগি/দিন)
৯	৮২৫	৪৮
১০	৯৫৬	৫১.২৪
১১	১০৮৩	৫৪.৭২
১২	১১৯৩	৫৭.৫
১৩	১৩০৭	৬০.৮৫
১৪	১৪১৭	৬৪
১৫	১৫০৪	৬৭.৫৬
১৬	১৫৯১	৭০.৮৪

পানি ব্যবস্থাপনা ঃ

- বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ সঠিক আছে কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে
- বয়স বাড়ার সাথে সাথে পানির পাত্রের উচ্চতা বাড়াতে হবে
- মুরগির সংখ্যা অনুপাতে পানির পাত্রের সংখ্যা ঠিক রাখতে হবে
- দৈনিক কমপক্ষে ৪ বার পানি সরবরাহ করতে হবে
- পানির পাত্র প্রতিদিন পরিষ্কার করতে হবে

ডিমপাড়া মুরগির ব্যবস্থাপনা

ডিমপাড়া মুরগি বাছাইয়ে যেসকল বিষয় বিবেচনা করতে হবে তা হলো ঃ

- বাছাইকৃত মুরগির ওজন প্রায় সমান হতে হবে
- সতেজ ও সবল হতে হবে
- ঝুটি বড়, লাল, উজ্জ্বল, নরম ও মসৃণ হতে হবে
- ঠোঁট মোটা ও বাঁকা হতে হবে
- চোখ বড় উজ্জ্বল ও সতেজ হতে হবে
- কানের লতি বড়, উজ্জ্বল ও নরম হতে হবে
- চামড়া পাতলা, নরম ও চর্বিহীন হতে হবে
- মলদ্বার বড়, পুরু ও ভেজা হতে হবে

ঘরের তাপমাত্রা ব্যবস্থাপনা ঃ

ডিমপাড়া মুরগির ঘরের আদর্শ তাপমাত্রা ১৫-২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের দেশের তাপমাত্রাতেও লেয়ার মুরগি সহনশীল ও উৎপাদনশীলতা ঠিক থাকে। তবে তাপমাত্রা বেড়ে গেলে ডিম পাড়ার হার কমে যেতে পারে।

ডিমপাড়া মুরগির খাদ্য ও পানি ব্যবস্থাপনা ঃ

- একটি মুরগিকে কি পরিমাণ খাবার দিতে হবে বা খাবে তা অনেকগুলো বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যথাঃ খাদ্যে বিদ্যমান পুষ্টিগুণ, ঘরের তাপমাত্রা, আদ্রতা, আলোকের পরিমাণ ইত্যাদি
- খাদ্যে নির্ধারিত পরিমাণে আমিষ, শর্করা, এমাইনোএসিড, পানি, ফ্যাট, খনিজ লবণ ও ভিটামিন থাকতে হবে
- খামারের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাও খাদ্য গ্রহণের উপর প্রভাব ফেলে
- খাদ্যের উপাদান এর গুণগতমান ও প্রক্রিয়াকরণ সঠিক না হলে খাদ্যের গুণগত মান কমে যায়
- কোনভাবেই মেয়াদোত্তীর্ণ খাবার খামারে সরবরাহ করা যাবে না; কেননা, মেয়াদউত্তীর্ণ খাবারে ফাঙ্গাস গ্রোথ হবে যা খামারে রোগের প্রাদুর্ভাব সৃষ্টি করতে পারে
- খাদ্যের ব্যাগ বাঁশ বা কাঠের তৈরী পাটাতনের উপর শুষ্ক ও আলো-বাতাসযুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে
- খাদ্য ও পানির পাত্র প্রতিদিন ভালোভাবে ধৌত করতে হবে
- ডিমপাড়া মুরগি সাধারণত গড়ে দৈনিক ১০০-১১০ গ্রাম খাদ্য গ্রহণ করে
- এসকল বিষয় সঠিকভাবে নিশ্চিত করা না গেলে খামারে মৃত্যুহার বাড়বে, উৎপাদন কমবে

২০-৭২ সপ্তাহ পর্যন্ত সোনালী মুরগির পুষ্টি নির্দেশনাঃ	
পুষ্টি উপাদান	লেয়ার
বিপাকিয় শক্তি (কি.ক্যালরি/কেজি)	২৭০০
প্রোটিন %	১৬
চর্বি%	৩.৫
আঁশ%	৪.১৭
জলীয় অংশ %	১১.৪০
ক্যালসিয়াম	৩.৫২
সোডিয়াম	০.৩১
পটাসিয়াম	০.৯
ক্লোরাইড	০.৬২
ফসফরাস	০.৫৩
লাইসিন	০.৭৭
মিথিওনিন	০.৩৯
মিথিওনিন--সিসটিন	০.৬২
ট্রিপটোফেন	০.৪২
আরজিনিন	১.০
ভিটামিন-এ আইইউ	৮৮.২
ভিটামিন ই আইইউ	২২.৫
ফলিক এসিড গ্রাম	০.৭৬

১৭-৭২ সপ্তাহ বয়সী মুরগির খাদ্য তালিকাঃ	
খাদ্য উপাদান	পরিমান (কেজি)
ভুট্টা	৪৬.৫
চালের কুড়া	১৪.৫
সয়াবিন মিল	১৪.৯০
গমের ভুষি	৭.০৫
প্রোটিন কনসেনট্রেট	৭,৯০
ঝিনুকের গুড়া/লাইমস্টোন	৭.০০
ডিসিপি	১.৫
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০,২৫
লাইসিন	০,১০
মিথিওনিন	০.১০
লবন	০.৪০
মোট	১০০

ডিম পাড়া মুরগির বাসস্থান, ডিমপাড়ার বাসা স্থাপন ও আলোক

ঘর তৈরী ঃ

- ৫ ফুট লম্বা, ৪ ফুট চওড়া এবং ৩.৫ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট একটি ঘরে ১০-১৫ টি মুরগি পালন করা যায়
- ১০০০ টি সোনালি মুরগি পালনের জন্য একটি ঘরের আকার ৪০ ফুট * ২০ ফুট অর্থাৎ ৮০০ বর্গফুট হতে হবে যা পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা হওয়া বাঞ্ছনীয়, ঘরের উচ্চতা ৮-৯ ফুট হলে ভালো ।

মুরগির ঠোঁট কাটা (ডি-বেকিং) ঃ

মুরগির ঠোঁট লম্বা ও সুচালো হলে মুরগি ঠিকভাবে খাদ্য খেতে পারে না, খাদ্য অপচয় হয় এবং ঠোকরা-ঠুকরির প্রবণতা দেখা যায়। তাই নির্দিষ্ট বয়সে ঠোঁটে হেকা এবং কাটার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ঠোঁট কাটা বা হেকা দেয়াকেই ডিবিকিং বলা হয়। ঠোঁট কাটার সময় নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ

বয়স	ডিবেকিং পদ্ধতি	মন্তব্য
৮-১০দিন	হেকা দেয়া	
১২ ১৩ সপ্তাহ	ঠোঁট কাটা	ঠোঁট কাটার আগে মুরগিকে অবশ্যই ভিটামিন কে, ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি পানি খাওয়াতে হবে

মুরগির ঠোঁট অবশ্যই দক্ষ লোক দিয়ে কাটতে হবে। ঠোঁটের অগ্রভাগের ১/৩ অংশ কাটাতে হবে এবং সঠিকভাবে কটারাইজ করাতে হবে। ঠোঁট কাটার আগে এবং পরে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন ও ইলেকট্রোলাইট সরবরাহ করতে হবে। স্ট্রেস কন্ডিশনে ঠোঁট কাটা যাবে না।

ডিম পাড়ার বাসা ঃ

- মেঝে বা মাচায় মুরগি পালন করলে ঘরে ডিম পাড়ার বাসা দিতে হবে। মেঝেতে ডিম পাড়লে মুরগিতে ডিম খাওয়ার বদ অভ্যাস তৈরী এবং ক্রমধারে ঠোকরানোর অভ্যাস তৈরী হতে পারে।
- লিটার বা মাচা পদ্ধতিতে মুরগি পালন করলে ডিমপাড়ার বক্স দিতে হয়, প্রতি ৪-৫টি মুরগির জন্য বক্সটির আকার ১'×১'×১.২' (দৈর্ঘ্য×প্রস্থ×উচ্চতা) ফুট হতে হবে।
- মুরগি ডিম পাড়া শুরু করার ২ সপ্তাহ আগেই বক্স স্থাপন করতে হবে এবং বক্সে আরামপ্রদ দ্রব্যাদি লিটার হিসাবে প্রদান করাতে হবে।
- প্রতিদিন একই সময়ে একই ব্যক্তিকে ডিম সংগ্রহ করতে হবে। কোন অবস্থাতেই অপরিচিত ব্যক্তি খামারে প্রবেশ করতে পারবে না।

আলোক ব্যবস্থাপনা ঃ

ডিম পাড়া মুরগি তথা সকল বয়সের মুরগির আলোক ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা আলোক ব্যবস্থাপনার সাথে খামারের মুরগির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, মৃত্যুহার, যৌন প্রাপ্তি, দৈহিক গঠন, ডিম উৎপাদন ইত্যাদি সম্পর্কিত। প্রয়োজনীয় আলোক তালিকা সারণীতে দেয়া হলো ঃ

বয়স (সপ্তাহ)	আলোক সময়কাল (ঘণ্টা) (প্রাকৃতিক+কৃত্রিম)	আলোর প্রখরতা (লাক্স)
১-২	২৪	২০-৩০
৩	২৩	২০-৩০
৪	২২	২০-৩০
৫	২১	১০-২০
৬	২০	
৭	১৯	
৮	১৮	
৯	১৭	
১০	১৬	
১১	১৫	
১২	১৪	
১৩	১৩	
১৪-১৮	১২	২০-৩০
১৯	১২	
২০	১৩	
২১	১৩.৫	
২২	১৪	
২৩	১৪.৫	
২৪	১৫	
ডিমপাড়া শেষ পর্যন্ত	১৬	

মুরগির খামারের জীবনিরাপত্তা ও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা

মুরগির খামারে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা ঃ

খামারে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরী। বায়োসিকিউরিটি মেনে চলে সংক্রমন হ্রাস করাই লাভজনক খামার ব্যবস্থাপনার প্রথম শর্ত। সঠিক সময়ে টিকা প্রদান করা গেলে মুরগির রোগ নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে লাভজনক ও টেকসই সোনালী মুরগির বাণিজ্যিক খামার করা সম্ভব। মুরগির টিকা প্রদান কার্যক্রম ছকে প্রদান করা হলো ঃ
মাংস উৎপাদনে সোনালী মুরগি সাধারণত ২-৩ মাস বয়স পর্যন্ত পালন করে বাজারজাত করা হয়ে থাকে। প্রয়োজনীয় টিকা নিম্ন ছকে দেয়া হলো ঃ

ডিম উৎপাদনে সোনালী মুরগির প্রয়োজনীয় টিকা নিম্ন ছকে দেয়া হলো ঃ

দিন	টিকা
১ দিন	মারেক্স
৫-৭ দিন	বি. সি. আর. ডি. বি.
১০-১২ দিন	গামবোরো
১৭-১৯ দিন	গামবোরো
২১-২৩ দিন	বি. সি. আর. ডি. বি.
২৮ দিন	ফাউলপক্স
৬০ দিন	আরডিভি/ রানীক্ষেত
৭০ দিন	ফাউলপক্স
১০৫ দিন	রানীক্ষেত
১১০ দিন	ইনফেকশাস ব্রংকাইটিস
তাছাড়া ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শক্রমে কলেরা, ইডিএস, এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের টিকা প্রদান করা যেতে পারে।	

খামারে অন্যান্য বিবেচ্য বিষয় ঃ

- খামারে সপ্তাহে ১ দিন ২ বেলা বি-ভিটামিন, দুই বেলা ভিটামিন এডিই প্রদান করতে হবে
- প্রতি ৩৫-৪০ দিন পরপর কৃমিনাশক প্রদান করতে হবে।

মুরগির গুরুত্বপূর্ণ রোগ, লক্ষণ ও করনীয়

সোনালী মুরগি তুলনামূলকভাবে রোগ সহনশীল হলেও কিছু কিছু রোগ খামারের ক্ষতি সাধন করতে পারে। রোগ সমূহকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন ঃ ব্যাকটেরিয়া সংক্রমন জাতীয় রোগ, ভাইরাস জনিত রোগ, পরজীবি জনিত রোগ (প্রোটোজোয়া জনিত রোগ, কৃমি জনিত রোগ, উকুন-আঠালির আক্রমণ), অপুষ্টি জনিত রোগ, বংশগত রোগ ইত্যাদি।

এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা

ইহা ভাইরাসজনিত মারাত্মক রোগ। আমাদের দেশে হাই প্যাথজেনিক ও লো-প্যাথজেনিক ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস দ্বারা মুরগিতে এ রোগ হয়ে থাকে।

রোগের লক্ষণ ঃ

- ➢ সাধারণত কোন লক্ষণ প্রকাশের আগেই মুরগি মারা যেতে পারে
- ➢ মৃত্যু হার ১০০% পর্যন্ত হতে পারে তবে সাধারণত ৬০-৮০% হয়ে থাকে
- ➢ মাথা, মুখ, ঝুটি ফুলে যেতে পারে, পায়ের লোমহীন অংশে, ঝুটিতে রক্ত জমাট হয়ে কালো হয়ে যেতে পারে

চিকিৎসা ঃ

যেহেতু এ রোগে লক্ষণ প্রকাশের আগেই হঠাৎ মারা যায়, সেহেতু এ রোগের চিকিৎসা প্রদানের সুযোগ কম। তবে লক্ষণ দেখা গেলে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ মোতাবেক সঠিক রোগ নির্ণয়ের জন্য রোগ নির্ণয় কেন্দ্রে প্রেরণ করতে

হবে। এ রোগ নিশ্চিত হলে খামারের সকল মুরগি বিনষ্ট করে সঠিকভাবে ডিসইনফেকশন ও ডিকনটামিনেশন করতে হয়। কেননা, এ রোগ মুরগি হতে মানুষে বিস্তার হতে পারে।

রোগ প্রতিরোধ ঃ

- টিকা প্রদানই এই রোগ প্রতিরোধের একমাত্র পথ
- টিকা প্রদানের সাথে সাথে খামারের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, জীব-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী

ব্রুডার নিউমোনিয়া

এ রোগ ফাঙ্গাস সংক্রমণ জনিত রোগ। এরোগে আক্রান্ত মুরগির ফুসফুসে ফাঙ্গাল রোগ দেখা যায়, শ্বাসকষ্ট হয় এবং বাচ্চা মৃত্যুহার বেড়ে যায়। সাধারণত লিটার হিসেবে ব্যবহৃত ধানের তুষ বা কাঠের গুড়া ফাঙ্গাস সংক্রমিত হলে, খাদ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণ না করলে এবং ব্রুডিং সঠিক না হলেই এ রোগ বিস্তার হয়।

রোগের লক্ষণ ঃ

- সাধারণত কোন লক্ষণ প্রকাশের আগেই মারা যেতে পারে
- আক্রান্ত মুরগিতে শ্বাস প্রশ্বাসের হার বেড়ে যেতে পারে। দুর্বল হয়ে যায় এবং মারা যায়

চিকিৎসা ঃ

যেহেতু এ রোগে লক্ষণ প্রকাশের পর পানিতে ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা প্রদান করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শক্রমে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে।

রোগ প্রতিরোধ ঃ

- প্রয়োজনীয় পরিমানের অধিক দানাদার খাদ্য সংগ্রহ না করা
- শুষ্ক ও আলোযুক্ত স্থানে মুরগির খাবার সংরক্ষণ করতে হবে
- খামারের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, জীব-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী

রানীক্ষেত

এটি ভাইরাসজনিত মারাত্মক রোগ। নিউক্যাসল ভাইরাস দ্বারা মুরগিতে এ রোগ হয়ে থাকে। আমাদের দেশে এই রোগ এনডেমিক আকারে দেখা যায়। যেকোন বয়সের মুরগিতে এ রোগ হতে পারে। এরোগ ৩রকমের হতে পারে। যথাঃ রেসপিরেটরি ফর্ম, নারভাস ফর্ম এবং ভিসারেল ফর্ম।

রোগের লক্ষণ ঃ

- সাধারণত মুরগি চুনা পায়খানা করে
- মৃত্যু হার অধিক
- মাথা বা ঘাড় বাঁকা হয়ে যায়, পা অবশ হতে পারে, পাখা ঝুলে যায়
- ঘাড় বাঁকা হওয়ার কারণে খাবার খেতে পারে না

চিকিৎসা ঃ

এ রোগের লক্ষণ প্রকাশের পর চিকিৎসা প্রদানের সুযোগ কম। তবে লক্ষণ বুঝা গেলে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ মোতাবেক সঠিক রোগ নির্ণয়ের জন্য রোগ নির্ণয় কেন্দ্রে প্রেরণ করতে হবে। এরোগ নিশ্চিত হলে খামারের সকল মুরগিকে লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা প্রদান করা হয়ে থাকে। পটাশিয়াম - পার - ম্যাঙ্গানেট মিশ্রিত পানি সরবরাহ করা হলে রোগের প্রকোপ কিছুটা কমে। তাছাড়া এ সময়ে রানীক্ষেত টিকা প্রয়োগ করা হলে অনাক্রান্ত মুরগিকে রক্ষা করা যায়।

প্রতিরোধ ঃ

- টিকা প্রদানই এই রোগ প্রতিরোধের একমাত্র পথ
- টিকা প্রদানের সাথে সাথে খামারের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, জীব-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী

ইনফেকশাস ল্যারিঙ্গো-ট্রাকিয়াইটিস

ইহা ভাইরাসজনিত মারাত্মক রোগ। ল্যারিঙ্গো-ট্রাকিয়াইটিস ভাইরাস দ্বারা মুরগিতে এ রোগ হয়ে থাকে। যেকোন বয়সের মুরগিতে এ রোগ হতে পারে।

রোগের লক্ষণ :

- মৃত্যু হার অধিক
- মুরগি কাশি দিতে পারে, শ্বাস কষ্ট হতে পারে, পাখা ঝুলে যায়
- খাবার গ্রহণের হার কমে যেতে পারে

চিকিৎসা :

এ রোগের লক্ষণ প্রকাশের পর চিকিৎসা প্রদানের সুযোগ কম। তবে লক্ষণ বুঝা গেলে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ মোতাবেক সঠিক রোগ নির্ণয়ের জন্য রোগ নির্ণয় কেন্দ্রে প্রেরণ করতে হবে। এরোগ নির্ণিত হলে খামারের সকল মুরগিকে লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা প্রদান করা হয়ে থাকে।

প্রতিরোধ :

- টিকা প্রদানই এই রোগ প্রতিরোধের একমাত্র পথ
- টিকা প্রদানের সাথে সাথে খামারের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, জীব-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী

ইনফেকশাস ব্রংকাইটিস

ইহা ভাইরাসজনিত মারাত্মক রোগ। ব্রংকাইটিস ভাইরাস দ্বারা মুরগিতে এ রোগ হয়ে থাকে। যেকোন বয়সের মুরগিতে এ রোগ হতে পারে

রোগের লক্ষণ :

- মৃত্যু হার অধিক
- মুরগি কাশি দিতে পারে শ্বাস কষ্ট হতে পারে, পাখা ঝুলে যায়
- খাবার গ্রহণের হার কমে যেতে পারে

চিকিৎসা :

এ রোগের লক্ষণ প্রকাশের পর চিকিৎসা প্রদানের সুযোগ কম। তবে লক্ষণ বুঝা গেলে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ মোতাবেক সঠিক রোগ নির্ণয়ের জন্য রোগ নির্ণয় কেন্দ্রে প্রেরণ করতে হবে। এরোগ নির্ণিত হলে খামারের সকল মুরগিকে লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা প্রদান করা হয়ে থাকে।

প্রতিরোধ :

- টিকা প্রদানই এই রোগ প্রতিরোধের একমাত্র পথ
- টিকা প্রদানের সাথে সাথে খামারের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, জীব-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী

গামবোরো রোগ

ইহা ভাইরাসজনিত মারাত্মক রোগ। ইনফেকশাস বারসাল ডিজিজ/গামবোরো ভাইরাস দ্বারা মুরগিতে এ রোগ হয়ে থাকে। সাধারণত ১৫-২৫দিন বয়সের মুরগিতে এ রোগের প্রকোপ অত্যন্ত বেশী। এরোগে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। ফলে সহজেই অন্য রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

রোগের লক্ষণ :

- মুরগি অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে, শ্বাস কষ্ট হতে পারে, পাখা ঝুলে যায়
- খাবার গ্রহণের হার কমে যেতে পারে
- রানের ও বুকের মাংসে রক্তের দাগ দেখা দিতে পারে

চিকিৎসা ঃ

এ রোগের লক্ষণ প্রকাশের পর চিকিৎসা প্রদানের সুযোগ কম। তবে লক্ষণ বুঝা গেলে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ মোতাবেক সঠিক রোগ নির্ণয়ের জন্য রোগ নির্ণয় কেন্দ্রে প্রেরণ করতে হবে। এরোগ নির্ণিত হলে খামারের সকল মুরগিকে লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা প্রদান করা হয়ে থাকে। ইমিউনোস্টিমুলান্ট ঔষধ প্রদান করতে হয়। ভিটামিন কে দিতে হয়। তাছাড়া সেকেন্ডারী রোগের সংক্রমণ হতে বিরত রাখার জন্য ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ মোতাবেক এন্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা প্রদান করতে হয়।

প্রতিরোধ ঃ

- টিকা প্রদানই এই রোগ প্রতিরোধের একমাত্র পথ
- টিকা প্রদানের সাথে সাথে খামারের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, জীব-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী

কলিব্যাসিলোসিস

ইহা ব্যাকটেরিয়া জনিত মারাত্মক রোগ। ই-কলাই ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের দ্বারা মুরগিতে এ রোগ হয়ে থাকে। যেকোন বয়সেই এ রোগ হতে পারে তবে বাচ্চা বয়সে এরোগের প্রকোপ বেশী।

রোগের লক্ষণ ঃ

- মুরগি অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে,শ্বাস কষ্ট হতে পারে, পাখা ঝুলে যায়
- খাবার গ্রহণের হার কমে যেতে পারে
- সবুজ বা মিউকাস মিশ্রিত পাতলা পায়খানা হতে পারে

চিকিৎসা ঃ

এ রোগের লক্ষণ প্রকাশের পর চিকিৎসা প্রদানের সুযোগ রয়েছে। লক্ষণ বুঝা গেলে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ মোতাবেক সঠিক রোগ নির্ণয়ের পর এন্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা প্রদান করতে হয়। ইমিউনোস্টিমুল্যান্ট ও স্যালাইন ঔষধ প্রদান করতে হয়।

প্রতিরোধ ঃ

- খামারের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, জীব-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী
- খাবার পাত্র, পানির পাত্র ডিটারজেন্ট দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হবে

সালমোনেলোসিস

ইহা ব্যাকটেরিয়া জনিত মারাত্মক রোগ। সালমোনেলা ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের দ্বারা মুরগিতে এ রোগ হয়ে থাকে। যেকোন বয়সেই এ রোগ হতে পারে। তবে বাচ্চা বয়সে পুলুরাম ডিজিজ (সালমোনেলা পুলোরাম) এবং ডিম প্রদানের সময়ে সালমোনেলোসিস (সালমোনেলা গেলিনেরাম) নামে পরিচিত।

রোগের লক্ষণ ঃ

- মুরগি অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে, শ্বাস কষ্ট হতে পারে, পাখা ঝুলে যায়
- খাবার গ্রহণের হার কমে যেতে পারে
- সবুজ বা মিউকাস মিশ্রিত সাদা পায়খানা হতে পারে
- যকৃত ব্রোঞ্জ রং ধারণ করতে পারে
- ডিম উৎপাদন হার কমে যায়
- বাচ্চাতে মৃত্যুর হার অধিক

চিকিৎসা :

এ রোগের লক্ষণ প্রকাশের পর চিকিৎসা প্রদানের সুযোগ রয়েছে। লক্ষণ বুঝা গেলে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ মোতাবেক সঠিক রোগ নির্ণয়ের পর এন্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা প্রদান করতে হয়। ইমিউনিটিবুস্টার ও স্যালাইন ঔষধ প্রদান করতে হয়।

প্রতিরোধ :

- খামারের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, জীব-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী
- খাবার পাত্র, পানির পাত্র ডিটারজেন্ট দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হবে
- খামারে ইঁদুর, পাখি ও চিকার প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে
- মুরগিকে সালমোনেলা রোগের টিকা প্রদান করতে হবে।

রক্ত আমাশয়/ককসিডিওসিস

ইহা প্রটোজোয়া সংক্রমণ জনিত মারাত্মক রোগ। আইমেরিয়া নামক প্রটোজোয়া সংক্রমণের দ্বারা মুরগিতে এ রোগ হয়ে থাকে। যেকোন বয়সেই এ রোগ হতে পারে। তবে বাচ্চা বয়সে রোগের প্রকোপ বেশী।

রোগের লক্ষণ :

- মুরগি অবসাদগ্রস্থ হয়ে পড়ে, পাখা ঝুলে যায়, শরীর শুকিয়ে যায়
- খাবার গ্রহণের হার কমে যেতে পারে
- রক্ত মিশ্রিত পায়খানা দেখা যায়
- বাচ্চাতে মৃত্যুর হার অধিক

চিকিৎসা :

এ রোগের লক্ষণ প্রকাশের পর চিকিৎসা প্রদানের সুযোগ রয়েছে। লক্ষণ বুঝা গেলে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ মোতাবেক সঠিক রোগ নির্ণয়ের পর এন্টিপ্রটোজোয়াল ঔষধ দিয়ে চিকিৎসা প্রদান করতে হয়। ইমিউনিটিবুস্টার ঔষধ প্রদান করতে হয়।

প্রতিরোধ :

- খামারের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, জীব-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী
- খাবার পাত্র, পানির পাত্র ডিটারজেন্ট দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হবে
- ককসিডিওসিস এর টিকা প্রাপ্যতা সাপেক্ষে টিকা প্রদান করা যেতে পারে
- লিটার ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরী, কেননা এ রোগের বিস্তার সংক্রমিত লিটার হতেই শুরু হয়ে থাকে

পীড়ন/ধকল জনিত রোগ

পীড়ন/ধকলের উৎস :

- বাসস্থানের অর্থাৎ ঘরের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা অধিক হলে বা কম হলে
- সংখ্যা অনুপাতে ঘর বরাদ্দকৃত জায়গা অপর্যাপ্ত হলে
- ঘরে সরবরাহকৃত খাদ্যের পাত্র ও পানির পাত্রের সংখ্যা কম হলে
- পরিবেশের তাপমাত্রা অধিক হলে
- খাদ্যে টক্সিন এর উপস্থিতির কারণে
- ভেক্সিনেশন ও ডিবেকিং প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রিতা হলে
- খামারে পর্যাপ্ত ভ্যানটিলেশন না থাকলে
- ক্লিনিক্যাল ও সাব-ক্লিনিক্যাল রোগের উপস্থিতির কারণে

পীড়নের কারণে সহজেই বিভিন্ন রোগ খামারে অনুপ্রবেশ করতে পারে। এসকল রোগের মধ্যে ক্যানাবলিজম, ভেন্ট পিকিংসহ অন্যান্য রোগ দেখা দিতে পারে

ক্যানাবলিজম/ফেদার পিকিং

ইহা মূলত মুরগির বদঅভ্যাসজনিত একটি অবস্থা। এক্ষেত্রে মোরগ-মুরগী একে অপরকে ঠোকরাতে থাকে। কোন মুরগির দেহ হতে কোথাও রক্তপাত হলে ঠোকরানোর পরিমাণ আরো বেড়ে যায়। পরবর্তীতে ইহা বদঅভ্যাসে পরিণত হয় এবং খামারের সকল মুরগিতে স্থানান্তরিত হয়।

কারণ ঃ

- মুরগির সংখ্যানুপাতে ঘরে স্থান সংকুলান না হলে
- ঘরের অভ্যন্তরে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা অধিক হলে
- খাদ্যে টক্সিন এর উপস্থিতির কারণে
- খাদ্যে পর্যাপ্ত ভিটামিন, ফাইব্রাস কার্বোহাইড্রেট ও খনিজ এর অভাবে
- সংখ্যা অনুপাতে খাদ্য ও পানির পাত্র না থাকলে
- ঘরে প্রয়োজন অতিরিক্ত আলোক প্রদান করার কারণে
- টিকা প্রদান ও ডিবিকিং এ দীর্ঘসূত্রতা

প্রতিকার ঃ

- ঘরের স্থান অনুযায়ী মুরগির সংখ্যা নির্দিষ্ট করতে হবে
- ঘরের অভ্যন্তরের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা ব্যবস্থাপনা ভাল করতে হবে
- খাদ্যে পর্যাপ্ত ভিটামিন, ফাইব্রাস কার্বোহাইড্রেট ও খনিজ এর সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে
- সংখ্যা অনুপাতে খাদ্য ও পানির পাত্র দিতে হবে
- ঘরে আলোক ব্যবস্থাপনা উন্নত করতে হবে
- টিকা প্রদান ও ডিবিকিং সঠিক সময়ে দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে

প্রশিক্ষক গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য রোগের কারণ, লক্ষণ, প্রতিরোধ, চিকিৎসা সম্পর্কে তথ্যাদি প্রস্তুত করে নিয়ে আসবেন এবং সকলের সাথে অংশগ্রহণমূলক আলোচনা করবেন। প্রতিটি রোগের মুখ্য অংশ পুনঃ আলোচনা ও অংশগ্রহণকারীদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করবেন।

চিত্র: বিভিন্ন রোগের লক্ষণ

করাইজা রোগের লক্ষণ এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের লক্ষণ

ক্যানাবলিজম রোগের লক্ষণ কক্সিডিওসিস রোগের লক্ষণ

ফাউল পক্স রোগের লক্ষণ

মাইকোপ্লাজমোসিস রোগের লক্ষণ

সোনালী মুরগি পালনে আয়-ব্যয়ের হিসাব

বাণিজ্যিকভাবে ১০০০ সোনালী মুরগি পালনে আয়-ব্যয়ের হিসাবঃ
১০০০ টি সোনালী মুরগি পালনের জন্য প্রয়োজনীয় ঘরের আকারঃ দৈর্ঘ্য ঃ ৪০ ফুট, প্রস্থ ২০ ফুট, উচ্চতা ঃ ৮-৯ ফুট (১০/১২ ফুট)
অর্থাৎ আয়তকার ঘরের আকার ৮০০ বর্গফুট । এক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ কম বা বেশী হতে পারে ।

খরচের হিসাব ঃ
ঘর পাকা, সেমিপাকা, কাঁচা বা শুধুমাত্র ফ্লোর পাকা হলেও চলে ।

খরচের খাত	পরিমাণ
স্থায়ী খরচ	
ঘর তৈরী (সিমেন্ট, পাকা ফ্লোর, টিন, বাঁশ, কাঠ, মিস্ত্রি খরচ, সিলিং ইত্যাদি)	৭১০০০/-
খাবার পাত্র, পানির পাত্র, ইলেকট্রিক সরঞ্জামাদি, ব্রুডার ইত্যাদিসহ আনুসাঙ্গিক ব্যয়	৩০০০০/-
মোট	১০১০০০/-
আবর্তক ব্যয়	
১০০০ টি বাচ্চা ক্রয় বাবদ @ ৩০ টাকা/বাচ্চা	৩০০০০/-
খাদ্য খরচ ৪০ ব্যাগ @ ২০০০/- ব্যাগ	৮০০০০/-
বিদ্যুৎ খরচ	৪০০০/-
ঔষধ ও ভ্যাকসিন খরচ	১০০০০/-
আনুষঙ্গিক খরচ	৫০০০/-
শ্রমিক মজুরি	১০০০০/-
মোট	১৩৯০০০/-
সর্বমোট ব্যয়	
স্থায়ী খরচের ১/১০ হিসেবে প্রতি ব্যাচ (একবারের স্থায়ী খরচে ১০ টি ব্যাচ পালন করা যাবে)	১০১০০/-
আবর্তক খরচ	১৩৯০০০/
প্রতি ব্যাচে মোট খরচ	১৪৯১০০/-
আয়	
৯৫০ টি বড় মুরগি (৫% মৃত্যু হার এবং প্রতিটির গড় ওজন ৭০০ গ্রাম হিসাবে এবং প্রতি কেজি মুরগির দাম ৩০০/- হারে) বিক্রয় বাবদ	১৯৯৫০০/-
বিষ্ঠা বিক্রয় বাবদ আয়	১৫০০/-
মোট আয়	২০১০০০/-
নীট মুনাফা	৫১৯০০/-

সঠিক বাজার পাওয়া গেলে এবং নিরাপদভাবে পালন করা গেলে নীট মুনাফা অধিক পাওয়া যায় ।

ছাগল পালন

ছাগল পালনের গুরুত্ব

ছাগল বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাণিসম্পদ। ছাগল আমাদের দেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস। বাংলাদেশে বেকার সমস্যা ও দারিদ্র্য হ্রাস, মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে ছাগল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উল্লেখ্য যে এদেশের মোট প্রায় দু কোটি পঞ্চাশ হাজার ছাগলের অধিকাংশই ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের। ছাগল পালনে স্বল্প পুঁজি, স্বল্প জায়গা এবং কম খাদ্য খরচের প্রয়োজন হয়। আত্মকর্মসংস্থান, বেকার সমস্যা হ্রাস, দারিদ্র বিমোচন, পুষ্টি সংরক্ষণ সর্বোপরি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ছাগল হতে পারে একটি অন্যতম হাতিয়ার।

ছাগল পালনের বিশেষ দিকঃ

ছাগল পালনের জন্য অল্প জায়গা লাগে এবং মূলধন ও সাধারণ মানুষের সামর্থের মধ্যে থাকে। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল জলবায়ু ছাগল পালনের জন্য খুবই উপযুক্ত। ছাগলের মাংস, পশম, চামড়া ও জৈব সার উৎপাদন করে। গরুর সাথে মিশ্রভাবে ছাগল পালন করা যায়। হাওরের বসতবাড়িতে ২-৪ টি ছাগল পালন করা লাভজনক। একটি ছাগল সাধারণত বছরে দুবার বাচ্চা দেয় এবং প্রতিবার গড়ে ২-৪ টি করে বাচ্চা দেয়। দেশে ও বিদেশে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের চামড়া, মাংস ও দুধের বিপুল চাহিদা আছে। পালনের জন্য ৭-১২ মাস বয়সী সুস্থ ছাগল নির্বাচন করা উচিত।

বাংলাদেশে সচরাচর ছাগলের দুটি জাত দেখা যায়। এগুলো হলো ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল ও রাম ছাগল বা যমুনা পারী ছাগল। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের দেহ সাধারণত কালো, দেহ কালো লোম দ্বারা আবৃত। তবে খয়েরি বা সাদা বা এদের মিশ্রিত রঙের ছাগলও দেখা যায়। এদের কান ছোট, খাড়া ও ভূমির সমান্তরালে, শিং ছোট, খাড়া ও কালো, গড় দৈহিক ওজন ২০-৩০ কেজি, গড়ে প্রতিদিন ৪০০-৫০০ মি.লি. দুধ দেয়। ব্ল্যাক বেঙ্গল খাসীর মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু। একটি ২০ কেজি ওজনের খাসী হতে গড়ে ১২ কেজি খাওয়ার যোগ্য মাংস পাওয়া যায়। ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের চামড়া অতি উন্নত মানের বিধায় বিশ্বব্যাপী এর কদর রয়েছে। একটি ২০ কেজি ওজনের ছাগল হতে গড়ে ১.২-১.৪ কেজি চামড়া পাওয়া যায়। যমুনা পাড়ি ছাগলের শরীরের গঠন লম্বাটে। এদের পা বেশ লম্বা; পিছনের পায়ের পেছনে লম্বা লোম থাকে। এদের কান লম্বা ও ঝুলন্ত। যমুনা পাড়ি জাতের পাঁঠার ওজন গড়ে ৭৫-১০০ কেজি এবং ছাগীর ওজন ৫০-৭০ কেজি হয়ে থাকে। যমুনা পাড়ি জাতের ছাগী বছরে একবার বাচ্চা দেয় এবং প্রতিবার গর্ভধারণ করে এরা সাধারণত একটি বাচ্চা প্রসব করে। যমুনা পাড়ি জাতের ছাগী গড়ে প্রতিদিন ২-৪ লিটার দুধ দেয়। এদের মাংস ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের মত সুস্বাদু নয় এবং চামড়াও উন্নতমানের নয়। তবুও দুধ ও মাংস উৎপাদনের উদ্দেশ্যে এদেশে যমুনা পাড়ি জাতের ছাগল পালন করা হয়।

ছাগল, অন্যান্য গবাদিপ্রাণি ও পোল্ট্রির মাংসের গড় পুষ্টি উপাদানঃ

পুষ্টি উপাদান	ছাগল	গরু	ভেড়া	মহিষ	মুরগী	হাঁস
পানি%	৭৪	৭৪	৭২	৭৯	৭৫	৭২
আমিষ	২২	২২	২১	১৯	২১	২২
চর্বি	৭	৩	৩	১	৩	৫
খনিজ	১	১	১	১	১	১
ভিটামিন-এ (মিগ্রা/১০০গ্রাম)	১০	২০	১০	--	৮০	--
ভিটামিন-সি (মাইক্রো গ্রাম/১০০গ্রাম)	--	১৫০০	১০০০	--	৫০০০	--
ভিটামিন ই (মিগ্রা/১০০গ্রাম)	৫০০	৪০০	৫০০	--	২০০	--
আয়রণ (মিগ্রা/১০০গ্রাম)	২	৩	২	--	২	--
ক্যালসিয়াম (মিগ্রা/১০০গ্রাম)	১০	১০	১০		১০	--
কোলেস্টেরল (মিগ্রা/১০০গ্রাম)	৭০	৭৫	৭০	--	৬০	১৭০

ছাগলের জাত পরিচিতি

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মাংস, দুধ, চামড়া ও পশম উৎপাদনের জন্য অনেক উন্নত জাতের ছাগল রয়েছে। দুধ, মাংস ও উল উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে ছাগলকে চারটি জাতে ভাগ করা যায়। ১. মাংস উৎপাদনকারী ছাগলের বিভিন্ন জাত ২. দুধ উৎপাদনকারী ছাগলের জাত ৩. চামড়া উৎপাদনকারী ছাগলের জাত ৪. পশম উৎপাদনকারী ছাগলের জাত। ব্ল্যাক বেঙ্গল, বোয়ার, দামানি, বিটাল প্রভৃতি মাংস উৎপাদনকারী ছাগলের জাত। এ জাতের মাংস অত্যন্ত ভাল মানের। যমুনাপারী, সানেন, অ্যাংলো নুবিয়ান, বারবারি, ব্রিটিশ আলপাইন প্রভৃতি দুধ উৎপাদনকারী ছাগলের জাত। এ জাতের ছাগী হতে প্রতিদিন গড়ে ১-৪ লিটার দুধ পাওয়া যায়। ব্ল্যাক বেঙ্গল, মালাবার, বারবারি, মামাসংস প্রভৃতি চামড়া উৎপাদনকারী ছাগলের জাত এই শ্রেণির ছাগলের চামড়া দিয়ে উন্নতমানের চামড়াজাত দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। অ্যাংগোরা, কাশ্মিরী, মেরাডি প্রভৃতি পশম উৎপাদনকারী ছাগলের জাত। এ শ্রেণির ছাগলের লোম হতে উন্নতমানের দামী পোশাক ও গরম কাপড় তৈরি করা হয়।

চিত্রঃ ব্ল্যাক বেঙ্গল কালো জাতের ছাগল

চিত্রঃ বোয়ার জাতের ছাগল

চিত্রঃ দামানি জাতের ছাগল

চিত্রঃ বিটাল জাতের ছাগল

চিত্রঃ সানেন জাতের ছাগল

চিত্রঃ টোগেনবার্গ জাতের ছাগল

চিত্রঃ অ্যাংলো নুবিয়ান জাতের ছাগল

চিত্র ঃ যমুনাপারী জাতের ছাগল

চিত্র ঃ মালাবারি জাতের ছাগল

চিত্র ঃ বারবারি জাতের ছাগল

চিত্র ঃ কাশ্মিরী জাতের ছাগল

চিত্র ঃ অ্যাংগোরা জাতের ছাগল

বাংলাদেশের ছাগলের বৈশিষ্ট্য ঃ

আমাদের দেশে সচরাচর ছাগলের দুটি জাত দেখা যায়। এগুলো হলো ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল ও রাম ছাগল বা যমুনাপারী ছাগল।

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বৈশিষ্ট্য ঃ

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের দেহ সাধারণত খাটো। উচ্চতা ১৬-২০ ইঞ্চি। এদের দেহ কালো লোম দ্বারা আবৃত। তবে খয়েরি বা সাদা বা এদের মিশ্রিত রংয়ের ছাগলও দেখা যায়। এদের কান ছোট, খাড়া ও ভূমির সমান্তরাল। এদের শিং ছোট, খাড়া ও কালো। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের গড় দৈহিক ওজন ২০-৩০ কেজি। পাঁঠার ওজন ২৫-৩০ কেজি এবং ছাগীর ওজন ১৫-২৫ কেজি। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের শারীরিক বৃদ্ধি অতি অল্প সময়ে ঘটে। ৭-৮ মাস বয়সে এরা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়। ১৩-১৪ মাস বয়সে প্রথম বাচ্চা দেয়। বছরে এরা কমপক্ষে দুইবার বাচ্চা দেয়। এ জাতের ছাগল প্রতিবারে ২-৪ টি বাচ্চা প্রসব করে। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগীর ওলান ছোট

ল্যাকটেশন পিরিয়ডে ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগী গড়ে প্রতিদিন ৪০০-৫০০ মি.লি. দুধ দেয় যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছানাছানার চাহিদা পূরণ করতে পারে না। ব্ল্যাক বেঙ্গল খাসীর মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু। একটি ২০ কেজি ওজনের খাসী হতে গড়ে ১২ কেজি খাওয়ার যোগ্য মাংস পাওয়া যায়। ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের চামড়া অতি উন্নত মানের বিধায় বিশ্বব্যাপী এর কদর রয়েছে। একটি ২০ কেজি ওজনের ছাগল হতে গড়ে ১.২-১.৪ কেজি চামড়া পাওয়া যায়।

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালনের সুবিধা ঃ

সাধারণত ১২-১৫ মাস বয়সে প্রথম বাচ্চা দেয় একটি ছাগী বছরে দুবার বাচ্চা প্রসব করলেও উপযুক্ত ব্যবস্থাপনায় ছাগী থেকে ২.৮ টি পর্যন্ত বাচ্চা পাওয়া যেতে পারে। ২০ কেজি দৈহিক ওজন সম্পন্ন একটি ছাগী থেকে কমপক্ষে ১১ কেজি খাওয়ার যোগ্য মাংস এবং ১.-১.৪ কেজি ওজনের অতি উন্নতমানের চামড়া পাওয়া যায়। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের চামড়া একটি অতি মূল্যবান উপজাত। দেখা গেছে, সেমি-ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ২৫টি ছাগীর খামার থেকে ১ম বছরে ৫০,০০০ টাকা, ২য় বছরে ৭৫,৩৩৭ এবং ৩য় বছরে ১,০২,৬০০ টাকা পর্যন্ত আয় করা সম্ভব।

যমুনাপাড়ী ছাগলের বৈশিষ্ট্য ঃ

যমুনা পাড়ি ছাগলের শরীরের গঠন লম্বাটে। এদের পা বেশ লম্বা। পিছনের পায়ের পেছনে লম্বা লোম হয়ে থাকে। এদের কান লম্বা ও ঝুলন্ত। সাধারণত ২০-২৫ সে.মি. ঝুলন্ত কান দেখা যায়। ছাগীর ওলান বেশ বড়, সুগঠিত ও ঝুলন্ত। বাটগুলো মোটা ও লম্বা। শরীরের উচ্চতা ৩২-৪০ ইঞ্চি। পাঁঠার ওজন গড়ে ৭৫-১০০ কেজি এবং ছাগীর ওজন ৫০-৭৫ কেজি হয়ে থাকে। এরা দেরীতে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়। ছাগী বছরে একবার বাচ্চা দেয় এবং প্রতিবার গর্ভধারণ করে এরা সাধারণত একটি বাচ্চা প্রসব করে। ল্যাকটেশন পিরিয়ডে ছাগী গড়ে প্রতিদিন ২-৪ লিটার দুধ দেয়। প্রতি ল্যাকটেশনে এরা সর্বোচ্চ ৬১৮ লিটার দুধ দিয়ে থাকে। এদের মাংস ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের মত সুস্বাদু নয় এবং চামড়াও উন্নতমানের নয়। তবুও দুধ ও মাংস উৎপাদনের উদ্দেশ্যে এদেশে যমুনা পাড়ি জাতের ছাগল পালন করা হয়।

বিভিন্ন ধরণের ছাগল পালন পদ্ধতি

একটি ছাগল খামার স্থাপনের পূর্বে বিভিন্ন ধরণের ছাগল পালন পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা প্রয়োজন। মূলতঃ কোন খামারে ছাগলের সংখ্যা, খামারের অর্থনৈতিক লক্ষ্য, খামার মালিকের পুঁজি, বিচরণ ভূমি ও খাদ্যের প্রাপ্যতা প্রভৃতি বিষয়ের উপর নির্ভর করে ছাগল পালন পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, ১৫-২০ কেজি দৈহিক ওজনের একটি ছাগলকে দৈনিক গড়ে ১.৫-২.০ কেজি কাঁচা ঘাস সরবরাহ করা প্রয়োজন। ছাগল পালনের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে পারিবারিক ক্ষুদ্র খামার, মুক্তভাবে ছাগল পালন, সেমি ইনটেনসিভ/আধা নিবিড় পদ্ধতিতে ছাগল পালন, ইনটেনসিভ/নিবিড় পদ্ধতিতে ছাগল পালন, ইনটিগ্রেটেড/সমন্বিত খামার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। নিম্নে ছাগল পালনের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১. পারিবারিক ক্ষুদ্র খামার

বৈশিষ্ট্য ঃ খামারে ছাগলের সংখ্যা ২-৫ টি। ছাগলের জন্য আলাদা কোন ঘর নির্মাণের প্রয়োজন হয় না। সাধারণত গোয়াল ঘরে বা খামারীর শোয়ার ঘরে বা বসতঘরের পাশের বারান্দায় ছাগলকে রাখা হয়। বসত ঘরের আশে পাশের পতিত জমি ও ক্ষেতের আইলের ঘাস হতে ছাগলের খাদ্যের সংস্থান হয়। তবে সাপ্লিমেন্ট হিসেবে গমের ভূষি, চালের কুঁড়া, ছোলার ভূষি, ভাতের মাড়, কাঁঠাল পাতা প্রভৃতি সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

সুবিধা ঃ অল্প পুঁজি বিনিয়োগ করতে হয় বলে ভূমিহীন ক্ষুদ্র খামারী, প্রান্তিক চাষী এবং উচ্চ বিত্ত কৃষক সকলেই এ ধরণের খামার করতে পারেন। এ ধরণের খামার স্থাপনে অল্প জায়গা এবং ব্যবস্থাপনায় অল্প শ্রম প্রয়োজন হয়। বিনিয়োগ অল্প বলে এ ধরণের খামারে ঝুঁকির পরিমাণ কম। এক সাথে অল্প সংখ্যক ছাগল পালন করা হয় বলে এদের ব্যবস্থাপনা সহজসাধ্য। এদের রোগ বালাইও তুলনামূলকভাবে কম হয় এবং উৎপাদন ভাল হয়। সংখ্যা কম হওয়ায় বাজারজাতকরণও তুলনামূলক ভাবে সহজ।

অসুবিধা ঃ অল্প সংখ্যক ছাগল পালনের কারণে বাৎসরিক আয় কম হয়। তাই একক পেশা হিসেবে গ্রহণের জন্য এ ধরণের ছাগল পালন পদ্ধতি উপযুক্ত নয়। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পালন করা হয় না বলে অনেক সময় ছাগলের খাদ্য ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা খাতে কম অর্থ বিনিয়োগ করা হয়। ফলে উৎপাদন অনেক সময় আশানুরূপ হয় না।

আয়ঃ এ ধরণের খামার হতে বছরে ৫০,০০০-১০০,০০০ টাকা আয় করা সম্ভব।

২. মুক্তভাবে ছাগল পালন

বৈশিষ্ট্যঃ খামারে ছাগলের সংখ্যা ৮-১০ টি। বসত বাড়ির আশে পাশের অনাবাদি জমি, পতিত জমি যেমনঃ রেল লাইনের ধার, বাঁধ, পুকুর পাড়, খেলার মাঠ, পাহাড়ী ভূমি, নদীর চর প্রভৃতি জায়গায় মুক্তভাবে সারাদিন ছাগল চরানো হয়। শুধু রাতের বেলায় ছাগলকে বাড়িতে নেওয়া হয়। এসময় শুধুমাত্র দানাদার খাবার ছাগলকে সরবরাহ করা হয়।

সুবিধা ঃ পতিত/অনাবাদি জমিতে মুক্তভাবে চরে বেড়ায় বলে ছাগলের জন্য আলাদাভাবে ঘাস উৎপাদনের প্রয়োজন হয় না। খাদ্য ব্যবস্থাপনা খাতে খরচ কম হয়। মুক্তভাবে চরে বেড়ায় বলে রোগ-বালাই তুলনামূলক ভাবে কম হয়।

অসুবিধা ঃ মুক্তভাবে চরে বেড়ায় বলে রক্ষণাবেক্ষণ ও দেখা-শোনার কাজে নজরদারি করতে হয়। নতুবা ছাগল হারিয়ে যাওয়ার বা চুরি হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। মুক্তভাবে চরে বেড়ানোর কারণে অনেক সময় ছাগল কর্তৃক অন্যের ক্ষেতের ফসল নষ্ট করার সম্ভাবনা থাকে। এর ফলে প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া-বিবাদ হতে পারে। দেশব্যাপী নিবিড় কৃষি কাজের কারণে বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেশের অধিকাংশ স্থানে এ পদ্ধতিতে ছাগল পালন করা কঠিন। মুক্তভাবে চরে বেড়ায় বলে ছাগলের পরিকল্পিত প্রজনন সম্ভব নাও হতে পারে।

আয় ঃ এ ধরণের খামার হতে বছরে ১০০,০০০-১৫০,০০০ টাকা আয় করা সম্ভব।

৩. সেমি ইনটেনসিভ/আধা নিবিড় পদ্ধতিতে ছাগল পালন

বৈশিষ্ট্য ঃ এ ধরণের পদ্ধতিতে খামারে ২০ বা ততোধিক সংখ্যক ছাগল পালন করা হয়। খামারীর বিনিয়োগ ও ইচ্ছার উপর এই সংখ্যা নির্ভরশীল। এ পদ্ধতিতে ছাগলকে দিনের বেলায় খামারের নিজস্ব জমিতে চরানো হয় এবং রাতের বেলায় ঘরে আবদ্ধ অবস্থায় রাখা হয়। ছাগলের পুষ্টি চাহিদা মেটানোর জন্য দানাদার খাদ্য ও কাঁচা ঘাস সরবরাহ করা হয়।

সুবিধা ঃ এই পদ্ধতিতে পালন করলে ছাগল কর্তৃক অন্যের ক্ষেতের ক্ষতিসাধনের সম্ভাবনা থাকে না বলে বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী। খাদ্য ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার পেছনে বেশী বিনিয়োগ করা হয় বলে এই পদ্ধতিতে উৎপাদন আশাব্যঞ্জক হয়।

অসুবিধা ঃ বিনিয়োগ বেশি করতে হয় বলে স্বল্প পুঁজির খামারীর জন্য এই পদ্ধতি কিছুটা ব্যয় বহুল। এক সাথে অনেক ছাগল পালন করা হয় বলে খামারের কোন একটি ছাগলে সংক্রামক রোগ হলে তা দ্রুত খামারে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা খাতে খরচ বেশি হয়।

আয় ঃ বিনিয়োগের উপর আয় নির্ভরশীল। বিনিয়োগ যত বেশি হবে আয়ও সেই অনুপাতে বেশি হবে।

৪. ইনটেনসিভ/নিবিড় পদ্ধতিতে ছাগল পালন

বৈশিষ্ট্যঃ এই পদ্ধতিতে খামারে শতাধিক হতে সহস্রাধিক ছাগল পালন করা সম্ভব। বিনিয়োগের পরিমাণের উপর এই সংখ্যা নির্ভরশীল। এই পদ্ধতিতে ছাগলকে সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় পালন করা হয় এবং কাঁচা ঘাস, দানাদার খাদ্যসহ সকল প্রকার খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করা হয়। এই পদ্ধতিতে ছাগলের মুক্তভাবে চারণভূমিতে চরে বেড়ানোর কোন সুযোগ থাকে না। তবে খামার গৃহের পাশে খামার গৃহের প্রায় দ্বিগুণ জায়গা নিয়ে খোঁয়াড় তৈরি করা হয় যার চারপাশে বেড়া দেওয়া থাকে। উক্ত খোঁয়াড়ে ছাগলকে দিনের কিছু সময় ছেড়ে দেওয়া হয় এবং সকল প্রকার রাফেজ জাতীয় খাদ্য খোঁয়াড়ে সরবরাহ করা হয়।

সুবিধা ঃ পরিকল্পিতভাবে খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা খাতে ব্যয় করা হয় বলে উৎপাদন আশানুরূপ হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রজনন ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। অল্প জায়গায় অধিক সংখ্যক ছাগল পালন করা হয় বলে

তুলনামূলকভাবে অন্যান্য খাতে ব্যয় কম হয়। বিজ্ঞান সম্মত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ করার মাধ্যমে ছাগল পালনকে শিল্প হিসাবে গড়ে তোলা সম্ভব

অসুবিধা ঃ গৃহ নির্মাণ ও খোঁয়াড় স্থাপনে প্রাথমিক বিনিয়োগ তুলনামূলকভাবে বেশি। এই পদ্ধতিতে খাদ্য ব্যবস্থাপনা খাতে ব্যয় তুলনামূলকভাবে অন্য পদ্ধতির চেয়ে বেশি। সময়মত কাঙ্খিত উৎপাদন নিশ্চিত করা না গেলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ফলে কখনো কখনো এই পদ্ধতি লাভজনক হয় না। একসাথে অধিক সংখ্যক ছাগল পালন করা হয় বলে খামারের কোন একটি ছাগলে সংক্রামক রোগ হলে তা দ্রুত খামারে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

আয় ঃ বিনিয়োগের উপর আয় নির্ভরশীল। বিনিয়োগ যত বেশি হবে আয়ও সেই অনুপাতে বেশি হবে।

৩. ইনটিগ্রেটেড/সমন্বিত খামার

বৈশিষ্ট্যঃ ফলজ বা বনজ বাগানে সমন্বিত উপায়ে আধা-নিবিড় বা পারিবারিকভাবে ছাগল পালন করা যেতে পারে। সাধারণতঃ পেয়ারা, পেঁপে, আম, কাঁঠাল, লিচু, কলা প্রভৃতি ফলজ বাগান অথবা বনজ বাগানের নিচে পারা, সিগনাল, মাসকলাই, কাউপি, খেসারি প্রভৃতি ঘাস/ঘাসজাতীয় চাষ করা যেতে পারে। ফলে ঘাস চাষের জন্য আলাদা কোন জমির প্রয়োজন হয় না। উক্ত ঘাস কেটে খাওয়ানো যেতে পারে বা এতে ছাগল চরানো যেতে পারে। এ ছাড়া ফল বাগানের অতিরিক্ত পাতা কেটে ছাগলকে খাওয়ানো যেতে পারে

সুবিধাঃ সমন্বিত উপায়ে খামার গড়ে তোলা হয় বলে ছাগলের জন্য আলাদা চারণভূমি বা ঘাস চাষের ভূমির প্রয়োজন হয় না। একই ব্যক্তি একই সাথে বাগানের তদারকি ও ছাগল দেখাশোনা করতে পারেন বলে এই পদ্ধতিতে শ্রমের সাশ্রয় হয়। ছাগলের মল-মূত্র জৈব সার হিসেবে খামারে ব্যবহার করা যায়। এই পদ্ধতিতে ছাগল চরে বেড়ানোর সুযোগ পায় এবং অল্প জায়গায় আবদ্ধ থাকতে হয় না বলে রোগ বালাইয়ের প্রকোপ কম হয়।

অসুবিধাঃ নজরদারী না থাকলে ছাগল কর্তৃক বাগানের চারা গাছ, ছোট গাছ, সব্জি ক্ষেত খেয়ে ফেলার সম্ভাবনা রয়েছে।

আয়ঃ সমন্বিত উপায়ে পালন করা হয় বলে খামারীগণ বাগান ও ছাগল খামার হতে তুলনামূলকভাবে বেশি আয় করতে পারেন।

ছাগলের খামারের স্থান নির্বাচন ঃ

স্বাস্থ্যসম্মত ও লাভজনক ছাগলের খামার স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ছাগলের খামার স্থাপনের সময় নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে ঃ

- যথাসম্ভব উঁচু ও শুষ্ক জায়গায় ছাগল খামার স্থাপন করতে হবে, যাতে বন্যার পানি খামারে প্রবেশ করতে না পারে এবং বৃষ্টির পানি জমে না থাকে
- খোলামেলা এবং প্রচুর আলো বাতাস রয়েছে এমন জায়গায় খামার স্থাপন করা বাঞ্ছনীয়
- ঘাস চাষের উপযোগী উর্বর মাটি যেমন ঃ দোআঁশ বা বেলে দোআঁশ মাটিতে খামার স্থাপন করলে ঘাস চাষের সুবিধা হয়
- লোকালয় হতে সামান্য দূরে কিন্তু বাজার বা শহরের সাথে সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে এমন স্থানে খামার স্থাপন করা উচিৎ, এতে খামারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পরিবহন সহজতর হয়
- বিশুদ্ধ পানির উৎস/সরবরাহ রয়েছে এমন স্থানে খামার স্থাপনা করা প্রয়োজন
- বিদ্যুতের সুবন্দোবস্ত রয়েছে এমন স্থানে খামার স্থাপন করতে হবে
- খামারে পানি ও পয়ঃ নিষ্কাশনের জন্য প্রয়োজনীয় নালা নর্দমা থাকতে হবে
- কাছাকাছি চারণ ভূমি আছে এমন স্থানে খামার স্থাপন করা লাভজনক

এ ছাড়া জীবন যাত্রার আধুনিক সুযোগ সুবিধা রয়েছে, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভাল, সামাজিক অসন্তোষ নেই এমন স্থানে খামার স্থাপন করা বাঞ্ছনীয়।

ছাগলের বাসস্থান ব্যবস্থাপনা

ছাগলের ঘর নির্মাণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ

ছাগলের বাসস্থান শুষ্ক ও উঁচু স্থানে নির্মাণ করা উত্তম। ঘরে আলো বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। ঘরের মেঝে সব সময় শুষ্ক ও পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা করা উচিৎ। ছাগলের ঘর পূর্ব পশ্চিমে লম্বালম্বি এবং দক্ষিণ দিক খোলা থাকলে ভাল।

ছাগল খামারে যে সকল ঘর থাকা প্রয়োজন ঃ

পারিবারিক পদ্ধতিতে এবং মুক্তভাবে ছাগল পালন করলে ছাগলের জন্য আলাদা ঘরের তেমন প্রয়োজন হয় না। মানুষের থাকার ঘরের একপাশে, ঘরের পাশের বারান্দায় অথবা গোয়াল ঘরের গরুর সাথে ছাগল পালন করা হয়। আধা নিবিড় ও নিবিড় পদ্ধতিতে বাণিজ্যিকভাবে একসাথে অনেক ছাগল পালন করা হয় বলে ছাগলের জন্য আলাদা করে বিভিন্ন ঘর তৈরি করতে হয়।

একটি বাণিজ্যিক ছাগল খামারে নিম্নবর্ণিত আলাদা আলাদা ঘর থাকা বাঞ্ছনীয় ঃ

- প্রজনন উপযোগী ও দুগ্ধবতী ছাগলের ঘর, ব্রিডিং পেন
- বাচ্চা ছাগলের ঘর (দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত)
- মাংস উৎপাদনকারী ছাগলের ঘর (২-৩ মাস বয়স হতে প্রাপ্ত বয়স্ক)
- পাঁঠা ছাগলের ঘর (৩ মাস বয়স হতে সার্ভিসকালীন সময়)
- গর্ভবতী ছাগলের ঘর
- আইসোলেশন শেড (অসুস্থ ছাগলের জন্য)
- কোয়ারেন্টাইন শেড (নতুন ক্রয়কৃত ছাগলের জন্য-ক্রয়ের পর ২ সপ্তাহ পর্যন্ত)
- দানাদার খাদ্য রাখার ঘর
- সবুজ ঘাস ও অন্যান্য জাতীয় খাদ্য রাখার ঘর।

পালন পদ্ধতি অনুসারে ছাগলের ঘরের শ্রেণি-বিন্যাস ঃ

পালন পদ্ধতি অনুসারে ছাগলের ঘরকে দু'ভাবে শ্রেণি বিভাগ করা যেতে পারে ঃ

ক. মেঝে পদ্ধতির ঘর- এ ধরণের ঘরে ছাগলকে মেঝেতে পালন করা হয়।

খ. মাচা পদ্ধতির ঘর- এ ধরণের ঘরে মেঝের উপর মাচা তৈরি করে তার উপর ছাগল পালন করা হয়।

নির্মাণ উপকরণের উপর ভিত্তি করে মেঝে পদ্ধতির ঘর তিন রকম হতে পারে- ১. কাঁচা মেঝের ঘর, ২.অর্ধ-পাকা মেঝের ঘর এবং ৩. পাকা মেঝের ঘর।

বানিজ্যিক ভিত্তিতে পালনের জন্য ছাগলের ঘর

সেমি-ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে পালনের জন্য ছাগলের ঘর

জীব-নিরাপত্তা ঃ

খামার এলাকার বেড়া বা নিরাপত্তা বেষ্টনী এমনভাবে নির্মাণ করতে হবে যাতে সেখানে অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি, শেয়াল-কুকুর ও অন্যান্য বন্যপ্রাণি প্রবেশ করতে না পারে। প্রবেশ পথে ফুটবাথ বা পা ধোয়ার জন্য ছোট চৌ-বাচ্চায় জীবাণুনাশক মেশানো পানি রাখতে হবে। খামারে প্রবেশের আগে খামারে গমনকারী তার জুতা/পা ডুবিয়ে জীবাণুমুক্ত করবেন। খামারের জন্য সংগৃহীত নতুন ছাগল সরাসরি খামারে পূর্বে বিদ্যমান ছাগলের সাথে রাখা যাবে না। নতুন আনীত ছাগলকে স্বতন্ত্র ঘরে সাময়িক ভাবে পালনের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ধরনের ঘরকে পৃথকীকরণ ঘর বা আইসোলেশন শেড বলে। অন্তত ঃ দুই সপ্তাহ এই শেডে রাখা বিশেষ জরুরী। এসব ছাগলের জন্য প্রাথমিক কিছু চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রথমে এদেরকে কৃমিনাশক খাওয়াতে হবে। এজন্য বহিঃপরজীবি এবং অন্তঃপরজীবীর জন্য কার্যকর কৃমিনাশক প্রয়োগ করতে হবে। চর্মরোগ প্রতিরোধের জন্য প্রতিটি ছাগলকে (০.৫%) শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশ ম্যালাথিয়ন দ্রবণে গোসল করাতে হবে। আইসোলেশন শেডে ছাগল রাখার পর ১৫ দিনের মধ্যে যদি কোনো রোগ না দেখা দেয় তাহলে প্রথমে পিপিআর রোগের ভ্যাকসিন এবং সাত দিন পর গোটপক্সের ভ্যাকসিন প্রয়োগ করতে হবে। শেষ টিকা প্রদানের সাত দিন পর এসব ছাগলকে মূল খামারে নেয়া যেতে পারে। প্রতিদিন সকাল এবং বিকালে ছাগলের ঘর পরিষ্কার করতে হবে। কোনো ছাগল যদি অসুস্থ হয় তাহলে তাকে আলাদা করে আইসোলেশন শেডে রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। যদি কোনো ছাগল মারা যায় তবে অবশ্যই তার কারণ সনাক্ত করতে হবে। ল্যাবরেটরিতে রোগ নির্ণয়ের পর তদানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বিশেষ করে অন্যান্য ছাগলের জন্য নিতে হবে। মৃত ছাগলকে খামার থেকে দূরে নিয়ে মাটির গভীরে পুঁতে ফেলতে হবে। রোগাক্রান্ত ছাগলের ব্যবহার্য সকল সরঞ্জামাদি ও দ্রব্যাদি সঠিকভাবে জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

ছাগল ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিবেচ্য গুণাবলী ঃ

ছাগীর ক্ষেত্রেঃ

নির্বাচিত ছাগী হবে অধিক উৎপাদনশীল বংশের ও আকারে বড়। ছয় বা আট মাস বয়সের ছাগী কিনতে হবে। ছাগীর পেট তুলনামূলক ভাবে বড়, পাঁজরের হাড়, চওড়া ও প্রসারিত থাকতে হবে। নির্বাচিত ছাগীর ওলান সুগঠিত ও বাঁট সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

পাঁঠার ক্ষেত্রে ঃ

পাঁঠার বয়স ১২ মাসের মধ্যে হতে হবে, অন্ডকোষের আকার বড় এবং সু-গঠিত হতে হবে। পিছনের পা সুঠাম ও শক্তিশালী হতে হবে। পাঁঠা নির্বাচনের জন্য মায়ের ইতিহাস (অর্থাৎ তারা বছরে ২ বার বাচ্চা দিত কী না, প্রতিবারে একটির বেশি বাচ্চা হতো কী না, দুধ উৎপাদনের পরিমাণ ইত্যাদি গুণাবলী) নেয়া যেতে পারে।

বয়স নির্ণয় ঃ

ছাগলের দাঁত দেখে বয়স নির্ধারণ করতে হয়। বয়স ১২ মাসের নিচে হলে দুধের সবগুলোই দাঁত থাকবে, ১২-১৫ মাসের নিচে বয়স হলে স্থায়ী দাঁত এবং ৩৭ মাসের উর্ধ্বে বয়স হলে ৪ জোড়া স্থায়ী দাঁত থাকবে।

সুস্থ ছাগলের বৈশিষ্ট্য ঃ

সুস্থ ছাগলের নাড়ীর স্পন্দন প্রতি মিনিটে ৭০-৯০ বার, শ্বাস-প্রশ্বাস প্রতি মিনিটে ২৫-৪০ বার এবং তাপমাত্রা ৩৯.৫০ সেঃ হওয়া উচিত। সুস্থ ছাগল দলবদ্ধভাবে চলাফেরা করে, মাথা সবসময় উঁচু থাকে, নাসারন্ধ্র থাকবে পরিষ্কার, চামড়া নরম, পশম মসৃণ ও চকচকে দেখাবে এবং পায়ু অঞ্চল থাকবে পরিচ্ছন্ন।

স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়াদি ঃ

গ্রহণযোগ্য ছাগল অবশ্যই সকল ধরনের সংক্রামক ব্যাধি, চর্মরোগ, চক্ষুরোগ, যৌনরোগ ও বংশগত রোগমুক্ত হতে হবে। পিপিআর খুবই মারাত্মক রোগ-বিধায় কোনো এলাকা থেকে ছাগল সংগ্রহ করার আগে উক্ত এলাকায় পিপিআর রোগ ছিল কীনা তা জানতে হবে। উক্ত এলাকা কমপক্ষে ৪ মাস আগে থেকে পিপিআর মুক্ত থাকলে তবেই সেখান থেকে ছাগল সংগ্রহ করা যেতে পারে।

ছাগল ক্রয় ঃ

সাধারণত যমুনা ও ব্রহ্মপুত্রের চর অঞ্চল, ময়মনসিংহের ত্রিশাল, পটুয়াখালীর কলাপাড়া, বগুড়ার ধুনট, ফরিদপুর, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ অঞ্চলে উন্নতমানের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পাওয়া যায়। এসব স্থান থেকে ব্যক্তিগত ভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ছাগল ক্রয় করা যেতে পারে।

বাছাইকৃত ছাগলের পরিবহন ব্যবস্থা ঃ

নির্বাচিত ছাগলকে পূর্বে পিপিআর ভ্যাকসিন দেয়া না থাকলে পরিবহনের ২১ দিন পূর্বে পিপিআর ভ্যাকসিন দিতে হবে। পরিবহনের পূর্বে ছাগলকে পর্যাপ্ত পরিমাণ লবণ ও চিটাগুড় মিশ্রিত পানি (পানি ১ লিটার, লবণ ১০ গ্রাম ও চিটাগুড় ৫০ গ্রাম) খাওয়াতে হবে। অতিরিক্ত গরম বা ঠান্ডা কিংবা ঝড়-বৃষ্টিতে এদের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পরিবহন করা মোটেও উচিত নয়

খামারে ছাগল পালনের জন্য ছাগী ও পাঁঠা নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ

লাভজনকভাবে খামার পরিচালনা করতে হলে খামারে পালনের জন্য ছাগল নির্বাচনের সময় কয়েকটি বিষয় সতর্কতার সাথে বিবেচনা করতে হবে। খামারে পালনের জন্য ক্রয়কৃত/নির্বাচিত ছাগলকে সকল প্রকার সংক্রামক ব্যাধি মুক্ত হতে হবে। তা ছাড়া চর্মরোগ, চোখের রোগ এবং বংশগত রোগ ব্যাধি থাকা চলবে না। যেসব এলাকায় সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে বা কিছুদিন পূর্বে হয়েছিল এমন এলাকা হতে ছাগল সংগ্রহ করা যাবে না। খামারে প্রতিপালনের জন্য উন্নত জাতের ছাগী ও পাঁঠা নির্বাচন করতে হবে।

ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা

ছাগলের খাদ্যাভ্যাস ঃ

ছাগল রোমন্থক প্রাণী। ছাগল সেলুলোজ বা আঁশ জাতীয় খাবার হজম করতে পারে। এ ছাড়া ছাগল সংকটকালে নাইট্রোজেন ও পানি অধিকতর দক্ষভাবে শরীরের কাজে লাগাতে পারে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা খাদ্যের অভাব হলে ছাগল অত্যন্ত নিম্ন পুষ্টিমানযুক্ত খাদ্য খেতে পারে যা সচরাচর অন্যান্য গৃহপালিত প্রাণি খায় না। এরা সাধারণ বা নিম্নমানের খাদ্য খেয়েই প্রয়োজনীয় পুষ্টির চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়। ছাগল সাধারণত কাঁঠাল, আম, কলা, তুঁত, পাকুড়, মেহগনি, বট, বরই, ছুঁই, সূর্যমুখী প্রভৃতি গাছের পাতা খেয়ে থাকে। এ ছাড়া রাস্তা ঘাটের দুর্বাঘাস, লতা, গুল্ম, কাটা-ঝোপ এবং বাড়ির শাক-সবজি ও ফলমূলের উচ্ছিষ্টাংশ ও খোসা খেয়ে ছাগল তার খাদ্যের চাহিদা মিটিয়ে থাকে। ছাগলকে সুস্থ ও সবল রাখতে হলে এবং অধিক উৎপাদন পেতে হলে একে নিয়মিত সুষম খাদ্য খাওয়ানো উচিৎ। অধিক দুধ ও মাংস এবং উন্নতমানের চামড়া উৎপাদনের জন্য ছাগলকে সম্পূরক দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হয়।

খাদ্যের সুস্বাদুতা ঃ

ছাগল অন্যান্য প্রাণীর খাদ্যের উচ্ছিষ্টাংশ সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে। আবার ছাগলের সামনে গাছের ডালপালা ও কান্ডসহ পাতা দিলে ছাগল কান্ড বাদে শুধু পাতা খেয়ে থাকে। ছাগল সাধারণত বেছে বেছে খাদ্য মনোনীত করে খেয়ে থাকে। ছাগল মিষ্টি, তিক্ততা এবং টক স্বাদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। এরা তিক্ত স্বাদ বেশি সহ্য করতে পারে। ছাগল লিগিউম জাতীয় বেশী পছন্দ করে। ওগাস ঘাস, ভুট্টা, জোয়ার ইত্যাদি কাঁচা ঘাস পছন্দ করলেও সাইলেজ পছন্দ করে না। নিতান্ত বাধ্য না হলে এরা সাইলেজ খেতে চায় না।

খাদ্যের সুষমকরণ ঃ

বিজ্ঞানীগণ পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, ছাগল দুধ উৎপাদনের জন্য তার ওজন অনুপাতে ৭.৮ ভাগ বেশী খায়। ৪.৫ লিটার দুধ দেয় এমন একটি ছাগলের দৈনিক গড়ে ১.৮ কেজি শুষ্ক বস্তু (ড্রাই ম্যাটার) বিশিষ্ট খাদ্য প্রয়োজন যদিও ঐ ছাগল স্বাধীনভাবে চরে দৈনিক সর্বাধিক ৩.১৮ কেজি পরিমাণ শুষ্ক বস্তু (ড্রাই ম্যাটার) বিশিষ্ট খাদ্য খেয়ে থাকে। ছাগলের দেহের তুলনায় পেটের স্থিতি বড় হওয়ায় তার পেট পরিপূর্ণতার দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। পেটের স্থিতি পূর্ণ করার জন্য দানাদার খাদ্যের পাশাপাশি ছাগলকে সেলুলোজ বা আঁশ জাতীয় খাদ্য খাওয়ানো প্রয়োজন।

খাদ্যের পুষ্টিমান ঃ

বয়স্ক ছাগলের তুলনায় বাচ্চা ছাগলের দানাদার খাদ্য মিশ্রণে কম আঁশ, উচ্চ ও মিহি ও উচ্চ বিপাকীয় শক্তি থাকতে হবে। ৪-১৫ বয়সী ছাগল (বাড়ন্তকালীন সময়) কে পর্যাপ্ত প্রোটিন সমৃদ্ধ দানাদার ও আঁশজাতীয় খাদ্য প্রদান করা প্রয়োজন। মনে রাখা দরকার যে, ছাগল খামারের খাদ্য বাবদ ব্যয় মোট ব্যয়ের ৬০-৭০ ভাগ। তাই খামারের লাভ লোকসান খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও ব্যয়ের উপর নির্ভরশীল। দানাদার খাদ্যের মূল্য আঁশ জাতীয় খাবারের চেয়ে বেশি। তাই আঁশ জাতীয় খাবার থেকে যত বেশি পুষ্টি চাহিদা মেটানো যাবে তত ব্যয় কমানো যাবে। নিম্নে ছাগলের দৈনিক খাদ্য সরবরাহের তালিকা ছক আকারে দেখানো হলো।

বাড়ন্ত ছাগলের দৈনিক খাদ্য সরবরাহের তালিকা, দুগ্ধবতী ছাগীর দৈনিক খাদ্য সরবরাহের তালিকা, বিভিন্ন ওজনের খাসীর দৈনিক খাদ্য সরবরাহের তালিকা, বাচ্চা ও বড় ছাগলের দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ

বাড়ন্ত ছাগলের দৈনিক খাদ্য তালিকা

ছাগলের ওজন (কেজি)	দানাদার খাদ্য (গ্রাম)	ঘাস (কে.জি.)
৪	১০০	০.৪
৬	১৫০	০.৬
৮	২০০	০.৮
১০	২৫০	১.০
১২	৩০০	১.০
১৪	৩৫০	১.৫
> ১৪	৩৫০	২.০

দুগ্ধবতী ছাগীর দৈনিক খাদ্য তালিকা

ছাগীর ওজন (কেজি)	দুধের পরিমাণ (কেজি)	দানাদার খাদ্য (গ্রাম)	ঘাস/পাতা (কেজি)	খড় (গ্রাম)	ভাতের মাড় (কেজি)
২০	০.৫০	৩০০	১.৫		১.০
২৫	০.৮০	৪০০	১.৫	-	১.২
৩০	১.০০	৪০০	২.০	৩০০	১.৫
৩৫	১.০০	৪০০	২.৫	৪০০	২.০
৪০	১.০০	৮০০	২.৫	৩৫০	২.০

বাচ্চা ও বড় ছাগলের দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ

খাদ্যের উপাদান	বাচ্চা ছাগলের খাদ্য	বড় ছাগলের খাদ্য
ডাল ভাঙ্গা	২০ ভাগ	১৫ ভাগ
গম ভাঙ্গা	২০ ভাগ	৩৫ ভাগ
তিলের খৈল	৩৫ ভাগ	২৫ ভাগ
গমের ভুষি	২০ ভাগ	২০ ভাগ
খনিজ মিশ্রণ	০৪ ভাগ	০৪ ভাগ
লবণ	০১ ভাগ	০১ ভাগ
মোট	১০০ ভাগ	১০০ ভাগ

বিভিন্ন ওজনের খাসীর দৈনিক খাদ্য তালিকা

বয়স (মাস)	ওজন (কেজি)	ঘাস/পাতা (কেজি)	ইউরিয়া মিশ্রিত খড় (কেজি)	দানাদার খাদ্য (গ্রাম)	ভাতের মাড় (কেজি)
৩	৬.০	০.৪০	০.০২	১০০	৪০০
৪	৭.৮	০.৪৫	০.০৫	২০০	৪০০
৫	৯.৫	০.৫০	০.০৫	২০০	৪০০
৬	১১.৫	০.৬০	০.১০	২৫০	৪০০
৭	১৩.৭	০.৮০	০.১৫	২৫০	৮০০
৮	১৫.০	১.০০	০.২০	৩০০	৮০০
৯	১৬.৮	১.০০	০.২০	৩০০	৮০০
১০	১৮.৬	১.২০	০.২০	৩০০	৪০০
১১	২০.৫	১.৩০	০.২০	৩০০	৪০০
১২	২২.২	১.৩০	০.২০	৩০০	৪০০
১৩	২৪.০	১.৫০	০.২০	৩০০	৪০০
১৪	২৫.৮	১.৬০	০.২০	৩০০	৪০০
১৫	২৭.৫	১.৭০	০.২০	৩০০	৪০০

বাচ্চা ছাগল ব্যবস্থাপনা

বাচ্চাকে মায়ের দুধ ছাড়ানোর পূর্বে ব্যবস্থাপনা

- যেসব বাচ্চা দুর্বল উঠে দাঁড়াতে অক্ষম তাদেরকে মায়ের দুধের পাশাপাশি মাল্টিভিটামিন মিনারেল দ্রবণ তৈরী করে খাওয়াতে হবে
- প্রয়োজনে প্রতি কেজি ওজনের জন্য বাচ্চাকে ১.৩৩ মিলি: হারে ক্যালসিয়াম শিরায় ইনজেকশন দিতে হবে
- তাছাড়া পর্যাপ্ত পরিমাণে স্যালাইন খাওয়াতে হবে
- বাচ্চাকে চর্মরোগ বা বাহ্যিক পরজীবি থেকে রক্ষা করার জন্য ০.৫% ম্যালাথিয়ন দ্রবণে প্রতি ২ মাসে অন্তত একবার চুবাতে হবে। এক্ষেত্রে বাচ্চার মুখে, নাকে বা কানে যাতে উক্ত দ্রবণ না ঢুকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে
- যেসব টিকা দুধ ছাড়ানোর পূর্বে দিতে হয় সেগুলো দিতে হবে
- অন্তঃ পরজীবির হাত থেকে বাচ্চাকে রক্ষা করার জন্য ৩-৪ মাস বয়স হতে ৪-৬ মাস অন্তর অন্তর কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়াতে হবে
- দানাদার খাদ্য মিশ্রণে পর্যাপ্ত ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স মিশিয়ে বাচ্চাকে খাওয়াতে হবে
- দুধ বন্ধ করার পূর্বেই বাচ্চাকে দানাদার ও আঁশ জাতীয় খাবারের সাথে অভ্যস্থ করাতে হবে
- যেসব বাচ্চাকে বোতলে দুধ খাওয়ানো হয় সকল পর্যায়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে এবং ঠান্ডা দুধ খাওয়ানো যাবে না

ক্ষুদ্র খামারে বাচ্চাকে দুধ ছাড়ানো (Weaning)

মা ছাগল থেকে বাচ্চা আলাদা করা নির্ভর করে কোন উদ্দেশ্যে ছাগল পালন করা হচ্ছে তার উপর। যেমন- মাংস উৎপাদনের জন্য পালন করা হলে বাচ্চাকে বেশী দিন পর্যন্ত দুধ পান করাতে হবে। আমাদের মতে গ্রীষ্মমন্ডলীয় দেশে সাধারণত ৩ মাস বয়সের পূর্বে এ ধরণের বাচ্চা ছাগল মা থেকে আলাদা করা ঠিক নয়। তবে, যেসব ছাগল বেশী দুধ দেয় তাদের ক্ষেত্রে বাচ্চাকে ৩-৪ দিন কলস্ট্রামসমৃদ্ধ দুধ পান করানোর পর আলাদা করে নেয়া যেতে পারে এবং এক্ষেত্রে বোতলে দিয়ে দুধ পানের অভ্যাস করাতে হবে। ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের বাচ্চা ৩-৪ মাসের মধ্যে দুধ ছেড়ে দেয়। ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল সাধারণত ৩-৪ মাস বয়সে ৩-৪ কেজি ওজন হয়। এই সময় তাদের ঘাস জাতীয় খাদ্য হজম করার শক্তি পুরোপুরি হয় না। পাঁঠা বাচ্চাকে মায়ের দুধ ছাড়ানোর পর থেকেই পাঁঠা বাচ্চা আলাদা রাখতে হবে। আট থেকে নয় মাস বয়সের পাঁঠা বাচ্চাকে প্রজনন কাজে ব্যবহার করা যাবে। তবে ১২ মাস বয়সের পরই ব্যবহার করা উত্তম। বাচ্চার বয়স যখন ৫ (পাঁচ) মাস তখন তাকে পিপিআর ভেকসিন ও কৃমিনাশক দিতে হবে।

পারিবারিক খামারে দুগ্ধবতী ছাগলের ব্যবস্থাপনা

দুগ্ধদোহন

- ভাল ব্যবস্থাপনায় ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল বাচ্চাকে খাওয়ানোর পরও দৈনিক ৫০০-১০০০ গ্রাম দুধ দিতে পারে
- যেসব ছাগী পর্যাপ্ত দুধ দেয় তাদেরকে দুধ দোহন করলে দুধের উৎপাদন বেড়ে যায়
- দুধ দোহানোর পূর্বে ছাগলকে একটি পরিষ্কার জায়গায় কিছু দানাদার খাদ্য বা আকর্ষণীয় কচি ঘাস পাতা দেওয়া উচিত
- পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত পাত্রে দুধ দোহানো উচিত
- দুধ দোহানোর পূর্বে দুই হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে মুছে নিতে হবে
- দুধ দোহানোর সময় নিঃশব্দ, শান্ত ও সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা উচিত
- ওলানকে হালকা গরম পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার গামছা বা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছা উচিত
- ছাগলের ওলানকে পর্যায়ক্রমে পিছন থেকে সামনের দিকে মালিশ করতে হবে, এতে ছাগলের কেবল রসম ভেদই হবে পড়ে না অধিকন্তু ছাগীকে দুধ দোহানোর জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করা হয়
- দুধ দোহানোর সময় বাঁটের গোড়ার অংশকে দ্বিতীয় তৃতীয় ও কনিষ্ঠ আঙ্গুল দিয়ে ধীরে ধীরে চাপ দিয়ে বাঁটের সম্পূর্ণ দুধ বের করতে হবে, এবার হাত খুলে বাঁটে আবার দুধ আসলে পুনরায় বর্ণিত নিয়মে দুধ দোহাতে হবে
- বাঁট শক্ত বা অতিরিক্ত গরম হলে বুঝতে হবে ওলান প্রদাহ (Mastitis) হয়েছে, এ ধরণের ছাগলকে সবার শেষে দোহাতে হবে

সাধারণ পরিচর্যা সমূহঃ

- ছাগলকে প্রতিদিন সকালে ঘর থেকে বের করে খোয়াড়ে কিংবা ঘরের আশেপাশে খোলা জায়গায় চরতে দিতে হবে
- এদেরকে ব্যায়াম ও গায়ে সূর্য কিরণ লাগানোর পর্যাপ্ত সুযোগ প্রদান করতে হবে
- ঘর থেকে ছাগল বের করার পর তা ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে
- খামারে বেশী ছাগল থাকলে ওদেরকে চিহ্নিত করার জন্য নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কানে ট্যাগ (tag) নম্বর লাগাতে হয়, এটা ছোট বড় যে কোনো খামারের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়
- ছাগলকে নিয়মিত সুষম খাবার সরবরাহ করতে হবে
- খাবার ও পানির পাত্র পরিষ্কার করে তা খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানি দিয়ে পূর্ণ করে দিতে হবে
- প্রতিটি ছাগলকে আলাদাভাবে দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে
- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর খাবার দিতে হবে, সময়ের হেরফের করা যাবে না
- পাতাসহ আম-কাঁঠালের ডাল ঝুলিয়ে সরবরাহ করলে ভালো হয়
- এরা পানি পছন্দ করে না, তাই নিয়মিত গোসলের পরিবর্তে ব্রাশ দিয়ে ঘষে দেহ পরিষ্কার করতে হয়, এতে লোমের ভিতরের ময়লা বেড়িয়ে আসে এবং রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া বৃদ্ধি পায়, নিয়মিত ব্রাশ করলে লোম উজ্জ্বল দেখাবে ও চামড়ার মান বৃদ্ধি পায়।
- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে দুগ্ধবতী ছাগীর দুধ দোহন করতে হবে
- দুধ দোহনের সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে
- ঘরের কোনো ছাগল অসুস্থ হলো কিনা তা নিয়মিত লক্ষ্য রাখতে হবে, কোন ছাগলের মধ্যে অসুস্থতার লক্ষণ দেখা গেলে সাথে সাথে তাকে পৃথক করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে
- সকল বয়সের ছাগলকে নিয়মিত কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়াতে হবে ও টিকা প্রদান করতে হবে

বিশেষ পদ্ধতিতে ছাগল পালন

১). সেমি ইন্টেনসিভ পদ্ধতিঃ

সেমি ইন্টেনসিভ/আধা নিবিড় পদ্ধতিতে খামারে ২০ বা ততোধিক সংখ্যক ছাগল পালন করা হয়। খামারীর বিনিয়োগ ও ইচ্ছার উপর এ সংখ্যা নির্ভরশীল। এ পদ্ধতিতে ছাগলকে দিনের বেলায় প্রাকৃতিক পরিবেশে খামারের নিজস্ব জমিতে চরানো হয় এবং রাতের বেলায় ঘরে আবদ্ধ অবস্থায় রাখা হয়। ছাগলের পুষ্টি চাহিদা মেটানোর জন্য দানাদার খাদ্য ও কাঁচা ঘাস সরবরাহ করা হয়।

সেমি ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ছাগল পালনের সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ ঃ

অন্যের ফসলের ক্ষতি সাধনের সম্ভাবনা থাকে না বলে বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী। ছাগলকে উপযুক্ত বাসস্থান ও উপযুক্ত খাদ্য প্রদান করা হয়। খাদ্য ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার পেছনে বেশি বিনিয়োগ করা হয় বলে উৎপাদন আশানুরূপ হয়। ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিকল্পিত প্রজনন করা হয়। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রোগ ব্যাধি নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা করা হয়। বিনিয়োগের উপর আয় নির্ভরশীল। বিনিয়োগ যত বেশি হবে অর্থাৎ যত বেশি সংখ্যায় ছাগল পালন করা হবে আয়ও সে অনুপাতে বেশি হবে।

সেমি ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ছাগলের ঘরের স্থান নির্বাচনঃ

লাভজনকভাবে খামার করতে হলে ছাগলের জন্য পরিষ্কার, শুষ্ক, দুর্গন্ধমুক্ত, উঁচু, পর্যাপ্ত আলো ও বায়ু চলাচলের পরিবেশ রয়েছে এমন আবাসন প্রয়োজন। অপরিষ্কার স্যাঁতস্যাঁতে, বদ্ধ, অন্ধকার ও দুর্গন্ধময় পরিবেশে ছাগলের বিভিন্ন রোগ-বালাই হতে পারে। ফলে দৈহিক ওজন বৃদ্ধির হার, দুধ উৎপাদনের পরিমাণ এবং বাচ্চা উৎপাদনের হার কমে যায়।

সেমি ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ছাগলের বাসস্থান নির্মাণঃ

আয়তন: সেমি ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ছাগলকে সাধারণতঃ ১৪-১৬ ঘন্টা সময় ঘরে আবদ্ধ রাখা হয়। এজন্য এ পদ্ধতিতে একটি ছাগলের জন্য ৮-৯ বর্গফুট জায়গার প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ ১৬x১২ বর্গফুট ঘরে ২৪ টি বয়স্ক ছাগল রাখা যায়। প্রতিটি বাড়ন্ত বাচ্চার জন্য গড়ে ৫-৭ বর্গফুট জায়গার প্রয়োজন হয়।

ঘরের ধরণ: সেমি ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে পালনের জন্য ছাগলের ঘর ছন, গোলপাতা, খড়, টিন বা ইটের তৈরি হতে পারে। ঘরের ভিতর বাঁশ বা কাঠের মাচা তৈরি করে তার উপর ছাগলকে রাখতে হবে। মাচার উচ্চতা ৫ ফুট হবে এবং মাচা থেকে ছাদের উচ্চতা হবে ৬-৮ ফুট। গোবর ও প্রস্রাব পড়ার সুবিধার্থে মাচার মেঝেতে বাঁশের চটা বা কাঠকে ১ ইঞ্চি ফাঁকা রাখতে হবে। শীতের সময় মাচার উপর ৪-৫ ইঞ্চি পুরু খড়ের বেডিং বিছিয়ে দিতে হবে।

বাস ঘরের বিন্যাস: বিভিন্ন বয়সের এবং বিভিন্ন ধরণের ছাগলকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে/প্রকোষ্ঠে রাখা উচিৎ। পাঠাকে সবসময় ছাগী হতে পৃথক রাখা উচিৎ। দুগ্ধবতী, গর্ভবতী ও শুষ্ক ছাগীকে একসাথে রাখা যেতে পারে। ছাগল ছানাকে ১ মাস বয়স পর্যন্ত মা ছাগীর সাথে রাখা উচিৎ। বাড়ন্ত ছাগল ও খাসীকে একসাথে রাখা যেতে পারে তবে তাদেরকে পৃথকভাবে খাওয়াতে হবে।

ব্রুডিং পেন: বাঁশের খাঁচা বা কাঠের বাক্সকে ব্রুডিং পেন হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এর চারপাশ ছালা বা চটের বস্তা দিয়ে ঢাকা থাকবে। খাঁচার মেঝেতে ৪-৫ ইঞ্চি পুরু খড় বিছানো থাকবে। ৬০x৫৬x৬০ ঘন সে.মি. আয়তনের ব্রুডিং পেনে ২ টি ছাগীসহ ৪-৬ টি বাচ্চা রাখা হয়। তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসের নিচে নামলে খাঁচা প্রতি ১ টি ১০০ ওয়াটের বাল্ব জ্বালিয়ে তাপমাত্রা ২০-২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে রাখা যায়।

সেমি ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঃ

সেমি ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ছাগলের খাদ্যের পরিমাণ ও গুণগত মান নির্ভর করে চারণ ভূমিতে প্রাপ্ত ঘাসের পরিমাণ ও গুণগত মানের উপর।
বয়স ও উৎপাদনের ভিত্তিতে এ পদ্ধতিতে ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা নিম্নরূপঃ

ক) ছাগল ছানার কলস্ট্রাম ও দুধ খাওয়ানো ঃ সাধারণতঃ ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বাচ্চার ওজন জন্মের সময়ে ০.৮-১.৫ কেজি হয়। জন্মের পরপরই ছাগল ছানাকে কলস্ট্রাম বা শাল দুধ খাওয়াতে হবে। শাল দুধ বাচ্চার দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে। প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ছাগল ছানাকে ১৫০-২০০ গ্রাম শাল দুধ খাওয়াতে হবে। এ পরিমাণ দুধ দিনে ৮-১০ বারে খাওয়াতে হবে। শাল দুধ খাওয়াতে দেরি হলে বহুবিধ সমস্যা হয়। দুই বা ততোধিক বাচ্চা হলে প্রত্যেকেই যেন শাল দুধ পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। ছাগল ছানা সাধারণত ২-৩ মাসের মধ্যে দুধ খাওয়া ছেড়ে দেয়। জন্ম হতে তিন মাস বয়স পর্যন্ত ছাগল ছানাকে নিম্নোক্ত হারে খাদ্য প্রদান করা উচিৎঃ

বয়স (সপ্তাহ)	প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ছাগলের দুধ খাওয়ানোর পরিমাণ	প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য দানাদার খাদ্য খাওয়ানোর পরিমাণ	কাঁচা ঘাস
০-২	২০০ গ্রাম	সামান্য পরিমাণ	সামান্য পরিমাণ
৩-৪	১৫০ গ্রাম	সামান্য পরিমাণ	সামান্য পরিমাণ
৫-৬	১৫০ গ্রাম	২০ গ্রাম	সামান্য পরিমাণ
৭-৮	১৩০ গ্রাম	৪০ গ্রাম	চাহিদা অনুযায়ী
৯-১০	১২০ গ্রাম	৬০ গ্রাম	চাহিদা অনুযায়ী
১১-১২	১০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম	চাহিদা অনুযায়ী

ছাগল ছানার বয়স ভিত্তিক খাদ্য সরবরাহ

ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের একটি ছাগী এক সাথে ৩-৪ টি বাচ্চা প্রসব করে। কিন্তু ছাগীর দুধের বাট দুটি হওয়ায় সবগুলো বাচ্চা একসাথে মায়ের দুধ খেতে পারে না। ফলে অপেক্ষাকৃত দুর্বল বাচ্চা আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে ছাগল ছানাকে নিম্নোক্ত মিশ্রণ অনুযায়ী মিল্ক রিপ্লেসার খাওয়ানো যেতে পারে।

উপাদান পরিমাণ	(%)
ননী মুক্ত গুড়া দুধ (স্কিম মিল্ক) পাউডার	৭০
চাল, গম বা ভুট্টার গুড়া	২০
সয়াবিন তেল	৭
লবন	১.৫
ডাই-ক্যালসিয়াম ফসফেট	১
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫

মিল্ক রিপ্লেসারের বিভিন্ন উপাদান

উক্ত মিশ্রণের একভাগ, নয় ভাগ উষ্ণ (৩৯-৪০ ডিগ্রী সেলসিয়াস) পানির সাথে মিশিয়ে ভালমত ফুটানোর পর ঠান্ডা করে ছাগল ছানাকে খাওয়াতে হবে।

খ) কিড স্টার্টার : ছাগল ছানার দানাদার খাদ্য মিশ্রণে কম আঁশ, উচ্চ প্রোটিন এবং উচ্চ বিপাকীয় শক্তি থাকতে হবে। নিম্নে ছাগল ছানার কিড স্টার্টার এর কয়েকটি সম্ভাব্য মিশ্রণ দেয়া হলো:

কিড (০-৩ মাস) স্টার্টারের সম্ভাব্য মিশ্রণ (%)			
উপাদান	মিশ্রণ-১	মিশ্রণ-২	মিশ্রণ-৩
গম/চাল/ভুট্টা ভাঙ্গা	২৫.০	২৫.০	২৫.০
মাসকালাই/খেসারী ভাঙ্গা	২৫.০	২০.০	২৫.০
গমের ভুসি/চালের কুড়া	২৩.০	২৫.০	২৫.০
তিলের খৈল	১০.০	৫.০	-
সরিষার খৈল	৮.০	১৫.০	১৭.০
শুটকি মাছের গুড়া	-	২.০	-
চিটাগুড়	৪.০	৫.০	৩.০
সয়াবিন তেল	২.০	১.০	১.৫
লবন	১.০	১.০	১.০
ডাই-ক্যালসিয়াম ফসফেট	০.৫	০.৫	০.৫
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫	০.৫	০.৫

স্টল ফিডিং পদ্ধতিতে ছাগল পালন

স্টল ফিডিং পদ্ধতিতে ছাগলের ঘর:

স্টল ফিডিং পদ্ধতিতে পালনের জন্য প্রতিটি বয়স্ক ছাগলের জন্য প্রায় ১০ বর্গ ফুট স্থানের প্রয়োজন হয়। ঘরটি বাঁশ, কাঠ বা ইটের তৈরি হতে পারে। ঘর নির্মাণের সময় উপরের অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় এনে ঘর নির্মাণ করতে হবে। ঘরটি বাঁশের তৈরি হলে শীতের রাতে ঘরের বেড়া চট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে এবং মেঝেতে খড় বিছিয়ে দিতে হবে।

স্টল ফিডিং পদ্ধতিতে ছাগলকে ঘরে থাকতে অভ্যস্তকরণ:

স্টল ফিডিং পদ্ধতিতে পালনের জন্য সংগৃহীত ছাগলকে সংগ্রহের সাথে সাথেই সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় রাখা উচিৎ নয়। প্রথমে ছাগলকে দিনে ৬-৮ ঘন্টা চরিয়ে বাকী সময় আবদ্ধ অবস্থায় রেখে পর্যাপ্ত খাদ্য (ঘাস ও দানাদার) সরবরাহ করতে হবে। এভাবে ১-২ সপ্তাহের মধ্যে চরানোর সময় পর্যায়ক্রমে কমিয়ে সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় রাখতে হবে। তবে ছাগল ছানাকে বাচ্চা বয়স থেকে আবদ্ধ অবস্থায় রাখলে এ ধরণের অভ্যস্তকরণের প্রয়োজন নেই।

স্টল ফিডিং পদ্ধতিতে ছাগলের বাচ্চার পরিচর্যাঃ

জন্মের পরপরই ছাগল ছানাকে পরিষ্কার করে শাল দুধ খাওয়াতে হবে। এক মাস বয়স পর্যন্ত ছাগল ছানাকে দিনে ১০-১২ বার দুধ খাওয়াতে হবে। বাচ্চার চাহিদার তুলনায় মা ছাগীতে দুধ কম থাকলে প্রয়োজনে অন্য ছাগীর দুধ বাচ্চাকে খাওয়াতে হবে। এ ধরণের ছাগীর দুধ পাওয়া না গেলে বিকল্প দুধ বা মিল্ক রিপ্লেসার খাওয়াতে হবে। দুধ খাওয়ানোর আগে ফিডার, নিপলসহ সকল প্রকার জিনিসপত্র পানিতে ফুটিয়ে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে। এক হতে দেড় কেজি ওজনের একটি ছাগল ছানার দৈনিক ২৫০-৩০০ গ্রাম দুধ প্রয়োজন। ওজন বৃদ্ধির সাথে সাথে দুধের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। বাচ্চার বয়স ২-৩ মাস হলে বাচ্চা দুধ খাওয়া ছেড়ে দিবে। সাধারণত ভালো জাতের ছাগীকে প্রয়োজনমত খাওয়ালে বাচ্চার প্রয়োজনীয় দুধ পাওয়া যায়। বাচ্চার ১ মাস বয়স হতে ধীরে ধীরে কাঁচা ঘাস ও দানাদার খাদ্যে অভ্যস্ত করাতে হবে। ছাগল ছানার পরিচর্যা সম্পর্কে বিস্তারিত উপরের অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

স্টল ফিডিং পদ্ধতিতে ছাগলকে খাওয়ানোঃ

ছাগল সাধারণত তার ওজনের ৪-৫% হারে খেয়ে থাকে। এ খাদ্যের মধ্যে ৬০-৭০% আঁশ জাতীয় খাবার (ঘাস, লতা, পাতা, খড় ইত্যাদি) এবং ২০-৪০% দানাদার খাবার (কুঁড়া, ভুষি, চাল, ডাল, খৈল ইত্যাদি) থাকতে হবে। একটি বাড়ন্ত খাসীকে দৈনিক ২০০-২৫০ গ্রাম দানাদার খাবার প্রদান করতে হবে। দুই থেকে তিন বাচ্চা বিশিষ্ট ২৫ কেজি ওজনের ছাগীর দৈনিক প্রায় ৩৫০-৪৫০ গ্রাম দানাদার খাদ্য প্রয়োজন হয়। একটি প্রজনক পাঁঠার দৈনিক ২০০-৩০০ গ্রাম দানাদার খাদ্য প্রয়োজন।

ছাগলের দানাদার খাদ্যের সাধারণ মিশ্রণ (%)	
উপাদান	শতকরা হার
গম/চাল/ভুট্টা ভাঙ্গা	৩৫.৫০
গমের ভুষি/আটা/কুঁড়া	২৪.০০
খেসারী/মাসকালাই/অন্য ডালের ভুষি	১৬.০০
সয়াবিন/তিল/নারিকেল/সরিষা ইত্যাদির খৈল	২০.০০
শুঁটকি মাছের গুঁড়া	১.০০
ডাই-ক্যালসিয়াম ফসফেট	২.০০
লবণ	১.০০
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫০

স্টল ফিডিং পদ্ধতিতে ছাগলকে ঘাস ও খড় খাওয়ানোঃ

স্টল ফিডিং পদ্ধতিতে একটি বাড়ন্ত খাসীকে দৈনিক ১.০-১.৫ কেজি কাঁচা ঘাস প্রদান করতে হবে। দুই থেকে তিন বাচ্চা বিশিষ্ট ২৫ কেজি ওজনের ছাগীকে দৈনিক ১.৫-২.৫ কেজি কাঁচা ঘাস এবং একটি প্রাপ্ত বয়স্ক পাঁঠাকে দৈনিক ১.৫-২.৫ কেজি কাঁচা ঘাস প্রদান করা প্রয়োজন। ঘাস পাওয়া না গেলে খড়কে ২-৩ ইঞ্চি পরিমাণ কেটে ইউরিয়া মোলাসেস দিয়ে মিশিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে।

ছাগলের প্রজনন ব্যবস্থাপনা

উন্নতমানের ও অধিক উৎপাদনশীল বাচ্চা পেতে হলে ছাগলকে সুপরিকল্পিত ভাবে প্রজনন করাতে হবে। ক্রমাগত বাছাই পদ্ধতিতে দলের মধ্যে উন্নত মানের পাঁঠা এবং প্রজনন উপযোগী ছাগী নির্বাচন করে তাদের মধ্যে প্রজনন ঘটিয়ে ছাগলের মান উন্নয়ন করা হয়। বাছাই করার সময় নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে।

প্রজনন উপযোগী ছাগলের বৈশিষ্ট্যঃ

বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য	উৎপাদন বৈশিষ্ট্য	পুনরুৎপাদন বৈশিষ্ট্য
দৈহিক বৃদ্ধির হার	বাচ্চা প্রতি মাসে উৎপাদন	বয়ঃপ্রাপ্তির বয়স
দৈহিক পরিপক্কতার আসার বয়স ও ওজন	ড্রেসিং আউট পার্সেন্টেজ	প্রথম প্রজননের সময় বয়স ও ওজন
জন্মকালীন বাচ্চার ওজন	চামড়ার গুণাগুণ	প্রথম গর্ভধারণের সময় বয়স ও ওজন
দুধ ছাড়ার বয়স ও ওজন	দুধ উৎপাদন	প্রথম প্রসবে ওজন ও বয়স
দুধ ছাড়ার পর দৈহিক বৃদ্ধির হার	লোম উৎপাদন	কিডিং ইন্টারভ্যাল
	রূপান্তর হার	প্রতিবার গর্ভধারণের জন্য পাল দেওয়ার সংখ্যা
		পাঁঠার শুক্রাণুর গুণগত মান

প্রজনন উপযোগী পাঁঠা নির্বাচন ঃ প্রজনন উপযোগী পাঁঠা নির্বাচনের সময় নিচের বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবেঃ

- পাঁঠার বয়স কমপক্ষে ১২ মাস বা তার বেশি হতে হবে
- পাঁঠা শারীরিকভাবে সুস্থ হবে এবং শরীরের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিখুঁত হবে
- পাঁঠা বুদ্ধি, আক্রমণাত্মক ও শৌর্য বীর্যের অধিকারী হবে
- পাঁঠার পিতা-মাতার অধিক উৎপাদনের রেকর্ড থাকতে হবে
- পাঁঠার অণ্ডকোষ বড় ও সুগঠিত হবে, পেছনের পা মজবুত ও শক্তিশালী হবে
- অবশ্যই সকল প্রকার যৌন রোগ হতে মুক্ত থাকবে

সুস্থ পাঁঠা

প্রজনন উপযোগী ছাগী নির্বাচনঃ প্রজনন উপযোগী ছাগী নির্বাচনের সময় নিচের বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবেঃ

- ছাগীর বয়স কমপক্ষে ৯ মাস হতে হবে, দৈহিক ওজন কমপক্ষে ১২ কেজি হতে হবে
- ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের হলে যমজবাচ্চা দেয় এমন ছাগী নির্বাচন করতে হবে
- দুধ উৎপাদনকারী জাতের হলে ওলান ও বাঁট বড় ও সুগঠিত হবে
- ছাগীর পিতা-মাতার অধিক উৎপাদনের রেকর্ড থাকতে হবে
- দৈহিক বৃদ্ধির হার বেশি এমন ছাগী নির্বাচন করতে হবে, ছাগী অবশ্যই শান্ত প্রকৃতির হবে

সুস্থ ছাগী

ছাগীর ইস্ট্রাস বা গরম হওয়ার লক্ষণঃ

- ছাগীর আচরণে অস্থিরতা দেখা যায়
- খাওয়া দাওয়া কমে যায় বা ছেড়ে দেয়
- মাঝে মাঝে উচ্চ স্বরে চিৎকার করে
- সঙ্গী অন্য ছাগলের পিঠের উপর লাফিয়ে উঠে, অন্য ছাগলকে তার পিঠে উঠতে দেয়
- ঘন ঘন লেজ নাড়ে, যোনীদ্বার (ভালভা) লাল হয় এবং ফুলে যায়
- যোনীদ্বার দিয়ে জেলির মত মিউকাস জাতীয় তরল পদার্থ বের হয়

ছাগীকে পাল দেওয়ার উপযুক্ত সময় নির্ধারণঃ

- ছাগী গরম হওয়ার ৮ ঘন্টা পর এবং ১৮ ঘন্টার মধ্যে পাল দিতে হয়
- প্রয়োজনে এ সময়ের মধ্যে দুইবার পাল দিয়ে গর্ভধারণ নিশ্চিত করা যায়, সকালে গরম হলে বিকালে এবং বিকালে গরম হলে পরের দিন সকালে পাল দেওয়া প্রয়োজন
- সঠিক সময়ে পাল দেওয়া না হলে পরবর্তী ১৮ দিন হতে ২১ দিনের মধ্যে ছাগী পুনরায় গরম হবে বা হিটে আসবে
- একবার বাচ্চা প্রসবের দেড় হতে দুই মাস পর ছাগী পুনরায় গরম হয়
- ছাগীকে ৩-৪ বার পাল দেওয়ার পরও গর্ভবতী না হলে অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে

ছাগলের টিকাদান কার্যক্রম

ছাগলের রোগ প্রতিরোধে কতিপয় আবশ্যকীয় টিকার বিবরণঃ

রোগ নিরাময়ের চেয়ে রোগ প্রতিরোধ উত্তম। রোগ প্রতিরোধের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হচ্ছে ভ্যাকসিন বা প্রতিষেধক টিকা কোন সুস্থ প্রাণীকে রোগ হওয়ার পূর্বেই একটি নির্দিষ্ট রোগের টিকা প্রদানের মাধ্যমে উক্ত রোগ হতে মুক্ত রাখার পদ্ধতিকে

অ্যাক্লিমেশন বলে। এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গড়ে ওঠে। এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কখনও কয়েক মাসের জন্য গড়ে ওঠে, আবার কখনও কয়েক বছর হতে আজীবন কাল হতে পারে।

ছাগলের রোগ প্রতিরোধে কতিপয় আবশ্যকীয় টিকার বিবরণঃ

টিকার নাম	টিকা প্রয়োগের বয়স	পরবর্তী টিকা প্রয়োগের সময়	টিকা প্রয়োগের স্থান	টিকা প্রয়োগের মাত্রা/পরিমাণ
পিপিআর টিকা	৪ মাস	১ বছর পর	চামড়ার নিচে	১ মি.লি
ক্ষুরা রোগ টিকা	৩ মাস	৬মাস পরপর	চামড়ার নিচে	মনো-১মিলি বাই-২ মি.লি. ট্রাই-৩মিলি
পেটে পচা টিকা	৪ মাস	৬ মাস পরপর	চামড়ার নিচে	১মিলি
বসন্ত রোগ টিকা	৪ মাস (বাচ্চার মাকে টিকা দেওয়া না হলে) ৬ মাস মাস (বাচ্চার মাকে টিকা দেওয়া হলে) ১ বছর পর বুষ্টারডোজ	১ বছর পর	চামড়ার নিচে /মাংসপেশীতে	১মিলি
অ্যানথ্রাক্স টিকা		১ বছর পর	চামড়ার নিচে	০.৫ মি.লি
গলাফুলা টিকা	৬মাস	১ বছর	চামড়ার নিচে	২মিলি
টিটেনাস টিকা (টিটেনাস টক্সয়েড)	প্রসবের পূর্বে ছাগীকে এবং প্রসবের পর বাচ্চাকে		মাংসে	১মিলি
কন্টাজিয়াস একথাইমা টিকা	১-৩ দিন (১ম ডোজ)	১০-১৪ দিন (২য় ডোজ) ৩ মাস (৩য়ডোজ) ১২ মাস (পরবর্তীডোজ)	উৎপাদনকারীর নির্দেশনামতে	

ছাগলের ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসজনিত রোগ ও তার প্রতিকার

পিপিআরঃ

পিপিআর ছাগলের একটি মারাত্মক রোগ। এ রোগের জীবাণু ছাগলের দেহে প্রবেশের ৪-৫ দিন পর রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। দ্রুত চিকিৎসা না করালে ছাগল মারা যেতে পারে। এ রোগে আক্রান্ত ছাগলের শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়, নাক দিয়ে শ্লেষ্মা ঝরে এবং নাকের ভিতরে শ্লেষ্মা জমে যায়, পাতলা পায়খানা বা ডায়রিয়া দেখা দেয়, জিহ্বা, দাঁতের মাড়ি, মুখগহ্বর ও মুখের ভিতর ঘা হয়, মলের রং গাঢ় বাদামী হয় এবং মলের সাথে মাঝে মাঝে রক্ত মিশানো মিউকাস আসে। শ্বাস কষ্ট, কাশি প্রভৃতি নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা যায়। চিকিৎসায় বিলম্ব হলে ৫-১০ দিনের মধ্যে ছাগল মারা যায়। এক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী পিপিআর আক্রান্ত ছাগলকে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে। এ রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রতিষেধক টিকা ব্যবহার করা প্রয়োজন। বাচ্চার ৪ মাস বয়সে টিকা প্রদান করতে হয়। অনেক সময় ঝুঁকি এড়াতে বাচ্চার ২ মাস বয়সে টিকা দেওয়া হলে পুনরায় ৪ মাস বয়সে দ্বিতীয় ডোজ দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। একবার টিকা দিলে ১ বছর পর্যন্ত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে।

পিপিআর রোগে আক্রান্ত ছাগল

ওলান প্রদাহ/ম্যাস্টাইটিস (Mastitis):

ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, মাইকোপ্লাজমা, ছত্রাক সহ ১৮-২০ ধরণের জীবাণু দ্বারা দুগ্ধবতী ছাগলের ম্যাস্টাইটিস বা ওলান প্রদাহ রোগ হয়ে থাকে। এ রোগে ছাগীর ওলান লাল হয়ে ফুলে যায়, শক্ত হয়ে যায়, হাত দিয়ে স্পর্শ করলে গরম অনুভূত হয়, দুধ দোহন করলে পাত্রে দুধের তলানি পড়ে, দুধ উৎপাদন কমে যায়, দুধের স্বাদ লবণাক্ত হতে পারে, তীব্র প্রকৃতির রোগে ওলানের ভিতর পুঁজ হয়। পরে দুধের সাথে রক্ত আসে ও দুর্গন্ধ হয়। ওলান ও বাটে ব্যথা হয় দুধ দোহন করতে বা বাচ্চাকে টেনে খেতে দিতে চায় না। একজন অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী আক্রান্ত ছাগলকে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে। এ রোগ প্রতিরোধের জন্য নিম্নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় -

ছাগলের ওলান প্রদাহ রোগ

- মাঝে মাঝে ওলানের প্রত্যেক কোয়ার্টারের দুধ কালো কাপড়ে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হবে কোন তলানি, পুঁজ বা রক্ত আছে কিনা, দুধের রং পরিবর্তন হয়েছে কিনা
- ছাগীকে পাশাপাশি বা ঠাসাঠাসি করে রাখা যাবে না, প্রসবের আগে ও পরে ছাগীকে শুকনো ও নরম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্থানে রাখতে হবে
- দুধ দোহনের সময় হাত পরিষ্কার করে নিতে হবে প্রয়োজনে সাবান বা ক্লোরিন সলিউশন ব্যবহার করা যেতে পারে
- বড় ছাগল ছানাকে ওলান থেকে দুধ চুষে খেতে দেওয়া যাবে না

ধনুষ্টংকার/টিটেনাসঃ

যে কোন অপারেশন, খাসিকরণ, বাচ্চা প্রসবের সময় ছাগীতে বা ছাগল ছানার নাভীতে ক্ষত সৃষ্টি হলে উক্ত ক্ষতে যদি ক্লোস্ট্রিডিয়াম টিটানি নামক ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ ঘটে তখন টিটেনাস রোগ হয়। এ রোগে আক্রান্ত ছাগলের চোয়াল, গলা ও দেহের অন্যান্য অংশের মাংসপেশী শক্ত হয়ে যায়। দাঁতের মাড়ির মাংসপেশী শক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে দাঁত লেগে যায় ফলে ছাগল খেতে পারে না। খিচুনি দেখা যায়, মুখ থেকে লালা ঝরে, প্রথম দিকে দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায় এবং শেষ দিকে তাপমাত্রা কমে যায়, দেহ শক্ত হয়ে বেঁকে যায়, পা ও ঘাড় শক্ত হয়ে যায় ফলে আক্রান্ত ছাগল চলাফেরা করতে পারেনা এমনকি দাঁড়াতেও পারেনা। তীব্র আক্রান্ত ছাগল কয়েকদিনের মধ্যে মারা যায়।

ধনুষ্টংকার

একজন অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী টিটেনাস আক্রান্ত ছাগলকে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে।

এ রোগ প্রতিরোধের জন্য নিম্নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়:

- খোঁজাকরণ, নাড়ি কর্তন, লোম কাটাসহ যে কোন ধরণের অপারেশনের সময় ছাগলকে টিটেনাস টক্সয়েড/এন্টি টিটেনাস সিরাম ইনজেকশন করতে হবে
- ডেটল, সেভলন প্রভৃতি এন্টিসেপটিক দিয়ে ক্ষতস্থান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে
- এক বছর পরপর দু'বার ছাগীকে এন্টিটিটেনাস সিরাম/টিটেনাস টক্সয়েড ইনজেকশন প্রদান করলে এ রোগের আশংকা অনেক কমে যাবে

তড়কা/এ্যানথ্রাক্সঃ

ব্যাসিলাস এ্যানথ্রাসিস নামক এক ধরণের ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এ রোগ হয়। এ রোগে আক্রান্ত ছাগল লক্ষণ প্রকাশের আগেই অনেক সময় মারা যায়। ছাগল নিস্তেজ হয়ে পড়ে দিয়ে হাঁপাতে থাকে, খিচুনি দেখা যায় এবং মারা যায়। শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায় (১০৩-১০৭ ডিগ্রি ফারেনহাইট), খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেয়, জাবর কাটে না, শ্বাস কষ্ট হয়, নাক মুখ দিয়ে লালা পড়ে, পেট ফুলে ওঠে, রক্ত মিশ্রিত পায়খানা হয়। রোগের তীব্রতা বৃদ্ধির সাথে সাথে মল কালো হতে হতে আলকাতরার মত হয়ে যায়। মরা ছাগলের নাক ও মুখ দিয়ে রক্ত মিশ্রিত ফেনা বের হয়। তড়কা একটি মারাত্মক ব্যাধি। রোগ লক্ষণ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে দেরী না করে একজন অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী আক্রান্ত ছাগলকে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে। এ রোগ প্রতিরোধের জন্য নিম্নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়

- মৃত ছাগলকে মাটিতে পুড়িয়ে ফেলতে হবে বা মাটির গর্তে বা চুন ব্লিচিং পাউডার দিয়ে তার উপর মৃতদেহ রেখে মৃতদেহের উপর আবার চুন বা ব্লিচিং পাউডার দিয়ে মাটি চাপা দিতে হবে
- কোন অবস্থাতেই মৃত ছাগলের চামড়া ছাড়ানো যাবে না, কারণ চামড়া এ রোগের জীবাণু বহন করে
- আক্রান্ত প্রাণি বা মৃতদেহ কোন অবস্থাতেই ব্যবচ্ছেদ করা যাবে না
- মৃত ছাগলের ব্যবহৃত সকল জিনিস পুড়ে ফেলতে হবে
- লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার সাথে সাথে আক্রান্ত প্রাণিকে পৃথক করে চিকিৎসা দিতে হবে
- অসুস্থ ছাগলকে বিক্রি করা যাবে না, অসুস্থ ছাগলকে এক স্থান হতে অন্য স্থানে চলাচল করানো যাবে না
- সুস্থ ছাগলকে নিয়মিত (১ বছর পর পর) এ্যানথ্রাক্স রোগের টিকা প্রদান করতে হবে

এন্টারোটক্সিমিয়াঃ

ক্লোস্ট্রিডিয়াম প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া সৃষ্ট টক্সিন দ্বারা এন্টারোটক্সিমিয়া রোগ দেখা দেয়। পঁচা ও দুর্গন্ধযুক্ত খাদ্যবস্তু এ রোগ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। এ রোগে আক্রান্ত ছাগল শরীরের ভার বহন করতে পারে না, চারণ-ভূমিতে হাটতে হাটতে কাঁপতে থাকে, খিঁচুনি দেখা যায়, মুখ দিয়ে লালা ঝরে, পেট ফুলে উঠে, ডায়রিয়া হয়। তীব্র প্রকৃতির রোগে হঠাৎ খিঁচুনি দিয়ে মারা যায়। রোগ লক্ষণ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে দেরী না করে একজন অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী এন্টারোটক্সিমিয়া আক্রান্ত ছাগলকে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে। এ রোগ প্রতিরোধের জন্য ছাগলকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্থানে রাখতে হবে এবং বিশুদ্ধ খাবার ও পানি প্রদান করতে হবে।

ক্ষুরারোগঃ

ক্ষুরারোগ ছাগলের একটি ছোঁয়াচে সংক্রামক রোগ। এ রোগে মৃত্যুর হার কম হলেও উৎপাদন মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ রোগে আক্রান্ত গাভীর দুধ উৎপাদন কমে যায়, গর্ভবতী ছাগীর গর্ভপাত হয়, শরীরে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে, মুখ হতে লালা ঝরে, মুখের ভিতরের পর্দায়, জিহ্বায়, দাঁতের মাড়িতে, ক্ষুরের ফাঁকে এমনকি ওলানে ফোস্কা পড়ে। মুখে ঘায়ের কারণে ছাগল খেতে পারে না, ফলে দুর্বল হয়ে পড়ে। ক্ষুরে ঘা হওয়ায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাটে। আক্রান্ত ক্ষতে মাছি ডিম পাড়লে পোকা হতে পারে। বাচ্চা ছাগলে এ রোগ হলে হার্ট আক্রান্ত হয়ে মারা যায়।

এ রোগের লক্ষণ দেখা দিলে একজন অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী আক্রান্ত ছাগলকে পৃথক করে লাক্ষণিক চিকিৎসা প্রদান করতে হবে। কুসুম গরম পানিতে ফিটকিরি বা পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট গুলে মুখের ও পায়ের ঘা ভালভাবে পরিষ্কার করতে হবে। ছাগলের ঘর ২% আয়োডিন বা অন্যান্য জীবাণুনাশক দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে। রোগাক্রান্ত ছাগলের মল মূত্র, বিছানা ও ব্যবহৃত উচ্ছিষ্ট খাদ্যদ্রব্য মাটিতে পুঁতে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। মৃত ছাগলকে গর্ত করে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। কোন অবস্থাতেই মৃত ছাগলের চামড়া ছাড়ানো যাবে না এবং পথে ঘাটে ফেলা যাবে না। অসুস্থ ছাগলকে স্থানান্তর করা যাবে না এবং বাজারে বিক্রি করা যাবে না।

ছাগলের একথাইমা রোগ

একথাইমা/ঠোঁটের ক্ষত রোগঃ

কন্টাজিয়াস একথাইমা হচ্ছে ছাগলের একটি ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ। এ রোগে আক্রান্ত ছাগলের নাক ও মুখের চারদিকে ফুসকুড়ি হয়। ঠোঁট ও মাড়িতে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। ক্ষতের উপর শক্ত চামড়ার আবরণ থাকে যা সরিয়ে দিলে লাল ক্ষত দেখা যায়। ক্ষতের জন্য ঠোঁট ফুলে যায়। অনেক সময় চোখ, ওলান, অন্ডকোষ ও পায়ের খুরের উপরের চামড়ায় ফুসকুড়ি ছড়িয়ে পড়ে। ফোস্কা ফেটে তরল আঠাল পদার্থ ঝরতে থাকে এবং প্রদাহ হয়। অনেক সময় এই ক্ষত অন্যান্য ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংক্রমিত হয়ে রোগ জটিল আকার ধারণ করে। একজন অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী কন্টাজিয়াস একথাইমা আক্রান্ত ছাগলকে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে। আক্রান্ত ক্ষত ফিটকিরি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। আক্রান্ত স্থানে গ্লিসারিন বা ক্রিস্টাল ভায়োলেট ব্যবহার করা যেতে পারে। এ রোগ প্রতিরোধের জন্য ছাগল ছানার ১-২ দিন বয়সে ১ম ডোজ, ১০-১৪ দিন বয়সে ২য় ডোজ এবং ৩ মাস পর ৩য় ডোজ প্রতিষেধক টিকা প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

গোটপক্সঃ

গোট পক্স ছাগলের একটি অন্যতম মারাত্মক ভাইরাসজনিত ছোঁয়াচে সংক্রামক রোগ। এ রোগে আক্রান্ত ছাগলের জ্বর হয়। চোখ ও নাক দিয়ে পানি পড়ে, মুখ দিয়ে লালা ঝরে। আক্রান্ত ছাগলের সারা শরীরে ফোস্কা পড়ে। সাধারণত মুখের চারপাশে, নাকে, মাথায়, মুখের ভিতরে দাঁতের মাড়িতে, কানে, গলায়, ওলানে ও বাঁটে পশম কম এমন জায়গায় বসন্তের গুটি বা ফোস্কা দেখা যায়। বসন্ত রোগ দেখা দিলে একজন অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী বসন্ত আক্রান্ত ছাগলকে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে। আক্রান্ত স্থানে এন্টিবায়োটিক পাউডার বা কর্টিসোন ক্রিম লাগানো যেতে পারে। রোগের লক্ষণ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে অসুস্থ ছাগলকে পাল থেকে আলাদা করে ফেলতে হবে। সুস্থ ছাগলকে গোট পক্স টিকা প্রদান করতে হবে।

গোটপক্স

ভেড়া পালন

ভেড়া পালনের গুরুত্বঃ

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই ভেড়া পালন জনপ্রিয়। মাংস, উল ও দুধ উৎপাদনের জন্য ভেড়া পালন হয়ে থাকে। বড় বড় বাণিজ্যিক খামারের মাধ্যমে ভেড়া পালন সম্ভব। তাছাড়া পারিবারিক পর্যায়েও ভেড়া পালন সম্ভব। ভেড়ার মাংস অত্যন্ত জনপ্রিয় ও সুস্বাদু।

ভেড়া পালনের বিশেষ দিকঃ

ভেড়া শান্ত ও ছোট প্রাণী। ফলে এদের খাদ্য ও বাসস্থান জনিত বিনিয়োগ এবং ঝুঁকি কম। ভেড়া মাংস, পশম, চামড়া ও গোবর সার উৎপাদন করে। ভেড়া গরু-ছাগলের সাথে মিশ্রভাবে পালন করা যায়। একটি ভেড়া সাধারণত বছরে দুবার বাচ্চা দেয়। প্রতিবার গড়ে ২ টি করে বাচ্চা দেয়। পালনের জন্য ৭-১২ মাস বয়সী সুস্থ ভেড়া নির্বাচন করা উচিত। শারীরিক গঠনের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে ২ ধরনের ভেড়া দেখা যায়। যথাঃ একটি জাতের কান খুব ছোট ও লেজ খাটো। অন্যটির কান মোটামুটি বড় ও লেজ মধ্যম আকৃতির। ভেড়ার মাংসে বিভিন্ন রকমের খনিজ লবণ জিংক রয়েছে। ৪ আউন্স (১১৪ গ্রাম) ভেড়ার মাংস গ্রহণ করলে খনিজ লবণের প্রতিদিনের চাহিদার ৩৩% পূরণ হয়ে থাকে। জিংক শরীরের ক্ষত নিরাময় এবং টেস্টোস্টেরন এর মাত্রা স্বাভাবিক রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ভেড়ার মাংস আয়রন ও কপারের একটি উৎকৃষ্ট উৎস। ৪ আউন্স (১১৪ গ্রাম) ভেড়ার মাংস গ্রহণ করলে আয়রনে প্রতিদিনের চাহিদার ১২% এবং কপারের ৭% পূরণ হয়ে থাকে। লোহিত রক্ত কণিকা উৎপাদনে আয়রন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কপার শরীরে আয়রন শোষণে এবং লোহিত রক্তকণিকা বিশ্লেষণে সাহায্য করে। ভেড়ার মাংস গ্রহণ করলে রক্তে সুগারের মাত্রা স্বাভাবিক থাকে। ভেড়ার মাংসে কার্বোহাইড্রেটের উপস্থিতি থাকে না এবং এর ফলে গ্লাইসেমিক সূচকে মাত্রা খুব কম থাকে। ভেড়ার মাংস প্রোটিনের একটি উৎকৃষ্ট উৎস। ৪ আউন্স (১১৪ গ্রাম) ভেড়ার মাংস গ্রহণ করলে ২৭.৫ গ্রাম প্রোটিন রয়েছে যা আমাদের প্রতিদিনের চাহিদার ৫৫% পূরণ হয়ে থাকে। ভেড়ার মাংস ওমেগা-৩ ফ্যাটি এর একটি উৎকৃষ্ট উৎস। ওমেগা-৩ এবং ওমেগা-৬ এ উল্লিখিত যা পরিবর্তিত হয় তা কার্ডিও ভাস্কুলার ডিজিজ এর ঝুঁকি কমায়। ভেড়ার মাংসে উৎকৃষ্ট পরিমাণে ভিটামিন বি-১২ এবং নিয়াসিন রয়েছে।

ভেড়ার জাত পরিচিতি

সারা বিশ্বে প্রায় ৯০০ জাতের ভেড়া পাওয়া যায়। দুধ, মাংস ও উল উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে ভেড়াকে তিনটি জাতে ভাগ করা যায়। যথাঃ ১। মাংস ও অধিক বাচ্চা উৎপাদনকারী ভেড়ার জাতঃ ২। উল ও মাংস উৎপাদনকারী ভেড়ার জাতঃ ৩। দুধ উৎপাদনকারী ভেড়ার জাত। অধিক মাংস উৎপাদনকারী ভেড়ার জাতসমূহ সাধারণত শীত প্রধান দেশে দেখা

যায়। তবে কিছু মাংস উৎপাদনশীল ভেড়ার জাত মরু অঞ্চলেও দেখা যায়। সাফোক, ডরসেট, হ্যাম্পশায়ার ইত্যাদি অধিক মাংস উৎপাদনকারী ভেড়ার জাত। প্রাপ্ত বয়স্ক এ সকল ভেড়া ৯০-১৩৫ কেজি পর্যন্ত হতে পারে। মেরিনো, চিভিয়ট, ব্লু-ডু মেইন, লিংকন জাতের ভেড়া অধিক উল ও মাংস উৎপাদনকারী ভেড়ার জাত। এরা প্রতি বছরে ২-৬ কেজি পর্যন্ত উল উৎপাদন করতে পারে। আওয়াসী, ইস্ট ফ্রিজিয়ান ভেড়া দুধ উৎপাদনকারী ভেড়ার জাত। এরা বছরের ২১০ দিনে ৩৫০-৭০০ লিটার পর্যন্ত দুধ উৎপাদনে সক্ষম।

বাংলাদেশে দেশী ভেড়া সমৃদ্ধ জাত হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি না পেলেও এদের বিশেষ উপযোগিতা রয়েছে। অঞ্চল ভেদে বাংলাদেশে মোট তিন ধরনের ভেড়া পাওয়া যায়।

চিত্রঃ সাফোক জাতের ভেড়া

চিত্রঃ ডরসেট জাতের ভেড়া

চিত্রঃ হ্যাম্পশায়ার জাতের ভেড়া

চিত্রঃ মেরিনো জাতের ভেড়া

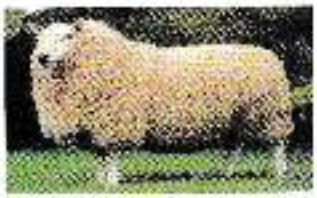

চিত্রঃ চিভিয়ট জাতের ভেড়া

চিত্রঃ লিংকন জাতের ভেড়া

দেশী জাতের ভেড়া

গাড়ল

বরেন্দ্র অঞ্চলের ভেড়াঃ রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নাটোর এলাকায় এধরনের ভেড়া পাওয়া যায়। এদের কান ছোট, লেজ সরু ও ছোট, পেট ও পায়ে উল নেই, ভেড়া শিং যুক্ত কিন্তু ভেড়ী শিং বিহীন। প্রাপ্ত বয়স্ক ভেড়া ২২-৩০ কেজি এবং ভেড়ী ১৫-২৫ কেজি ওজন বিশিষ্ট হতে দেখা যায়। এরা অত্যন্ত প্রজননক্ষম, সাধারনত ৫-৬ মাস বয়সেই প্রজননক্ষম হয়। বছরে ২ বার বাচ্চা প্রদান করে এবং প্রতিবারই ১-৩ টি পর্যন্ত বাচ্চা উৎপাদন করতে পারে।

যমুনা অববাহিকার ভেড়াঃ টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ, জামালপুর, বগুড়া, গাইবান্ধা সহ যমুনা অববাহিকায় এধরনের ভেড়া পাওয়া যায়। এদের কান ছোট, লেজ তুলনামূলকভাবে একটু লম্বাটে, পেট ও পায়ে উল নেই, ভেড়া প্যাঁচানো শিং যুক্ত কিন্তু ভেড়ী শিং বিহীন। প্রাপ্ত বয়স্ক ভেড়ার ১৮-২৫ কেজি এবং ভেড়ী ১৫-২২ কেজি ওজন বিশিষ্ট হতে দেখা যায়। এরা অত্যন্ত প্রজননক্ষম, সাধারনত ৫-৬ মাস বয়সেই প্রজননক্ষম হয়। বছরে ২ বার বাচ্চা প্রদান করে এবং প্রতিবারই ২-৩ টি পর্যন্ত বাচ্চা উৎপাদন করতে পারে। উপকূলীয় অঞ্চলের ভেড়া বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের চরাঞ্চলে যেমন নোয়াখালী, পটুয়াখালী, ভোলা, হাতিয়া, লক্ষীপুর ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে এ ধরনের ভেড়া পাওয়া যায়। এরা লবণ ও স্যাঁত-স্যাঁতে আবহাওয়াতে সহে অভ্যস্ত। এদের শিং পিছনে বাঁকানো কিন্তু প্যাঁচানো নয়।

[illegible] চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর ও সুন্দরবন এলাকার পার্শ্ববর্তী এলাকায় গাড়ল নামে একধরনের দেশীয় ভেড়া পাওয়া যায়। এদের লেজ তুলনামূলকভাবে লম্বা এবং তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী।

বাংলাদেশে ভেড়া পালন পদ্ধতিঃ

বাংলাদেশের জলবায়ু মূলত উষ্ণ-আর্দ্র জলবায়ু উন্নত পশম উৎপাদন ও অধিক মাংস উৎপাদনশীল জাতের ভেড়া পালন উপযোগী নয়। এ কারণে এদেশের আবহাওয়াতে সহনশীল দেশীয় ভেড়ার খামার গড়ে উঠেছে। ভেড়া সহজেই বিভিন্ন আবহাওয়ায় সহনশীল হওয়ায় এবং এদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অধিক হওয়ায় সম্ভাবনাময় ভেড়া পালন এদেশের কিছু অঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করেছে। ভেড়া পালন পদ্ধতি বাংলাদেশের অঞ্চল ভেদে বা সামগ্রিক ভাবে ভিন্নতর। এসকল পালন/উৎপাদন পদ্ধতি কয়েক ভাবে ভাগ করা যায়। যথাঃ

১। আধা নিবিড় সাবসিস্টেন্স খামারঃ এ পদ্ধতি সারাদেশেই দেখা যায়। খামারিগণ এককভাবে বা গরু-ছাগলের সাথে মিশ্রভাবে ২-৬ টি ভেড়া পালন করে। ভেড়া রাতের বেলা গরু-ছাগলের ঘরে অবস্থান করে এবং দিনের বেলা মাঠে, বাগানে রাস্তার ধারে চরে বা খেড়িবাঁধে পালন করা হয়। সকালে বা সন্ধ্যায় ভাতের মাড় এবং ভুষি সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এসকল খামারে ইনব্রিডিং সমস্যা বেশী

২। সম্পূর্ণ ছেড়ে পালা ক্ষুদ্র বাণিজ্যিক খামারঃ এ পদ্ধতি অনেকটা আধানিবিড় সাবসিস্টেন্স পদ্ধতির মত। এক্ষেত্রে ১৫-৪০ টি ভেড়া বাণিজ্যিকভাবে পালন করা হয়। খামারিগণ দিনের বেলা ভেড়ার পাল নিয়ে মাঠে, বাগানে, রাস্তার ধারে চরায়। এ পদ্ধতিতে পালনকৃত ভেড়াতে সংকর জাতের (ভারতের ছোট নাগপুরি X দেশিয় ভেড়া) ভেড়াও দেখা যায়। সকালে বা সন্ধ্যায় ভাতের মাড় এবং ভুষি সরবরাহ করা হয়ে থাকে। বছরে ১-২ বার পশম সংগ্রহ করা হয়। খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও রোগ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করা গেলে এ পদ্ধতিতে ভেড়া উৎপাদন অধিক লাভজনক হতে পারে।

৩। বরেন্দ্র এলাকার আধা নিবিড় বাণিজ্যিক খামারঃ এধরণের খামার সাধারণত অপেক্ষাকৃত সচ্ছল খামারিগণ দ্বারা পরিচালিত হয়। এ সকল খামারে সাধারণত ৫০-১৫০ ভেড়া প্রতিপালন করা হয়। এক্ষেত্রে ১-২ জন রাখাল ভেড়ার খাদ্য ব্যবস্থাপনা, ভেড়াকে চরানো ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত থাকে। আমন ও রবিশস্য কাটার পর ভেড়া মাঠে চড়ে বেড়ায় এবং ঝরা ধান, ছোলা, খেসারী ও নতুন গজানো ঘাস খায়। কাঁকড়ে অথবা জমিতে পানি হতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সবুজ ঘাস খায়। এছাড়া বাগানে, ঝোপে, রাস্তার ধারেও ভেড়া চড়ানো হয়। এ পদ্ধতিতে পালিত ভেড়াকে খড় ও দানাদার খাদ্য প্রদান করা হয়। বছরে ৩-৪ বার পশম সংগ্রহ করা হয় যা স্থানীয় শিল্পীদের কম্বল তৈরীতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে

৪। চরে সম্পূর্ণ ছেড়ে ভেড়া পালনঃ এ ধরনের ভেড়া উৎপাদন পদ্ধতিতে লবণাক্ত স্যাঁত-স্যাঁতে চরে ভেড়া সম্পূর্ণ ছেড়ে পালন করা হয়। ভেড়া পালনের জন্য ভেড়ার সংখ্যা ভেদে ২-৫ জন রাখাল থাকে। ভেড়া সারাদিন কর্দমাক্ত ও লবণাক্ত মাঠে চড়ে বেড়ায়, ঘাস খায়, ম্যানগ্রোভ অঞ্চলের লতা-পাতা খায়। জোয়ার এবং রাতের বেলায় কেল্লায় অবস্থান করে। বছরের নির্দিষ্ট সময়ে (ঈদ/পূজা) ভেড়া বিক্রি করে থাকে। এ পালন পদ্ধতিতে কোন প্রকার দানাদার খাদ্য সরবরাহ করা হয় না। যদিও এদের উৎপাদনশীলতা কম কিন্তু এই ধরণের পালন পদ্ধতি লাভজনক

৫। সমন্বিত খামারঃ এ পদ্ধতিতে গরু-ছাগল এর সাথে মিশ্রভাবে ভেড়া পালন করা হয়।

৬। নিবিড় ভেড়া পালন ব্যবস্থাঃ এ পদ্ধতিতে ভেড়া সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় পালন করা হয়। ভেড়াকে প্রয়োজনীয় দানাদার খাদ্য, ঘাস ও পানি সরবরাহ করা হয়। ছোট খামারের ক্ষেত্রে মাঠ থেকে ঘাস কেটে সংগ্রহ করা হয় কিন্তু বড় খামারের ক্ষেত্রে ঘাস চাষের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ পদ্ধতি লাভজনক ও সম্ভাবনাময়। বর্তমানে দেশে এ পদ্ধতির প্রচলন শুরু হয়েছে যা বাস্তবায়ন করা গেলে ভেড়া পালনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন, দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি সম্ভব।

গর্ভবতী ভেড়ার যত্নঃ

- গর্ভাবস্থার প্রথম পর্যায়ে ভেড়ীকে অন্য কোন ভেড়ার কাছে নেয়া যাবে না এবং কৃমিনাশক প্রদান করা যাবে না
- গর্ভাবস্থার শেষ পর্যায়ে নরম বিছানা দিতে হবে
- গর্ভবতী ভেড়ীকে আলাদা রেখে পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে গমের ভুষি, কাঁচা ঘাস, তিলের খৈল, ভিটামিন, ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান করতে হবে

বাচ্চা ভেড়ার যত্নঃ

- বাচ্চা প্রসবের সময়ে গর্ভবতী ভেড়ীকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আলো-বাতাস সম্পন্ন করে এমন শুকনো পরিবেশে রাখতে হবে
- বাচ্চার জন্মের পর মা ভেড়ী যাতে বাচ্চার শরীর চেটে পরিষ্কার করতে পারে সেদিকে নজর দিতে হবে, কেননা, এতে বাচ্চার শ্বাস প্রশ্বাস শুরুর ক্ষেত্রে সহায়ক হয়
- পরিষ্কার সুতি কাপড় ব্যবহার করে বাচ্চার নাক ও মুখ পরিষ্কার করতে হবে, বাচ্চা যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে শাল দুধ পান করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে

ভেড়ার বাসস্থান ঃ

- ভেড়ার সংখ্যার উপর ভিত্তি করে ঘর তৈরী করতে হবে সাধারণত প্রতিটি ভেড়ার জন্য সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় ১০ বর্গ ফুট এবং ছাড়া অবস্থায় পালনের ক্ষেত্রে ৬-৭ বর্গফুট জায়গার প্রয়োজন হয়। তাছাড়া ভেড়ার বয়স, আকার ও উদ্দেশ্য এর ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় জায়গার পরিবর্তন করতে হয়, যেমন, সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় ভেড়া পালন করতে হলে তাকে এক্সারসাইজের জন্য অতিরিক্ত জায়গা প্রদান করতে হবে

- ভেড়া পালনের জন্য একটি আদর্শ ঘরের মাপ হলো: ৫-৭ ফিট
- ঘরটির মেঝে মাটি থেকে কমপক্ষে ১.৫ ফুট উচ্চতায় স্থাপন করতে হবে
- ঘরের মেঝে (৬ ফুট X ৫ ফুট) ৩০ বর্গফুট,
- চালা (৬.২৫ফুট X ৫.৫০ ফুট) ৩৫ বর্গফুট হবে
- ঘরের সামনের দেয়াল (৬ ফুট লম্বা X ৫ ফুট উচ্চতা), পিছনের দেয়াল
- (৬ ফুট লম্বা X ৪ ফুট উচ্চতা), বাকি ২ দিকের দেয়াল (৫ ফুট লম্বা X ৪.৫ ফুট উচ্চতা) মাপের হবে:

তবে মুক্তভাবে (সম্পূর্ণ ছাড়া অবস্থায়) পালনের ক্ষেত্রে ভেড়া প্রতি জায়গা আরো কম হলেও চলে। কেননা এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র রাতে ভেড়া ঘরে অবস্থান করে। আমাদের দেশে এ ধরনের খামারের সংখ্যা বেশী। এসকল ভেড়া সারাদিন উন্মুক্ত স্থানে বিচরণ করে, সবুজ ঘাস, পাতা, গুল্ম খায় এবং রাতে খামারির বাড়িতে নির্ধারিত স্থানে অবস্থান করে। যাদের চারণযোগ্য জমির অভাব রয়েছে তারা সাধারণত এ ধরনের পারিবারিক ভেড়ার খামার স্থাপন করে থাকে।

ভেড়ার খাদ্যাভাস ও খাদ্য উপাদন ব্যবস্থাপনা

ভেড়ার খাদ্যাভাসঃ ভেড়া গরু-ছাগলের মতই মাঠে চরে লতাপাতা, ঘাস, গুল্ম, হে, খড়, সাইলেজ, দানাদার খাদ্য ইত্যাদি খেতে পছন্দ করে। এরা সহজেই নতুন খাদ্যে অভ্যস্ত হয় এমনকি প্রতিকূল পরিবেশে শুধুমাত্র খড় ও নাড়া খেয়েও ভালোভাবে বেঁচে থাকে।

খাদ্য উপাদানঃ ভেড়ার মূল খাদ্য উপাদান হলো সবুজ ঘাস। তাছাড়া এরা সবুজ ঘাস এর পাশাপাশি দানাদার খাদ্যও গ্রহণ করে থাকে।

দানাদার খাদ্যঃ ভেড়াকে সাধারণত সবুজ ঘাসের পাশাপাশি খাদ্য হিসেবে গমের ভূষি, চালের কুড়া, মাসকলাই, খেসারী, মটর ইত্যাদির ভুষি এবং বিভিন্ন ধরনের খৈল, ফিসমিল বা মাছের গুড়া, খনিজ লবণ, ক্যালসিয়াম ইত্যাদির মিশ্রণ দানাদার খাদ্য হিসেবে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। দানাদার খাদ্য মিশ্রণের তালিকা টেবিলে দেয়া হলো।

খাদ্য উপাদান	বাচ্চা ভেড়া (৩-৬ মাস)	বাড়ন্ত ভেড়া (৭-১৫মাস)	বয়স্ক ভেড়া (১৫ মাস+)
চাল/গম/ভুট্টা ভাঙ্গা	৩০	১৫	১০
ডালের গুড়া	৫	-	-
গমের ভুষি/চালের কুড়া	২৯	৪০	৫০
মাসকলাই/খেসারী ডালের ভুষি	৫	১৫	১৫
খৈল (তিল/সয়াবিন/সরিষা)	২৫	২৫	২০

শুটকি মাছের গুড়া/প্রোটিন কনসেনট্রেট	২.৫	১	১
ডাই ক্যালসিয়াম ফসফেট/ ঝিনুকের গুড়া	২	২	২
খনিজ লবণ	১	১.৫	১.৫
ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫	০.৫	০.৫
সর্বমোট	১০০	১০০	১০০

ভেড়ার খাদ্য হিসেবে ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র খড়ের সাথে পরিমাণমত ইউরিয়া ও মোলাসেস মিশ্রিত করে ভেড়াকে খড়ের পরিবর্তে ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র খাওয়ানো যেতে পারে। ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত উপাদান সমূহ টেবিলে উপস্থাপন করা হলো।

মোট খড়ের পরিমাণ	পানি	ইউরিয়ার পরিমাণ	মোলাসেসের পরিমাণ
৫ কেজি	২.৫-৩.৫ লিটার	১৫০ গ্রাম	১.০৫-১.২০ কেজি

প্রথমে খড়কে ১.৫-৩.০ ইঞ্চি আকারে কেটে নিতে হবে। তারপর খড়, ইউরিয়া, পানি ও মোলাসেস পরিমাণমত আলাদা আলাদা ভাবে মেপে নিতে হবে। এবার পানিতে প্রথমে ইউরিয়া মেশাতে হবে। তারপর ঐ মিশ্রণে মোলাসেস ভাল ভাবে মিশাতে হবে। এবার নির্দিষ্ট পরিমাণ খড় পলিথিনের উপর বিছাতে হবে এবং ইউরিয়া-মোলাসেস পানির মিশ্রণ খড়ের উপর ছিটিয়ে দিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন খড়ের উপর ইউরিয়া মোলাসেস-পানির মিশ্রণ সমভাবে ছিটানো হয় এবং খড় ভালোভাবে উলটপালট করে মিশানো হয়।

মিল্ক রিপ্লেসার/বিকল্প দুধের উপাদানঃ মা ভেড়া হতে একাধিক বাচ্চা জন্মালে বা মা ভেড়া হতে দুধ উৎপাদন কম হলে বাচ্চা ভেড়াকে বিকল্প দুধ সরবরাহ করতে হয়। তাছাড়া বিকল্প দুধ বাচ্চা ভেড়াকে সম্পূরক খাদ্য হিসাবেও সরবরাহ করা যেতে পারে। বিকল্প দুধের উপাদান সমূহ টেবিলে উপস্থাপন করা হলো।

উপাদান	পরিমাণ %
গুড়া দুধ	৭০
চাল/গম/ভুট্টা ভাঙ্গা	২০
সয়াবিন তেল	৭
খনিজ লবণ	১.৫
ডাই ক্যালসিয়াম ফসফেট/ঝিনুকের গুড়া	১.৫
ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫
সর্বমোট	১০০

উক্ত মিশ্রণের ১ ভাগের সাথে ৯ ভাগ পানি মিশাতে হবে। পানিকে অন্তত ৫ মিনিট ফুটিয়ে পুনরায় কুসুম গরম অবস্থায় মিশ্রণ করে বিকল্প দুধ তৈরী করতে হবে। বাচ্চা জন্মের পর থেকে প্রতিদিন ৩০০ গ্রাম করে দুধ বাচ্চাকে খাওয়াতে হবে।

বাচ্চা ভেড়ার খাদ্য ব্যবস্থাপনাঃ

গর্ভাবস্থা হতেই বাচ্চার পুষ্টি ব্যবস্থাপনা শুরু হয়। ভেড়ার গর্ভধারণকাল ১৪৫-১৫৮ দিন। গর্ভের শেষ ২ মাস মা ভেড়াকে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করতে হয়। এতে বাচ্চা সবল ও পুষ্ট হয় এবং জন্মের পর পর্যাপ্ত দুধ পায়। জন্মের সাথে সাথে বাচ্চার মুখ ও নাক শুকনো পরিষ্কার সুতি কাপড় দিয়ে মুছে নিতে হবে এবং যত দ্রুত সম্ভব মায়ের শাল দুধ খাওয়াতে হবে। শাল দুধ জন্মের আধা ঘন্টার মধ্যে খাওয়ানো গেলে ইহা অধিক কার্যকর হয়। শাল দুধ বাচ্চার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টি দিয়ে থাকে। একাধিক বাচ্চা জন্মালে সকল বাচ্চাই যেন শাল দুধ পায় তা লক্ষ্য রাখতে হবে। বয়স ভেদে বাচ্চার প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ টেবিলে উপস্থাপন করা হলো।

বয়স (সপ্তাহ)	ওজন (কেজি)	দৈনিক খাদ্য সরবরাহ (গ্রাম)			
		মায়ের দুধ (সোকালিং/মিল্ক দুধ)	দানাদার খাদ্য	কচি ঘাস/লতা পাতা	ইউএমএস বা প্রক্রিয়াজাত ঘাস
০	১.৫	২৮০	-	-	-
১	২.০	৩৫০	-	-	-
২	২.৪	৪১০	১০	সামান্য পরিমাণ	-
৩	২.৭	৪৬০	১০	সামান্য পরিমাণ	-
৪	৩.১	৫০০	১৫	সামান্য পরিমাণ	-
৫	৩.৬	৫৫০	২০	১০০	-
৬	৪.০	৬০০	২৫	১৫০	সামান্য পরিমাণ
৭	৪.৪	৬০০	৩০	১৫০	সামান্য পরিমাণ
৮	৪.৭	৬০০	৩০	১৫০	২০
৯	৫.০	৫৫০	৪০	১৭৫	৩০
১০	৫.৪	৫০০	৫০	২০০	৩০
১১	৫.৭	৪৫০	৭৫	২২৫	৩০
১২	৬.১	২০০	৯০	৩০০	৪০
১৩	৬.৫	১০০	১৫০	৩৫০	৫০
১৪	৬.৯	১০০	২০০	৪০০	৭০
১৫	৭.৩	-	২০০	৪৫০	৭০
১৬	৭.৭	-	২০০	৫০০	১০০

নোটঃ জন্মের পর বাচ্চার দৈনিক ৩০০ এমএল শাল দুধ প্রয়োজন,
প্রতিটি বাচ্চাকে ৪ সপ্তাহ বয়সে ৫০০ এমএল করে দুধ খাওয়াতে হবে,
বাচ্চার দুধ নির্ভরশীলতা কমাতে ২ সপ্তাহ থেকে সামান্য পরিমাণে কচি ঘাস ও দানাদার খাদ্য খাওয়ানোর অভ্যাস করাতে হবে

বাড়ন্ত ভেড়ার খাদ্য ব্যবস্থাপনাঃ

বাড়ন্ত ভেড়া বলতে ৪-১৫ মাস বয়সী ভেড়াকে বুঝানো হয়। ভেড়া এ সময়ে পুষ্টি সরবরাহ কম পায়। কেননা, এ সময়ে মা ভেড়া হতে দুধ পায় না এবং নিজস্ব খাদ্য গ্রহণের হারও কম থাকে। ভেড়া পালন পালনে এ সময়টা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এসময়েই ভেড়ার মূল শারীরিক গঠন হয়ে থাকে। এ সময়কালে পর্যাপ্ত পুষ্টি না পেলে ভেড়ার প্রকৃত বৃদ্ধি বাধাগ্রস্থ হয়, উৎপাদনশীলতা কমে এমনকি মৃত্যু ঝুকি বেড়ে যেতে পারে। ফলে ভেড়া পালনের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হতে পারে যা খামারের আয় বাধাগ্রস্থ করতে পারে। তাছাড়া বাড়ন্ত স্ত্রী ভেড়া ৭-৮ মাসের মধ্যেই প্রজননক্ষম হয়ে যায় যা সঠিক পুষ্টি সরবরাহ না পেলে বাধাগ্রস্থ হতে পারে। সুতরাং বাড়ন্ত ভেড়াকে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য সরবরাহ করাতে হবে। বাড়ন্ত ভেড়ার খাদ্যের তালিকা টেবিলে উপস্থাপন করা হলো।

বয়স (মাস)		ওজন (কেজি)	দৈনিক খাদ্য সরবরাহ (গ্রাম)			
			পানি (মি.লি.)	দানাদার খাদ্য	কচি ঘাস/লতা-পাতা	ইউএমএস বা প্রক্রিয়াজাত ঘাস
৪		৮.০	৫০০	২৫০	৪০০	১০০
৫		৯.৩	৫০০	৩০০	৫০০	১০০
৬		১১.৫	৫০০	৩০০	৫৫০	১০০
৭		১৩.২	৫০০	৩০০	৬২০	১০০
৮	[illegible]	১৫	৬০০	৩০০	৭৫০	১০০
৯		১৬.৮	৬০০	৩০০	৮০০	১০০

১০		১৮.৬	৬০০	৩৫০	৮০০	১০০
১১		২০.৪	৭০০	৪০০	৮০০	১০০
১২		২২.২	৮০০	৪৫০	৮০০	১০০
	১৩	২২.২	৮০০	৪৫০	৮০০	১০০
১৪	[illegible]	২৩.০	৮০০	৪৫০	৮০০	১০০
১৫		২৪.০	৮০০	৪৫০	৮০০	১০০

বাড়ন্ত খাসী ভেড়ার খাদ্য ব্যবস্থাপনাঃ

সাধারণত ৩ মাস বয়স পূর্তিতে ভেড়ার বাচ্চাকে মায়ের দুধ ছাড়ানো হয়। খাসী ভেড়ার খাদ্য ব্যবস্থাপনা শুরু হয় ৪র্থ মাস হতে। খোজাকৃত খাসী ভেড়াকে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য সরবরাহ করা গেলে দৈনিক ৬০ গ্রাম করে ওজন বৃদ্ধি হয়। ফলে ১ বছর বয়স পূর্তিতে গড় ওজন প্রায় ১৮-২০ কেজিতে উন্নীত হয় যা বাজারজাত করণের জন্য উপযুক্ত হয়ে যায়। বাড়ন্ত ভেড়ার খাদ্য তালিকায় (টেবিল--) উপস্থাপিত খাদ্য মিশ্রণ নিম্নের টেবিলে উল্লিখিত পরিমাণে সরবরাহ করলে কাঙ্খিত ফলাফল পাওয়া যায়।

বয়স (মাস)	ওজন (কেজি)	দৈনিক খাদ্য সরবরাহ			
		দানাদার খাদ্য (গ্রাম)	কাঁচা ঘাস/লতা-পাতা (কেজি)	ইউএমএস বা প্রক্রিয়াজাত ঘাস (গ্রাম)	ভাতের মাড় (গ্রাম)
৩	৬.০	১০০	০.৪	-	৪০০
৪	৭.৮	২০০	০.৪৫	২০	৪০০
৫	৯.৬	২০০	০.৫	৫০	৪০০
৬	১১.৫	২৫০	০.৬	৫০	৪০০
৭	১৩.২	২৫০	০.৮	১০০	৪০০
৮	১৫	৩০০	১.০	১৫০	৪০০
৯	১৬.৮	৩০০	১.০	২০০	৪০০
১০	১৮.৬	৩০০	১.২	২০০	৪০০
১১	২০.৪	৩০০	১.৩	২০০	৪০০
১২	২২.২	৩০০	১.৩	২০০	৪০০
১৩	২৪.০	৩০০	১.৫	২০০	৪০০
১৪	২৫.৮	৩০০	১.৬	২০০	৪০০
১৫	২৬.৫	৩০০	১.৮	২৫০	৪০০

প্রজনন যোগ্য ভেড়া পাঠার খাদ্য ব্যবস্থাপনাঃ

প্রজনন যোগ্য পাঠার খাদ্য ব্যবস্থাপনা একটি খামারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেননা পাঠা ভাল হলে প্রজননক্ষম ভেড়া হতে ভালো বাচ্চা উৎপাদন সম্ভব। তাছাড়া সঠিক পাঠা নির্বাচন করা গেলে ভেড়ার জিনগত উন্নয়ন সম্ভব। প্রজনন কার্যক্রমে ব্যবহার হবে এমন পাঠাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে কাঁচা ঘাস খাওয়াতে হবে। তাছাড়া দৈনিক ৩৫০-৫০০ গ্রাম প্রোটিন সমৃদ্ধ দানাদার (টোনিক) খাদ্য প্রদান করতে হবে। গাঁজানো ছোলা খাওয়ানো হলে পাঠার প্রজনন ক্ষমতার উন্নয়ন ঘটে। এক্ষেত্রে পাঠাকে দৈনিক ১০ গ্রাম গাঁজানো ছোলা খাওয়ানো যাবে। অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত খাবার দেয়া যাবে না। তাছাড়া বছরে ২বার ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শক্রমে কৃমিনাশক ও ভিটামিন প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে ভিটামিন এ,ডি,ই, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রজননক্ষম/গর্ভবতী ভেড়ীর খাদ্য ব্যবস্থাপনাঃ

আমাদের দেশের ভেড়া সাধারণত বছরে দুইবার বাচ্চা প্রদান করে থাকে। স্ত্রী ভেড়া ৬-৭ মাস বয়সেই প্রজননক্ষম হয়ে উঠে। ভেড়ার গর্ভকাল ১৪৫-১৫০ দিন। প্রথম বাচ্চা প্রদানের ১ মাস পরই পুনরায় ভেড়া গরম হয় অর্থাৎ আবার গর্ভধারণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। গর্ভধারণের প্রথম ১২ সপ্তাহ সাধারণত তুলনামূলক কম পুষ্টির প্রয়োজন হয় কিন্তু যেহেতু

একই সময়ে পুনঃ গর্ভধারণ হয় এবং দুধ উৎপাদন করতে হয় তাই পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করতে হয়। তাছাড়া গর্ভাবস্থার শেষ ৮ সপ্তাহ গর্ভস্থ বাচ্চা অতিদ্রুত বৃদ্ধি ঘটে। ফলে ভেড়ার অধিক খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। গর্ভবতী ভেড়ীর প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ ছকে (টেবিল) প্রদান হয়েছে।

মুক্তভাবে ছেড়ে পালা ভেড়ার খাদ্য ব্যবস্থাপনাঃ

- দিনের বেশিরভাগ সময়ের জন্য মাঠে, বাগানে চড়াতে হবে
- সম্পূরক খাবার হিসেবে ভুষি, দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে
- ঘাসের অভাব দেখা দিলে কাঁঠাল পাতা, বাবলা পাতা, ইপিল-ইপিল সহ অন্যান্য ঘাস সরবরাহ করতে হবে
- ছাগী বাচ্চার দুধ নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য বাচ্চাকে কচি নরম ঘাস সরবরাহ ও অভ্যস্ত করতে হবে
- দুগ্ধবতী ভেড়াকে ওজন ভেদে ১৫০-৩০০ গ্রাম দানাদার খাদ্য খাওয়াতে হবে

ভেড়ার প্রজনন ব্যবস্থাপনা

ভেড়ার খামার লাভজনক ও টেকসই করতে হলে সঠিক পাঠা নির্বাচন, ভেড়ী নির্বাচন, প্রজনন বয়স নির্ধারণ, পালে ভেড়ী ও পাঠার অনুপাত নির্ধারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সঠিক পাঠা ভেড়া নির্বাচনঃ

সঠিক পাঠা নির্বাচন একটি ভেড়ার খামারের মৌলিক বিষয়। কেননা সঠিক ভেড়া পাঠা নির্বাচন করা গেলে খামারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়, প্রতি প্রজননে বাচ্চা উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পায়, উৎপাদিত বাচ্চা সুস্থ ও সবল হয় এবং খামারে বাচ্চা মৃত্যুর হার কম হয়। একটি পাঠা ভেড়া নির্বাচনে যে সকল বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় আনতে হয় তা হলোঃ

- নির্বাচনের সময় পাঠার বয়স ১২-১৪ মাস হতে হবে
- নির্বাচিত পাঠা অধিক উৎপাদনশীল বংশের হতে হবে। অর্থাৎ তার মা, দাদী ও নানীর অধিক উৎপাদনশীলতার ইতিহাস ও উৎপাদিত বাচ্চাতে কম মৃত্যুর হার (৫% এর কম) থাকতে হবে
- নির্বাচিত পাঠা প্রজনন রোগসহ অন্যান্য সকল ধরণের রোগ মুক্ত হতে হবে
- ভেড়ার অন্ডকোষ সুগঠিত হতে হবে
- পিছনের পা সুঠাম ও শক্তিশালী হতে হবে
- পাঠা তুলনামূলকভাবে আকারে বড় ও সোর্য বীর্যশালী হওয়া উচিত

সঠিক ভেড়ী নির্বাচনঃ

বাণিজ্যিক খামারে সঠিক ভেড়ী নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা সঠিক ভেড়ী নির্বাচন করা গেলে খামারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়, প্রজননে বাচ্চা উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পায়, উৎপাদিত বাচ্চা সুস্থ ও সবল হয় এবং খামারে বাচ্চা মৃত্যুর হার কম হয়।

একটি ভেড়ী নির্বাচনে যে সকল বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় আনতে হয় তা হলোঃ

- নির্বাচনের সময় ভেড়ী বয়স ৯-১৩ মাস হতে হবে
- নির্বাচিত ভেড়ী অধিক উৎপাদনশীল বংশের হতে হবে। অর্থাৎ তার মা, দাদী ও নানীর অধিক উৎপাদনশীলতার ইতিহাস ও উৎপাদিত বাচ্চাতে কম মৃত্যুর হার (৫% এর কম) থাকতে হবে। তাছাড়া মা, দাদী ও নানীর বছরে ২ বার বাচ্চা প্রদান ও প্রতিবারে ২ টি বাচ্চা প্রদানের ইতিহাস থাকতে হবে
- নির্বাচিত ভেড়ী প্রজনন রোগসহ অন্যান্য সকল ধরণের রোগ মুক্ত হতে হবে
- ওলান সুগঠিত, অধিক দুধ ধারণক্ষমতা সম্পন্ন, বাঁট সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে
- শরীর অনেকটা ত্রিকোনাকৃতি ও পা সুঠাম ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে
- ভেড়ী তুলনামূলকভাবে আকারে বড় হওয়া উচিত

ভেড়ী গরম হওয়ার লক্ষণ ও পাল দেওয়ার আদর্শ সময়:

- ভেড়ী গরম হলে সোজাভাবে দাড়িয়ে থেকে লেজ বাঁকিয়ে রাখে এবং ঘন ঘন লেজ নাড়ে
- ভেড়ীর যোনীদ্বার লাল ও ফোলা হবে এবং যোনীদ্বার দিয়ে সাদাটে মিউকাস বের হবে
- ভেড়ীর খাওয়া দাওয়া কমে যায়, পাঠার পা ঘেঁষে অবস্থান করে, ডাকাডাকি করে
- আমাদের দেশে ভেড়ার কৃত্রিম প্রজনন ইতোমধ্যেই পরীক্ষামূলকভাবে চালু হয়েছে তবে এখনো পর্যন্ত দেশে প্রাকৃতিক পদ্ধতির প্রজনন কার্যক্রমই অধিক। তবে বাণিজ্যিকভাবে ভেড়া পালন পদ্ধতিতে কৃত্রিম প্রজনন চালু করা জরুরী
- ভেড়ী গরম হওয়ার ১২-২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রজনন করানো জরুরী
- সঠিক সময়ে পাল না দিলে ভেড়ী বার বার গরম হতে পারে। তাছাড়া প্রজনন রোগ থাকলেও ভেড়ী বার বার গরম হতে পারে
- পাঠার ত্রুটিপূর্ণ শুক্রানু ও ভেড়ীর ত্রুটিপূর্ণ ডিম্বানুর কারণে ডিম নিষিক্তকরণ প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হতে পারে
- অপুষ্টিজনিত কারণেও ডিম নিষিক্ত না হলে ভেড়ী বার বার গরম হতে পারে, তাছাড়া হরমোনের অসামঞ্জস্যতার কারণে বা অতিরিক্ত গরম ও অসহনীয় অবস্থার কারণেও ফার্টিলাইজেশন ব্যাহত হলে ভেড়ী বার বার গরম হতে পারে
- সুতরাং সঠিক সময়ে পাল দেওয়া ও প্রজনন রোগের ক্ষেত্রে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ চিকিৎসা প্রদান এবং প্রয়োজনে পাঠা ও ভেড়ী খামার থেকে বাতিল করতে হবে
- বারে বারে প্রজননে একই পাঠা বা একই পাঠার বীজ ব্যবহার বিরত থাকতে হবে। ফলে ইন ব্রিডিং সমস্যা দূর হবে
- প্রজনন ব্যবস্থাপনায় ভাল পাঠা ও ভাল ভেড়ী নির্বাচন করে সিলেকটিভ ব্রিডিং করা গেলে জাত উন্নয়ন করার মাধ্যমে ভেড়ার খামার অধিক লাভজনক ও টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হবে

ভেড়ার বয়সভিত্তিক পরিচর্যা ও ব্যবস্থাপনা

প্রসব পূর্ববর্তী, প্রসবকালীন ও প্রসব পরবর্তী ব্যবস্থাপনা:

- গর্ভধারণের শেষ সপ্তাহে ভেড়ীর বিশেষ যত্নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে
- এসময় আবদ্ধ অবস্থায় পালনকৃত ভেড়ীকে মেটারনিটি প্যান বা প্রসব ঘরে রাখতে হবে এবং পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিত করতে হবে
- ছাড়া অবস্থায় চরে খাওয়া ভেড়ীকে গর্ভাবস্থার শেষ ২ সপ্তাহ বিশেষ নজরে রাখতে হবে
- এসময়টাতে কোনভাবেই ভেড়ীকে পাঠার কাছাকাছি রাখা যাবে না
- বাচ্চা প্রসবের লক্ষণ (প্রসব ব্যাথা, উঠ-বস করা, যোনিদ্বার ফুলে যাওয়া, যোনীদ্বার দিয়ে পাতলা স্বচ্ছ মিউকাস দেখা, ওলান দুধে ভরে উঠা) দেখা গেলে কাছাকাছি অবস্থান করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় জীবাণুমুক্ত কাঁচি, আয়োডিন মিশ্রণ, সুতা প্রস্তুত রাখতে হবে
- বাচ্চা জন্মদানকালে কোন অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটলে বা বাচ্চা আটকিয়ে গেলে দ্রুত সময়ের মধ্যে ভেটেরিনারিয়ানের সাহায্য নিতে হবে
- বাচ্চা জন্মানোর পর অতিদ্রুত বাচ্চার নাক ও মুখ পরিষ্কার সুতি কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে
- বাচ্চাকে ভেড়ী কাছাকাছি রাখতে হবে যেন ভেড়ী বাচ্চাকে চেটে পরিষ্কার করতে পারে
- একাধিক বাচ্চা জন্মালে প্রতিটির ক্ষেত্রেই একই ভাবে মুখ ও নাক পরিষ্কার করতে হবে
- বাচ্চা জন্মানোর পর যতদ্রুত সম্ভব প্রতিটি বাচ্চা যাতে শাল দুধ পায় তা নিশ্চিত করতে হবে
- বাচ্চা জন্মানোর পর ভেড়ীকে পর্যাপ্ত পরিমাণে স্যালাইন মেশানো পানি সরবরাহ করতে হবে
- প্রসব পরবর্তী গর্ভফুল পড়েছে কিনা (৬-১২ ঘন্টার মধ্যে) তা খেয়াল রাখতে হবে, না পড়লে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ নিতে হবে
- এসময়ে ভেড়ীকে পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার দেয়া গেলে পুনঃপ্রজনন দূরত্ব কমানো সম্ভব হবে

ভেড়ার রোগ ব্যবস্থাপনায় জীব নিরাপত্তা ও রোগ প্রতিরোধ

ভেড়ার রোগ ব্যবস্থাপনাঃ

ভেড়া প্রাকৃতিকভাবেই আবহাওয়া ও জলবায়ু সহনশীল। সহজেই প্রতিকূল পরিবেশে খাপ খাওয়াইয়া নিতে পারে। তাছাড়া রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও তুলনামূলকভাবে অন্যান্য প্রাণি থেকে অধিক। এতকিছুর পরেও ভেড়া প্রতিপালনে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হলো রোগ-ব্যাধি। রোগ ব্যবস্থাপনা জানতে হলে আগে সুস্থ ভেড়া চেনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে

সুস্থ ভেড়ার বৈশিষ্ট্যঃ

- চোখ, মুখ, নাক পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হবে
- লোম ও চামড়া মসৃন ও পরিষ্কার থাকবে
- মুখের উপরে মাজেলে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা যাবে
- ঠিকমত জাবর কাটবে, চলাফেরা স্বাভাবিক হবে এবং খাদ্যের প্রতি আগ্রহ থাকবে
- দলভুক্ত হয়ে মাঠে চড়বে এবং চলাচল করবে
- শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হবে
- অচেনা লোক কাছে আসলে সচেতন হবে

উপরে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের ব্যতয় ঘটলেই একটি ভেড়াকে অসুস্থ হিসাবে চিহ্নিত করতে হবে এবং ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ মোতাবেক ভেড়াকে সুস্থ করে তোলার বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে। সুস্থ ভেড়া লাভজনক ভেড়ার খামার পরিচালনার পূর্বশর্ত। রোগের কারণে খামারের ব্যয় বৃদ্ধি পায়, মৃত্যুর হার বাড়ে, ভেড়ার উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা কমে আসে। ভেড়ার রোগ ব্যবস্থাপনার জন্য সঠিক জীব নিরাপত্তা (বায়োসিকিউরিটি) নিশ্চিতকরণ, রোগ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় টিকা প্রদান এবং রোগ হলে সঠিক চিকিৎসা প্রদান অন্যতম অনুষঙ্গ।

রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনায় টিকা প্রদানঃ

খামারে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরী। কেননা, রোগ চিকিৎসা ব্যয়বহুল, কোন কোন রোগের নিশ্চিত চিকিৎসা নেই, চিকিৎসার মাধ্যমে রোগ নিরাময় হওয়া সত্ত্বেও অনেক সময় কাঙ্ক্ষিত উৎপাদনশীলতা অব্যাহত রাখা কঠিন। ভেড়ার টিকা প্রদান কার্যক্রম একে প্রদান করা হলোঃ

রোগ	৩ মাস	৪ মাস	৫ মাস	৬ মাস	মন্তব্য
ক্ষুরা রোগ	১ম ডোজ (ট্রাইভ্যালেন্ট)			২য় ডোজ (ট্রাইভ্যালেন্ট)	
পিপিআর		১ম ডোজ			
পক্স			১ম ডোজ		
গোটপক্স এবং ইকথাইমা রোগের টিকা প্রাপ্তি সাপেক্ষে ৩য় দিনে এবং ১০-১৪ তম দিনে পুনরায় টিকা প্রদান করা যেতে পারে এন্টারোটক্সিমিয়া রোগের টিকা প্রাপ্তি সাপেক্ষে ৬ মাস বয়সে টিকা প্রদান করা যেতে পারে ক্ষুরা রোগের টিকা প্রতি ৬ মাস পর পর প্রদান করতে হবে যেহেতু খামারের সকল ভেড়ার বয়স এক নয়, সে কারণে টিকা প্রদানের কর্মসূচি এক মাস পর্যন্ত আগ-পিছ করা যাবে					

ভেড়ার ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ, লক্ষণ ও করণীয়ঃ

ভেড়া তুলনামূলকভাবে রোগ সহনশীল হলেও কিছু কিছু রোগ খামারের ক্ষতি সাধন করতে পারে। রোগ সমূহকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন, ব্যাকটেরিয়া সংক্রমন জনিত রোগ, ভাইরাস জনিত রোগ, পরজীবী জনিত রোগ।(প্রটোজোয়া জনিত রোগ, কৃমি জনিত রোগ, উকুন-আঠালির আক্রমণ), অপুষ্টি জনিত রোগ, বংশগত রোগ ইত্যাদি।

ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমন জনিত রোগঃ

এনথ্রাক্সঃ

এনথ্রাক্স হলো ব্যাসিলাস এনথ্রাসিস নামক ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমন জনিত রোগ। এ রোগের ব্যাকটেরিয়া স্পোর আকারে মাটিতে থাকে। তাছাড়া চারণভূমিতে কোন আক্রান্ত ভেড়া বা অন্য প্রাণি বিচরণকালে মৃত্যুবরণ করলে তার সঠিকভাবে ডিসপোজাল না করলে মাটিতে এবং ঘাসে এ রোগের স্পোর এর পরিমাণ বেড়ে যায় যা পরবর্তীতে অন্য ভেড়া ভক্ষণ করলে এই স্পোর ভেড়াতে রোগ তৈরী করতে পারে।

রোগের লক্ষণঃ

- সাধারণত কোন লক্ষণ প্রকাশের আগেই ভেড়া মরে যেতে পারে।
- ভেড়ার গায়ের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে ১০৫-১০৬ ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যন্ত হতে পারে
- মৃত্যুর পর নাক, মুখ, পায়খানা ও প্রস্রাব রাস্তা দিয়ে কালো জমাটবিহীন রক্ত মিশ্রিত মিউকাস নির্গত হতে পারে।
- আক্রান্ত পশুর শ্বাস প্রশ্বাসের হার বেড়ে যেতে পারে। অন্য ভেড়া থেকে আলাদা হয়ে বিমাতে থাকে এবং হঠাৎ মারা যেতে পারে। কোন কোন সময় হঠাৎ লাফিয়ে উঠে মাটিতে পড়ে খিচুনি দিয়ে মারা যায়।

চিকিৎসাঃ

- যেহেতু এ রোগে লক্ষণ প্রকাশের আগেই হঠাৎ মারা যায়, সেহেতু এ রোগের চিকিৎসা প্রদানের সুযোগ কম। তবে লক্ষণ বুঝা গেলে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ মোতাবেক চিকিৎসা প্রদান করা যেতে পারে। এরোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে খামারের সকল ভেড়াকে প্রতিষেধক টিকা প্রদান করা যেতে পারে।

রোগ প্রতিরোধঃ

- টিকা প্রদানই এই রোগ প্রতিরোধের একমাত্র পথ।
- টিকা প্রদানের সাথে সাথে খামারের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, জীব-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী

এন্টারোটক্সিমিয়াঃ

এ রোগ ক্লোসট্রিডিয়াম পারফিনজেন্স টাইপ- ডি জাতীয় ব্যাকটেরিয়া সংক্রমন জনিত রোগ। এরোগে আক্রান্ত ভেড়ার কিডনী নরম, গলে গলে ও ফুলে যায়। এজন্য এই রোগকে পাল্পি কিডনী ডিজিজ ও বলা হয়। ভেড়াকে অধিক পরিমানে দানাদার খাদ্য প্রদান করলে পাকস্থলীতে বিদ্যমান এ সকল জীবানু অতিদ্রুত বংশ বৃদ্ধি করে এবং একধরনের টক্সিন তৈরী করে যার প্রভাবে ভেড়া লক্ষণ প্রকাশের আগেই মারা যায়।

রোগের লক্ষণঃ

- সাধারণত কোন লক্ষণ প্রকাশের আগেই ভেড়া মারা যেতে পারে।
- ভেড়ার পেটে প্রচন্ড ব্যথা হয় ফলে ভেড়া মাটিতে শুয়ে পা ছড়াছড়ি করে, গায়ের তাপমাত্রা কমে যায়।
- আক্রান্ত পশুর শ্বাস-প্রশ্বাসের হার বেড়ে যেতে পারে। পাতলা পায়খানা হয়। দুর্বল হয়ে যায় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই মারা যায়

চিকিৎসাঃ

- যেহেতু এ রোগে লক্ষণ প্রকাশের আগেই হঠাৎ মারা যায়, সেহেতু এ রোগের চিকিৎসা প্রদানের সুযোগ কম। তবে লক্ষণ বুঝা গেলে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ মোতাবেক চিকিৎসা প্রদান করা যেতে পারে।

রোগ প্রতিরোধঃ

- প্রয়োজনীয় পরিমানের অধিক দানাদার খাদ্য সরবরাহ না করা।
- বিশেষত স্বাস্থ্যবান ভেড়াকে পরিমিত দানাদার খাদ্য সরবরাহ করা।
- খামারের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, জীব-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী

স্ট্রাক, ব্ল্যাক এবং ব্রাক্সিঃ

স্ট্রাক, ব্ল্যাক এবং ব্রাক্সি ক্লোসট্রিডিয়াম ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ জনিত রোগ। ক্লোসট্রিডিয়াম পারফ্রিনজিন্স টাইপ সি, ক্লোসট্রিডিয়াম নোভি টাইপ বি এবং ক্লোসট্রিডিয়াম সেপটিকাম জীবাণু সংক্রমনের কারণে যথাক্রমে স্ট্রাক, ব্ল্যাক এবং ব্রাক্সি রোগ হয়ে থাকে।

রোগের লক্ষণঃ

- সাধারণত কোন লক্ষণ প্রকাশের আগেই ভেড়া মারা যেতে পারে
- স্ট্রাক হলে ভেড়া বসা অবস্থা থেকে উঠতে পারে না, চার পা চারদিকে ছড়িয়ে বুকের উপর ভর দিয়ে মাথা ও থুতনি নিচু করে শুয়ে থাকে, দাঁত কিড়মিড় করে, মুখে ফেনা দেখা যায়, শরীর অসাড় হয়ে যায় এবং রক্ত মিশ্রিত পাতলা পায়খানা হতে পারে
- ব্ল্যাক ডিজিজ হলে ভেড়ার যকৃত নষ্ট হয়ে যায় ফলে খুব সহজেই ভেড়া মারা যায়
- ব্রাক্সি হলে ভেড়ার পেটে প্রচন্ড ব্যথা হয় ফলে ভেড়া মাটিতে শুয়ে পড়ে, ঝিমায় এবং মারা যায়
- আক্রান্ত পশুর শ্বাস-প্রশ্বাসের হার বেড়ে যেতে পারে। পাতলা পায়খানা হয়। দুর্বল হয়ে যায় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই মারা যায়
- স্ট্রাক ও ব্রাক্সি রোগে সাধারণত বাচ্চা ভেড়া বেশী আক্রান্ত হয় অপরদিকে ব্ল্যাক ডিজিজে সাধারণত ২-৪ বছর বয়সের ভেড়া আক্রান্ত হয়

চিকিৎসাঃ

- যেহেতু এসকল রোগে লক্ষণ প্রকাশের আগেই হঠাৎ মারা যায়, সেহেতু এ রোগের চিকিৎসা প্রদানের সুযোগ কম, তবে লক্ষণ বুঝা গেলে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ মোতাবেক চিকিৎসা প্রদান করা যেতে পারে

রোগ প্রতিরোধঃ

- প্রয়োজনীয় পরিমানের অধিক দানাদার খাদ্য সরবরাহ না করা
- ভেড়াকে পরিমিত দানাদার খাদ্য সরবরাহ করা
- খামারের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, জীব-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী
- টিকা প্রাপ্যতা সাপেক্ষে টিকা প্রদান করা যেতে পারে

ল্যাম্ব ডিসেন্ট্রিঃ

ক্লোসট্রিডিয়াম পারফ্রিনজেন্স টাইপ বি ব্যাকটেরিয়া সংক্রমনের কারণে এ রোগ হয়। সাধারণত ১-৪ দিন বয়সি বাচ্চাতে বেশী দেখা যায় তবে ৩ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত এ রোগ হতে পারে। এ রোগে মৃত্যুর হার ২০-৩০%।

রোগের লক্ষণঃ

- সাধারণত কোন লক্ষণ প্রকাশের আগেই বাচ্চা ভেড়া মারা যেতে পারে
- দুধ খাওয়া অবস্থায় ভেড়ার পেটে প্রচন্ড ব্যথা হয় ফলে ভেড়া মাটিতে শুয়ে যায়, শ্বাস-প্রশ্বাসের হার বেড়ে যেতে পারে, আমাশয় হতেও পারে না ও হতে পারে। দুর্বল হয়ে যায় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই মারা যায়

চিকিৎসাঃ

- যেহেতু এ রোগে লক্ষণ প্রকাশের আগেই হঠাৎ মারা যায়, সেহেতু এ রোগের চিকিৎসা প্রদানের সুযোগ কম, তবে লক্ষণ বুঝা গেলে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ মোতাবেক এন্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা প্রদান করা যেতে পারে

রোগ প্রতিরোধঃ

- মা ভেড়ার ওলান পরিষ্কার রাখতে হবে
- বাচ্চা ভেড়ার বাসস্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে
- খামারের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, জীব-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী

টিটেনাসঃ
ক্লোস্ট্রিডিয়াম টিটানি নামক ব্যাকটেরিয়া সংক্রমনের কারনে এ রোগ হয়। সাধারণত গভীর ক্ষতে এ রোগের জীবাণু সংক্রমণ শুরু হয়। ভেড়ার বাচ্চাকে খাসী করনের সময় টিটেনাস টক্সয়েড টিকা প্রদান না করলে সে ক্ষতস্থানে জীবাণু প্রবেশ ঘটে এবং রোগাক্রান্ত হয়। এরোগে মৃত্যুঝুঁকি প্রায় শতভাগ।

রোগের লক্ষণঃ
- ➢ সাধারণত আক্রান্ত ভেড়ার বিভিন্ন অংশের মাংশপেশী শক্ত হয়ে যায়
- ➢ মাংসপেশীর খিচুনি, প্রস্রাব পায়খানা না হওয়া, গায়ের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া, ধীরে ধীরে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে মরে যাওয়া ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দিতে পারে

চিকিৎসাঃ
- ➢ এ রোগের চিকিৎসায় ভালো ফল পাওয়া যায় না, প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ সনাক্ত করা গেলে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ মোতাবেক এন্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা প্রদান করা যেতে পারে

রোগ প্রতিরোধঃ
- ➢ ক্যাস্ট্রেশন বা যেকোন অস্ত্রপাচার করার পূর্বেই টিটেনাস টক্সয়েড প্রদান করতে হবে
- ➢ বাচ্চা ভেড়ার বাসস্থান পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে

ফুট রটঃ
ব্যাকটেরয়ডস নোডোসাস নামক ব্যাকটেরিয়া সংক্রমনের ফলে এ রোগ হয়। এতে সাধারণত পায়ের ক্ষুরার গোড়ায় পচন দেখা দেয়, দুর্গন্ধ হয়। কখনো কখনো ওলানেও রোগ সংক্রমন হতে পারে। এক্ষেত্রে ভেড়ার পা ৫% কপার সালফেট দ্রবণের সাহায্যে পরিষ্কার করে এন্টিবায়োটিক অয়েন্টমেন্ট ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

ভেড়ার গর্ভপাতজনিত রোগ এবং ভাইরাসজনিত রোগ, লক্ষণ ও করণীয়
গর্ভপাত সম্পর্কিত ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগঃ ভিব্রিওসিস, ব্রুসেলোসিস ও লিস্টেরিওসিস রোগ ভেড়াতে গর্ভপাতের কারন হতে পারে। এসকল রোগ সম্পর্কিত তথ্যাদি নিম্ন ছকে উপস্থাপন করা হলো

রোগের নাম	কারণ	লক্ষণ	চিকিৎসা	প্রতিরোধ
ভিব্রিওসিস	ভিব্রিও কলেরি	➢ গর্ভাবস্থার শেষ সপ্তাহে গর্ভপাত ➢ জীবিত দুর্বল বাচ্চা হলেও জন্মের ২-৩ দিনের মধ্যে বাচ্চা মারা যায়	➢ ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ মোতাবেক উচ্চ ক্ষমতাশালী এন্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা প্রদান করা যেতে পারে তবে ফলাফল খুব ভালো নয়।	➢ খামারে বায়োসিকিউরিটি ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। ➢ জীবাণু-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
ব্রুসেলোসিস	ব্রুসেলা ওভিস	➢ গর্ভাবস্থার শেষের দিকে গর্ভপাত ➢ গর্ভফুল আটকিয়ে যাওয়া ➢ পুরুষ ভেড়াতে অন্ডকোষ ফুলে যাওয়া।	➢ ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ মোতাবেক উচ্চ ক্ষমতাশালী এন্টিবায়োটিক দিয়ে দীর্ঘস্থায়ী চিকিৎসা প্রদান করা যেতে পারে	➢ ব্রুসেলা আক্রান্ত পশু ভেড়ার খামারে

লিস্টেরিওসিস	লিস্টেরিয়া মনোসাইটোজেনস	➢ গর্ভাবস্থার যেকোন সময়ে গর্ভপাত ➢ মস্তিষ্ক প্রদাহ, চক্রাকারে ঘোরা ➢ আক্রান্ত ভেড়ীর যোনিদ্বার হতে বাদামী রংয়ের মিউকাস পড়া।	➢ ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ মোতাবেক উচ্চ ক্ষমতাশালী এন্টিবায়োটিক দিয়ে দীর্ঘস্থায়ী চিকিৎসা প্রদান করা যেতে পারে।	হতে বাতিল করা এবং প্রজনন কাজে ব্যবহার না করা।

ভাইরাস জনিত রোগঃ

ভেড়ার বসন্ত (শীপ পক্স)ঃ

ভেড়ার ভাইরাস জনিত রোগের মধ্যে শীপ পক্স অন্যতম। এ রোগে বাচ্চা ভেড়াতে মৃত্যু হার অনেক বেশী। এ রোগ সহজেই এক ভেড়া হতে অন্য ভেড়াতে ছড়ায়

লক্ষণঃ

➢ বাচ্চা ভেড়াতে জ্বর, ঝিমুনী, নাক ও মুখ দিয়ে পানি পড়া

➢ কোন কোন ক্ষেত্রে রোগের লক্ষণ প্রকাশের আগেই মারা যেতে পারে

➢ বয়স্ক ভেড়ার পা, মুখ, বুকের চামড়া, মুখ গহবরে, কানে গুটি উঠতে দেখা যায়

চিকিৎসাঃ

এ রোগের সুনির্দিষ্ট কোন চিকিৎসা নেই। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ সনাক্ত করা গেলে চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক এন্টিবায়োটিক, ব্যাথানাশক ও এন্টিহিস্টামিন জাতীয় ঔষধ দিয়ে চিকিৎসা প্রদান করা যেতে পারে

প্রতিরোধঃ

➢ টিকা প্রদানই এই রোগ প্রতিরোধের একমাত্র পথ

➢ টিকা প্রদানের সাথে সাথে খামারের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, জীব-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী

পিপিআরঃ

পিপিআর রোগটিতে সাধারণত ছাগলে প্রাদুর্ভাব বেশী হয়ে থাকে। ভেড়াতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব খুবই কম দেখা যায়। এরোগে আক্রান্ত ভেড়াতে পাতলা পায়খানা, নাক দিয়ে তরল বের হওয়া, দেহের তাপমাত্রা বেড়ে ১০৬-১০৭ ডিগ্রি ফারেনহাইটে উন্নীত হওয়া এবং শ্বাস কষ্ট দেখা দিতে পারে। চিকিৎসা প্রদান না করলে মৃত্যুর কারণ হতে পারে। এটাকে গ্রি ডি ভিজিজও বলা হয়

চিকিৎসাঃ

এ রোগের সুনির্দিষ্ট কোন চিকিৎসা নেই। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ সনাক্ত করা গেলে চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক এন্টিবায়োটিক, স্যালাইন ও এন্টিবডি জাতীয় ঔষধ দিয়ে চিকিৎসা প্রদান করা যেতে পারে

প্রতিরোধঃ

➢ টিকা প্রদানই এই রোগ প্রতিরোধের একমাত্র পথ

➢ টিকা প্রদানের সাথে সাথে খামারের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, জীব-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী

ক্ষুরা রোগঃ

একপ্রকার ভাইরাস জনিত দ্বিখণ্ডিত ক্ষুর বিশিষ্ট প্রাণির এ রোগ হয়ে থাকে। সাধারণত গরু- ছাগলের পাশাপাশি ভেড়াতেও এ রোগ দেখা যায়। আক্রান্ত ভেড়াকে প্রথমদিকে খুড়িয়ে হাটতে দেখা যায়। পরবর্তীতে মুখে, জিহ্বায় পায়ের ক্ষুরার মাঝখানে ফোসকা পড়তে দেখা যায়

চিকিৎসাঃ

এ রোগের সুনির্দিষ্ট কোন চিকিৎসা নেই। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ সনাক্ত করা গেলে চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক এন্টিবায়োটিক জাতীয় ঔষধ দিয়ে চিকিৎসা প্রদান করা যেতে পারে। তাছাড়া আক্রান্ত স্থান ৪% সোডি বাই কার্ব দিয়ে ধৌত করে সালফোনিলামাইড জাতীয় পাউডার প্রয়োগ করা যেতে পারে। খেয়াল রাখতে হবে যেন মাছি বসতে না পারে

প্রতিরোধঃ

- টিকা প্রদানই এই রোগ প্রতিরোধের একমাত্র পথ
- টিকা প্রদানের সাথে সাথে খামারের জীব-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী

অন্যান্য ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস জনিত রোগের মধ্যে নিউমোনিয়া, ম্যাসটাইটিস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রোগ যা ভেড়াতেও সংক্রমিত হতে পারে। এ সকল রোগের সঠিক চিকিৎসা প্রদান করা হলে ভেড়া সুস্থ হয়।

পরজীবিজনিত রোগঃ

পরজীবিজনিত রোগ সমূহের মধ্যে কলিজা কৃমি, হেমনকোসিস, মেনজ (চিমড় সংক্রমন), উকুন, আঠালি ও প্রটোজোয়া সংক্রমনজনিত রোগ উল্লেখযোগ্য। এসকল রোগ সমূহ নিয়ন্ত্রনে যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় তা হলোঃ

- বছরে অন্তত ২ বার কৃমিনাশক প্রদান করতে হবে
- ভেড়াকে ০.৫% ম্যালাথিয়ন দ্রবণে ডিপিং করতে হবে অথবা ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুসারে সঠিক মাত্রায় চামড়ার নীচে আইভারমেকটিন ইনজেকশন করাতে হবে
- প্রটোজোয়া জনিত রোগের ক্ষেত্রে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুসারে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদান করতে হবে

ক্লোস্ট্রিডিয়াল ইনফেকশন

ক্ষুরা রোগ

ভেড়া হতে উল উৎপাদন এবং ৩০টি ভেড়া সমৃদ্ধ খামারের আয়-ব্যয়ের হিসাব

ভেড়া হতে উল উৎপাদনঃ বাংলাদেশে সাধারণত মাংস উৎপাদনের লক্ষ্যে ভেড়া পালন করা হয়ে থাকে। তবে ভেড়া থেকে কিছু পরিমাণ উল উৎপাদিত হয়ে থাকে। এসকল উল সাধারণত গুণগত দিক থেকে নিম্নমানের। উৎপাদিত উল সাধারণত কার্পেট, কম্বল ও মাদুর তৈরীতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বছরে ২-৩ বার শেয়ারিং এর মাধ্যমে উল সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। আমাদের দেশে সাধারণত হস্তচালিত ব্লেড দিয়ে শেয়ারিং এর কাজ সম্পন্ন করা হয় তবে ইলেক্ট্রিক্যাল শেয়ারার ব্যবহার অধিক নিরাপদ। উল সংগ্রহ করার পূর্বে কিছু প্রস্তুতিমূলক বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখতে হবে, যথাঃ

- উল সংগ্রহের পূর্বে ভেড়াকে ভালভাবে গোসল করিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে
- উল/পশম যাতে ভিজা না থাকে সেদিকে নজর রাখতে হবে
- শেয়ারিং করার আগের রাতে ভেড়াকে কিছু পরিমাণ খাবার সরবরাহ করতে হবে
- শেয়ারিং করা স্থানের মেঝে অবশ্যই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, শুকনো ও পাকা হতে হবে
- শেয়ারিং এর সময় ভেড়ার চার পা সঠিকভাবে বেধে নিতে হবে অথবা ভেড়া দাঁড়ানো অবস্থায় যথেষ্ট আয়ত্তের মধ্যে রেখে শেয়ারিং সম্পন্ন করতে হবে

সেমি-ইনটেনসিভ পদ্ধতিতে ৩০ টি ভেড়া বিশিষ্ট খামার এর সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের হিসাবঃ

ব্যয়ের খাত	টাকার পরিমাণ
প্রয়োজনীয় মূলধন বিনিয়োগঃ	
প্রয়োজনীয় জমি	নিজস্ব
ছন ও বাঁশের তৈরী ঘর	২০০০০.০০
৩০ টি গর্ভবতী ভেড়া ও ৩ টি ভেড়ার মূল্য @৪০০০/-	১৩২০০০.০০
খাবার পাত্র, পানির পাত্র ও অন্যান্য	৪০০০.০০

বিনিয়োগকৃত মূলধন	১৫৬০০০.০০
বিনিয়োগকৃত মূলধন এর ৬০% ব্যাংক থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে অর্থাৎ ৯৩৬০০.০০ টাকা ব্যাংক লোন হিসাবে নেয়া যেতে পারে।	
১ম বছরের আবর্তক ব্যয়	
প্রতিটি ভেড়ার প্রতিদিনের দানাদার খাবার ০.২৫ কেজি হারে ৩৬৫ দিনে মোট দানাদার খাদ্য লাগবে ০.২৫×৩৬৫=৯১.২৫ কেজি। সুতরাং প্রতিকেজি ২২ টাকা হারে ৩৩ টি ভেড়ার দানাদার খাদ্য বাবদ খরচ হবে ৯১.২৫ x৩৩ x ২২=৬৬২৪৭.৫	৬৬২৪৭.৫
প্রতিটি ভেড়ার দৈনিক ২ কেজি কাঁচা ঘাস হিসেবে ৩৩ টি ভেড়ার ৩৬৫ দিনে খরচ বাবদ @ ৩ টাকা/কেজি	৭২২৭০.০০
৬০ বাচ্চা ভেড়ার ১৮০ দিনের দানাদার খাদ্য খরচ @০.১৫ কেজি/ভেড়া	৩৫৬৪০.০০
৬০ বাচ্চা ভেড়ার ১৮০ দিনের কাঁচা ঘাস বাবদ খরচ ১ কেজি/ভেড়া	৩২৪০০.০০
আনুষঙ্গিক ও ঔষধ বাবদ খরচ	৫০০০.০০
১ম বছরের মোট আবর্তক ব্যয়	২০৬৫৫৭.০০
১ম বছরের মোট আয়	
৬০ ভেড়া বিক্রয় বাবদ @৪০০০/	২৪০০০০.০০
বিষ্ঠা বিক্রয়	২০০০.০০
মোট আয়	২৪২০০০.০০
নীট খরচ (আবর্তক ব্যয়+মূলধন ব্যয়ের এক দশমাংশ) (একবার মূলধন ব্যয় দিয়ে ১০ টি ব্যাচ প্রতিপালন করা যাবে) (২০৬৫৫৭.০০+১৫৬০০.০০=২২২১৫৭.০০/-)	২২২১৫৭.০০
১ম বছরের নীট মুনাফা (মোট আয়-নীট খরচ)	১৯৮৪৩.০০

পরবর্তী বছর হতে ১ম বছরের নীট মুনাফার কয়েকগুন হিসেবে নীট মুনাফা অর্জিত হবে

গাভী পালন

বাংলাদেশের গবাদিপশুর জাত পরিচিতি

সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশে গরুর কোন অবিমিশ্র (pure) কিংবা উন্নত জাত নেই। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের গরু সে সব অঞ্চলের নামানুসারে পরিচিত। যেমন চট্টগ্রাম অঞ্চলের গরুকে চাটগাঁইয়া, পাবনার গরুকে পাবনাইয়া এবং ভৈরবের গরুকে ভৈরবী বলে। বাংলাদেশের কিছু কিছু অঞ্চলে বিশেষ উৎপাদনশীল গাভী পরিলক্ষিত হয়। যেমন: চট্টগ্রামের লাল গরু, পাবনা জেলার গরু ও ফরিদপুর জেলার গরু।

বিভিন্ন জাতের গরুঃ

বাংলাদেশের স্থানীয় গরুর পরিচিতি ঃ

চট্টগ্রামের লাল গরু:

চট্টগ্রাম এলাকার বিশেষ প্রজাতির গরু। গরুর আকৃতি মধ্যম। মূলত মাংস ও দুধ উৎপাদনের জন্য এ জাতীয় গরু পালন করা হয়। হালকা লাল বর্ণের এজাতের গরু দেখতে মাঝারি, পিছনের দিক বেশ ভারী, চামড়া পাতলা, শিং ছোট ও চেপ্টা, মুখ খাটো ও চওড়া, লেজ বেশ লম্বা এবং শেষ প্রান্তে চুলের গুচ্ছ লাল বর্ণের। ওলান বেশ বর্ধিত ও বাঁট সুডৌল, দুগ্ধ শিরা স্পষ্ট, দৈনিক ১০-১২ লিটার দুধ দেয়। ষাঁড় ও বলদ বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী। কৃষি ও ভার বহনের কাজে উপযোগী।

চট্টগ্রামের লাল জাতের গরু

ঢাকা মুন্সিগঞ্জ এলাকার গরু (মীরকাদিম) ঃ

মুন্সিগঞ্জ এলাকায় বিশেষ প্রজাতির এই গরু গুলো বাংলাদেশে ঐতিহ্যবাহী গরু। গরুর আকৃতি মধ্যম, একটু সমাটে ধরণের বিভিন্ন বর্ণের হয়। মূলত মাংস ও দুধ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় এই জাত। মুখ কিছুটা সরু ও লম্বা। গাভীর চুড়া প্রায় থাকে না। পিঠ সোজা, শিং সরু ও খুব ধারালো। দেহের সাথে আটসাট ওলান সম্মুখের দিকে একটু বাঁকানো। মিল্ক ভেইন মোটা ও স্পষ্ট। দৈনিক ৭-৮ লিটার দুধ দোহন করা যায়। কুরবানির হাটে এই গরুর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

মীরকাদিম জাতের গরু

পাবনা জেলার গরুঃ

এ জাতের গাভী ও বলদ উভয়েই আকারে বেশ উঁচু ও লম্বা হয়। দেহের রং গাঢ় ধূসর হতে সাদা রংযুক্ত হয়ে থাকে। একটি গাভীর দৈনিক ৬-৯ কেজি পর্যন্ত দুধ দেয়।

পাবনা জাতের গরু

ফরিদপুর জেলার গরুঃ

বাংলাদেশের মধ্যে ফরিদপুরের গরু বেশ উন্নত ধরনের। হরিয়ানা জাতের ক্রস গরু ফরিদপুর জেলায় দেখা যায়। এরা মাথা উঁচু করে হাঁটে। গায়ের রং সাদা বা হালকা ধূসর হয়। চামড়া পাতলা থাকে। ষাড়ের ওজন ৩০০-৪০০ কেজি হয় এবং গাভীর ওজন ২০০-৩০০ কেজি হয়।

ফরিদপুর জেলার গরু

সংকর জাতের গরুর পরিচিতিঃ

হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান জাতের গরু ঃ

এ জাতের গরুর উৎপত্তিস্থান হল্যান্ডের ফ্রিজল্যান্ড প্রদেশে। ফ্রিজিয়ান গাভীর বর্ণ সাধারণত ছোট বড় কাল ছোপযুক্ত এবং কখনো পুরোপুরি সাদা ও কালো হয়। হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান গাভী সাধারণত বড় ও মাথা লম্বাটে দেখা যায়, কুজ অনুন্নত হয়। গাভীর ওজন থাকে ৫৫০ কেজি থেকে ৭০০ কেজি এবং ষাড়ের ওজন ৯০০-১০০০ কেজি পর্যন্ত হয়। প্রথম গর্ভধারণ বয়স ১৮-২৪ মাস এবং বছরে গড় দুধ উৎপাদন ৮০০০ থেকে ১২০০০ লিটার পর্যন্ত হয়। দৈনিক এ জাতের গাভী ২০-৪০ লিটার পর্যন্ত দুধ দিতে পারে।

ফ্রিজিয়ান জাতের গাভী

জার্সি জাতের গরু ঃ

জার্সি জাতের উৎপত্তি ইংলিশ চ্যানেলের জার্সি নামক ব্রিটিশ দ্বীপ থেকে। এই জাতটি সবচেয়ে বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় ইংল্যান্ডে ও আমেরিকায়। এ জাতের গরু আকারে ছোট গায়ের রং লাল বা মেহগনি রং মিশ্রিত। জিহ্বা ও লেজ কালো থাকে। শিং পাতলা এবং সামনের দিকে সামান্য বাঁকানো থাকে। এ জাতের গাভীর ওজন ৪০০-৬০০ কেজি হয়। এবং প্রাপ্ত বয়স্ক ষাড়ের ওজন ৬০০-৮০০ কেজি হয়। জন্মের পর বাছুরের ওজন প্রায় ২৫-২৭ কেজি হয়। জার্সি জাতের গাভী থেকে বছরে ৫০০০-৬০০০ লিটার দুধ পাওয়া যায়।

জার্সি জাতের গাভী

শাহীওয়াল জাতের গরু ঃ

শাহীওয়াল গরুর উৎপত্তি পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের মন্টগোমারী জেলায়। শাহীওয়াল গরু বেশ লম্বা মোটাসোটা ও ভারী হয়। শাহীওয়াল গরুর গায়ের রং হালকা লাল, বাদামী এবং সাদা হয়। এ গরুর কুঁজ ও গলকম্বল বড় ও ঝুলানো

শাহীওয়াল জাতের গরু

থাকে। এ জাতের গরু শান্ত প্রকৃতির হয়। এ জাতের গাভীর ওজন ৫০০-৫৫০ কেজি এবং ষাঁড়ের ওজন ৬৫০-১০০০ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। জন্মকালে বাছুরের ওজন ২২-৩০ কেজি হয়। বছরে দুধ উৎপাদন হয় ২৫০০-৪০০০ লিটার

সিন্ধি জাতের গরু :

লাল সিন্ধী জাতের গাভী

লাল সিন্ধি জাতের গরুর উৎপত্তি পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের করাচী, লাসবেলা ও হায়দারাবাদে। গায়ের রং লাল, গাঢ় লাল বা চকলেট বর্ণের হয়। শিং মোটা, পাশে বা পিছনে বাঁকানো থাকে। কপাল চওড়া এবং কপালের মাঝের অংশ উঁচু থাকে। এ জাতের গাভীর ওজন ৩৫০-৪০০ কেজি এবং ষাঁড়ের ওজন ৪৫০-৫৫০ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। জন্মকালে বাছুরের ওজন হয় ২১-২৪ কেজি। বার্ষিক দুধ উৎপাদনের পরিমাণ হলো ৩৫০০-৪৫০০ লিটার। এবং দুধে চর্বির পরিমাণ ৫% এর বেশি থাকে।

হরিয়ানা জাতের গরু:

হরিয়ানা জাতের গরু

হরিয়ানা গরুর রং সাধারণত সাদা রঙের হয়। শরীর লম্বা ও সুগঠিত থাকে। শিংজোড়া ছোট ও পাতলা থাকে। পা লম্বা হয়। কুঁজ বড় ও প্রশস্ত থাকে। গাভীর ওজন ৫০০-৫৫০ কেজি এবং ষাঁড়ের ওজন ৬০০-৭০০ কেজি হয়। বার্ষিক দুধ উৎপাদন ৩০০০-৩৫০০ লিটার।

ব্রাহমা জাতের গরু:

ব্রাহমা জাতের গরু:

এ জাতের গরুর উৎপত্তি ভারতীয় উপমহাদেশে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস এবং মেক্সিকো উপকূল এলাকায় এ গরু দেখা যায়। এ জাতের গরুর কুঁজ বড়, গলকম্বল ঝুলন্ত গায়ের রং হালকা থেকে গাঢ় ধূসর হয়ে থাকে। এ জাতের ষাঁড়ের ওজন ১০০০ থেকে ১২০০ কেজি হয়ে থাকে। গাভীর ওজন হয় ৪০০-৬০০ কেজি হয়।

একটি উৎকৃষ্ট গাভী চেনার উপায় :

একটি উৎকৃষ্ট গাভী চেনার জন্য নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ লক্ষ্য রাখতে হবে।

- ✓ গাভী লম্বা আকৃতি, পিছনের অংশ প্রশস্ত এবং ভারী, সামনের অংশ সরু হবে
- ✓ মাথা হালকা ও ছোট আকারের হবে। কপাল প্রশস্ত, চোখ উজ্জ্বল হবে। অধিক খাদ্য গ্রহণে আগ্রহী হবে।
- ✓ দেহের সামনের দিক হালকা এবং পিছনের দিক ভারী ও সুগঠিত হবে। অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সুসংগঠিত হবে। দৈহিক আকার আকর্ষণীয় হবে। শরীরের গঠন ঢিলা হবে।
- ✓ পাঁজরের হাঁড় সুস্পষ্ট অনুভব করা যাবে। হাঁড়ের গঠন সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।
- ✓ চামড়া পাতলা হবে। চামড়ার নীচে চর্বির বাহুল্য থাকবে না। লোম মসৃণ ও চকচকে হবে।
- ✓ গাভীর ক্ষেত্রে ওলান বড় ও সুগঠিত হবে ও দেহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। পিছনের দুই পায়ের মধ্যবর্তী স্থান প্রশস্ত হবে। বাটগুলি একই আকারের হবে। ৪টি বাট সমান দূরত্বে ও সমান্তরাল হবে।
- ✓ দুগ্ধ শিরা মোটা ও স্পষ্ট হবে। তলপেটে নাভীর পাশ দিয়ে দুগ্ধশিরা আঁকাবাঁকাভাবে বিস্তৃত থাকবে।

গবাদি প্রাণির বাসগৃহ ব্যবস্থাপনা (Housing of cattle)

গবাদিপশুর বাসগৃহের শ্রেণিবিন্যাস ঃ

গবাদিপশুর বাসগৃহ প্রধানত আবহাওয়া, ভৌগলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য অবস্থার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়। তাই বিভিন্ন অঞ্চল বা দেশের গবাদিপশুর বাসগৃহ বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। আমাদের দেশের উপযোগী প্রধানত দু'ধরনের পশুগৃহ (types of animal housing) নির্মাণ করা যায় যথা- (১) উদাম ঘর পদ্ধতি এবং (২) বাঁধা ঘর পদ্ধতি।

১) উদাম ঘর পদ্ধতি (loose housing system):

এ পদ্ধতিতে বাচ্চা প্রসব ও দুধ দোহার সময় ছাড়া দিন ও রাত্রি গবাদিপশুকে দেয়াল বেষ্টিত খোলা জায়গায় (paddock) পালন করা হয়। তবে প্রতিকূল আবহাওয়া যেমন- ঝড়, বৃষ্টি, গরম, ঠান্ডা ইত্যাদি সময় পশুর নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য খোলা স্থানের সংলগ্ন ঘর সংযুক্ত থাকে। এধরনের বাসগৃহে একটি খাদ্য পাত্র ও পানি পাত্র সকল পশুর জন্য উন্মুক্ত থাকে। বয়স্ক বাছুর ও দুধ দিচ্ছেনা এমন গাভীর জন্য উদাম ঘর পদ্ধতি সুবিধাজনক। একটি গাভীর জন্য ৩.৫ বর্গমিটার আবৃত স্থান এবং ৭.০ বর্গমিটার খোলাস্থান আয়তনের মেঝের প্রয়োজন।

২) বাঁধা ঘর পদ্ধতি (stanchion row system):

এই পদ্ধতির গোশালাকে প্রচলিত গোশালা (conventional barn) বলা হয়। এই পদ্ধতিতে গরুর গলায় দড়ি বা লোহার শিকলি দিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে বেঁধে পালন করা হয়। একই স্থানে গাভীর দুধ দোহন ও খাওয়ানো সম্পূর্ণ করা হয়। বাঁধা ঘর পদ্ধতির গোশালায় গবাদিপশু সব সময় বাঁধা অবস্থায় রাখা হয়। সেজন্য গোশালা সহজে যাতে পরিষ্কার করা যায় এবং গরু যাতে আরামে থাকে সেদিকে লক্ষ্য রেখে গোশালা নির্মাণ করা প্রয়োজন। প্রধানত বাঁধা গোশালা দু'ধরনের হয়। (ক) এক-সারি বিশিষ্ট গোশালা এবং (খ) দ্বি-সারি বিশিষ্ট গোশালা।

(ক) এক সারি বিশিষ্ট গোশালা (single row system cowshed):

সাধারণত অল্পসংখ্যক গবাদি পশুর জন্য গ্রাম অঞ্চলের গৃহস্থের বাড়িতে একটি লম্বা সারিতে গরু বেঁধে পালনের জন্য এ ধরনের গোশালা তৈরি করা হয়। প্রতিটি পশুকে পৃথক রাখার জন্য লোহার তৈরি জিআই পাইপ দিয়ে পার্টিশন দেয়া ভাল। সাধারণত পার্টিশনের পাইপ লম্বায় ৩ ফুট ও উচ্চতায় ১.৫ ফুট হওয়া প্রয়োজন। গোশালা হবে এক চালা বিশিষ্ট ঘর। এক চালা ঘরের ছাদ প্রায় ১০ ফুট উঁচু করতে হবে।

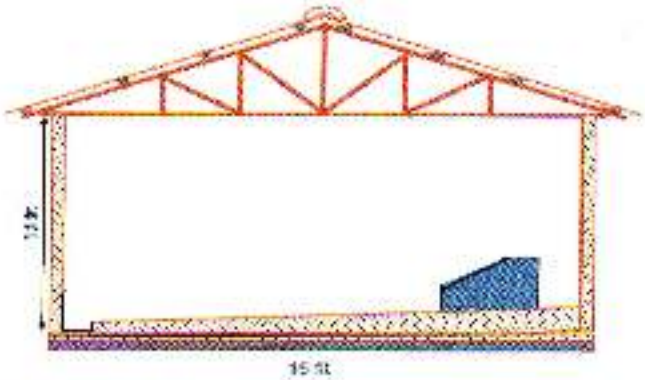

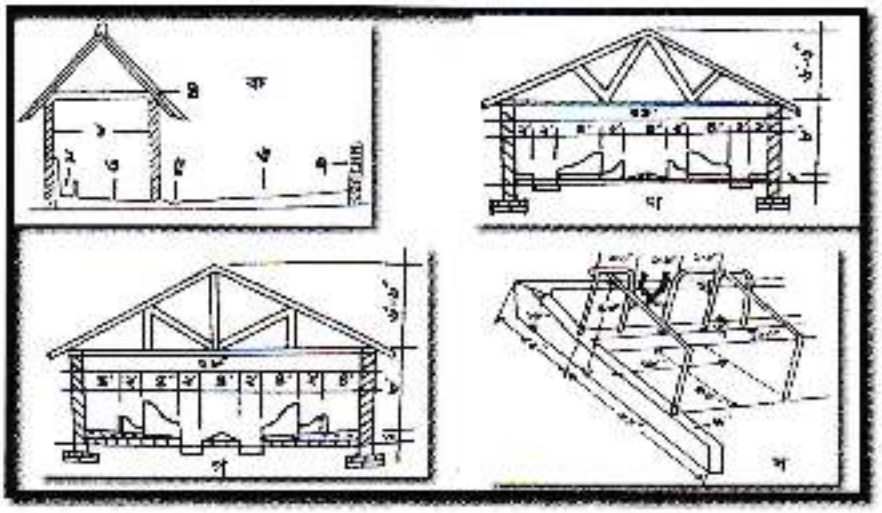

চিত্র ৪ (ক) উলম্ব প্রকৃতির একটি গরুর ঘরের নমুনা। ১ = ঘরের দেয়াল, ২ = মেঞ্জার, ৩ = আবৃত মেঝে, ৪ = ছাদ, ৫ = গাটার, ৬ = খোলা মেঝে, ৭ = প্রাচীর; (খ) মুখোমুখি পদ্ধতিতে গরু রাখার গোশালার নমুনা; (গ) পিছোপিছি পদ্ধতিতে গরু রাখার গোশালার নমুনা; (ঘ) আদর্শ গোশালায় গরু রাখার স্থানের নকশা।

(খ) দ্বিসারি বিশিষ্ট গোশালা (double row system cowshed):

অধিক সংখ্যক পশু পালনের জন্য দ্বিসারি বিশিষ্ট গোশালা প্রয়োজন হয়। এধরনের গোশালায় দুসারি পশুর মাঝখানে ৪ ফুট চওড়া একটি সাধারণ পথ থাকে। এই ধরনের গোশালায় পশুকে দুভাবে দুসারিতে রাখা হয়। যথা- (অ) মুখোমুখি পদ্ধতি এবং (আ) দেয়ালের দিকে লেজ বা পিছোপিছি পদ্ধতি। মুখোমুখি (Face-in or Face to Face system) পদ্ধতিতে গোশালায় দুই সারি পশু সামনা সামনি থাকে। দেয়ালের দিকে লেজ বা পিছোপিছি (Face-out or Tail to Tail system) পদ্ধতিতে উভয় সারির মাথা বহির্মুখী থাকে।

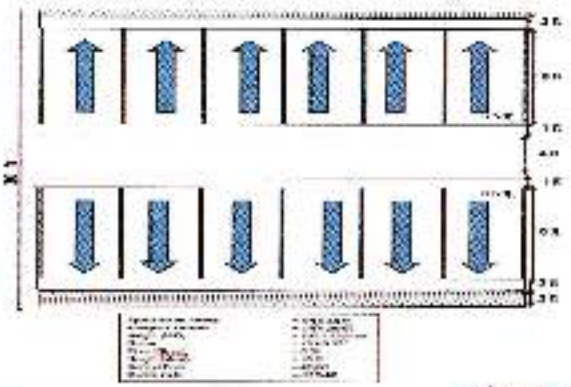

গাভীর বাসস্থান ঃ

গাভীর বাসস্থানকে গোশালা বলে। এদেশে গোয়াল ঘরও বলা হয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দুটি পদ্ধতিতে গাভী পালন করা হয়, যথা- ক) চারণভূমিতে গরু চরানোর মাধ্যমে ও খ) গোশালায় বেঁধে রেখে খাদ্য পরিবেশন ও মলমূত্র নিষ্কাশনের মাধ্যমে। আমাদের দেশে গোশালা বা গোয়াল ঘরে গাভী প্রতিপালনই এদেশে গাভী পালনের পদ্ধতি হিসেবে সমাদৃত। এ গোশালা বাড়ির অনতিদূরে (৪৫-৬০ মিটার) একটি উঁচু জায়গায় নির্মাণ করা শ্রেয়, যাতে দুর্গন্ধ ও গরুর মলমূত্র থেকে মানুষের সমস্যা সৃষ্টি না হয়। গোশালার উচ্চতা ১০ ফুট হতে হবে। খাদ্য পরিবেশনের জন্য চাড়ি বা গামলা ও পানির পাত্র গোশালায় থাকতে হবে। গোশালার প্রতিটি গাভীর জন্য আড়গড়া (chute) থাকে যেখানে গাভী বেঁধে রাখতে হয়। খাবারের চাড়ি পাকা কনক্রিট ও আড়গড়া মজবুত লোহার রড বা বাঁশ দিয়ে তৈরি করতে হয়।

গাভীর বাসস্থান বা ঘর তৈরি করার সময় বিবেচ্য বিষয়গুলো হল-

- গাভীর ঘর পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা হলে বা দক্ষিণমুখী হওয়া আবশ্যক যাতে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস চলাফেরা করে।
- ঘরের মেঝে পাকা এবং খসখসে হবে। এতে গাভী পা পিছলে পড়ে যাবার সম্ভাবনা কম থাকে।
- ঘরের মেঝে ঢালু হবে এবং নিষ্কাশন ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে করে গোবর, চনা ইত্যাদি সহজে পরিষ্কার করা যায়।

গাভীর বাসস্থান

- ঘরের চাল এসবেস্টস, ছন বা বাঁশ দিয়ে তৈরি করা যেতে পারে। তবে টিন ব্যবহার করলে গরমের দিনে ঘর যাতে উত্তপ্ত না হয় সেজন্য টিনের নিচে চাটাই এর ব্যবস্থা করতে হবে।

বাছুরের বাসস্থান ঃ

সাধারণত জন্মের পর থেকে এক বছরের কিছু বেশি বয়সের গরু মহিষের বাচ্চাই বাছুর নামে পরিচিত। প্রতিটি বড় বাছুরের জন্য ৫ ফুট × ৭ ফুট = ৩৫ বর্গফুট জায়গার ভিত্তিতে বাছুরের বাসস্থান তৈরি করা হয়। এ বাসস্থানে প্রচুর আলো বাতাসের ব্যবস্থা থাকতে হবে। এ বাসস্থান কাঁচা অথবা পাকা হতে পারে। এতে বাছুরের মলমূত্র নিষ্কাশনের যথাযথ ব্যবস্থা থাকতে হবে। প্রতিটি ঘরে ছোট ছোট খোপ (calf pen) তৈরি করে প্রতি খোপে একটি করে বাছুর রেখে পালন করা যায়। সেক্ষেত্রে এ খোপগুলোর প্রতিটির পরিসর হবে ৩ ফুট × ৪ ফুট × ৩.৫ ফুট। অন্যদিকে, একটি নির্দিষ্ট আলো-বাতাস ব্যবস্থা সম্পন্ন ঘরে একসাথে সমবয়সী ৫-১০ টি বাছুর পালন করা যায়। তবে উভয় ক্ষেত্রেই ঘরের সামনে বেড়া দিয়ে ঘেরা খোলা জায়গা থাকা দরকার যাতে বাছুর আরাম ও খেলাধুলা করতে পারে। বাছুরের খোপে খড়বিচালি দিয়ে বিছানা তৈরি করতে হবে। মেঝে পাকা হলে ২.৫৪ সেন্টিমিটার বা এক ইঞ্চি পুরু বিছানার প্রয়োজন হয়। মেঝে কাঁচা হলে তা যেন কর্দমাক্ত ও স্যাঁতস্যাঁতে না হয় সে ব্যবস্থা করতে হবে। কেননা স্যাঁতস্যাঁতে ও নোংরা পরিবেশে বাছুর ফুসফুস প্রদাহ (pneumonia) রোগে ভুগে থাকে। এ রোগ বাছুরের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়। ১.৫-২.০ মাস বয়সের বাছুরকে বড় বাছুরের বাসস্থানে স্থানান্তর করা উচিত।

ডেইরি প্রাণির খাদ্য ব্যবস্থাপনা

বিভিন্ন পশুর দৈহিক প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের খাদ্যের প্রয়োজন হয়। পশুখাদ্য নিম্নোক্ত কারণে গুরুত্বপূর্ণ-

- স্বাস্থ্য সংরক্ষণ (maintenance) ঃ পশুর দেহের তাপ সংরক্ষণ, শক্তি উৎপাদন, ক্ষয়পূরণ, রোগ প্রতিরোধ ও সর্বোপরি জীবন ধারণের জন্য খাদ্য অপরিহার্য।
- দৈহিক বৃদ্ধিসাধন (growth) ঃ বাড়ন্ত পশুর সুষ্ঠুভাবে দৈহিক বৃদ্ধির জন্য খাদ্য আবশ্যক।
- বাচ্চা উৎপাদন (reproduction) ঃ পশু সময়মত গরম হওয়া, গর্ভধারণ, বাচ্চা প্রসব তথা পশুর উর্বরতা রক্ষার জন্য সুষম খাদ্যের প্রয়োজন। এছাড়া গর্ভবতী পশুর গর্ভস্থ বাচ্চার দৈহিক বৃদ্ধির জন্য খাদ্যের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ।

- দুধ উৎপাদন (milk production) : পশুর দুধ উৎপাদনের পরিমাণের উপর পশুখাদ্যের উপাদান ও পরিমাণ বৃদ্ধি আবশ্যক। অর্থাৎ গাভীকে খাদ্য সরবরাহের উপর তার পরিমাণ ও মান নির্ভর করে।
- প্রাত্যহিক কর্মক্ষমতা (daily work) : পশুর কাজের ধরন ও পরিশ্রমের উপর পশুখাদ্য সরবরাহ প্রয়োজন। অর্থাৎ পশুশক্তি ব্যবহারের প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যের দরকার পড়ে।
- মাংস ও উল উৎপাদন (meat and wool production) : পশুর মাংস ও উল প্রোটিনযুক্ত। তাই উৎপাদনের মাংস ও উলের জন্য উপযুক্ত খাদ্য সরবরাহ প্রয়োজন।

গাভীর খাদ্য ও পুষ্টি ব্যবস্থাপনা

গাভীর সুষম খাদ্য তৈরির উপকরণ ও নিয়মাবলী

খড়: গাভীকে দৈনিক ২-৩ কেজি খড় খাওয়ানো প্রয়োজন। খড়কে ছোট কেটে বড় চাড়ির মধ্যে পানিতে ভিজিয়ে এতে প্রত্যেক জনীয় পরিমাণ দানাদার খাদ্য ও ৩০০-৪০০ গ্রাম চিটাগুড় খাওয়ালে খড়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

কাঁচা ঘাস: ১টি দেশী গাভীর জন্য ১০-১২ কেজি এবং শংকর জাতের গাভীর জন্য ১২-১৫ কেজি সবুজ ঘাস সরবরাহ করা একান্ত প্রয়োজন।

দানাদার খাবার: খড় ও কাঁচা ঘাস ছাড়া দৈনিক পুষ্টিকর দানাদার খাদ্য গরুকে সরবরাহ করতে হবে।

গাভীর জন্য দানাদার খাদ্য মিশ্রন

গমের ভুষি-৫০%, চাউলের কুড়া-২০%, খেসারী ভাঙ্গা-১৮%, তিল বা বাদামের খৈল-১০%, খনিজ মিশ্রন-১%, লবণ-১% গাভীকে দৈনিক প্রদেয় দানাদার খাদ্যের পরিমান বাছুর: বয়স অনুসারে ০.৫০ হতে ১.০ কেজি/দিন

দুগ্ধবতী গাভী: দেশি গাভীর জন্য প্রতিদিন ১.৫-২.০ কেজি কেজি এবং উন্নত জাতের গাভীর জন্য প্রতিদিন ৩.০-৪.০ কেজি। এছাড়া গাভী প্রতিদিন ৩.০ লিটারের বেশি দুধ প্রদান করলে প্রতি ২.৫ লিটার অতিরিক্ত দুধ উৎপাদনের জন্য ১.০ কেজি অতিরিক্ত দানাদার খাদ্য প্রদান করতে হবে। গর্ভবতী গাভীর খাদ্য ব্যবস্থাপনা স্বাভাবিক অবস্থায় ৬ মাস বা তদোধিক গর্ভবতী গাভীকে দৈনিক অতিরিক্ত খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। এ সময় বাছুরের বৃদ্ধি ও হাড় গঠনের জন্য দৈনিক ৫০ মিলি: হারে ক্যালসিয়াম জাতীয় ভিটামিন প্রদান করা যেতে পারে।

গর্ভবতী গাভীর দৈনিক সুষম খাদ্যের তালিকা:

খাদ্য উপকরণ	পরিমাণ
কাঁচা ঘাস	১২-১৫ কেজি
দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ	৩ কেজি
শুকনা খড়/দিন	৩-৪ কেজি
বিশুদ্ধ খাবার পানি	পর্যাপ্ত পরিমাণ

গর্ভবতী গাভীর দানাদার খাদ্য মিশ্রণ

খাদ্য উপকরণ	পরিমাণ
গমের ভুষি	৫৬%
চালের কুড়া	১৫%
খৈল	১২%
পরিষ্কার পানি	পর্যাপ্ত পরিমাণ
খেসারী	১৩%
খনিজ দ্রব্য	৩%
এবং লবণ	১%

গরুর খাদ্য ব্যবস্থাপনা :

আমাদের দেশীয় গরুর খাদ্য ব্যবস্থাপনার প্রতি সাধারণত তেমন কোন গুরুত্ব দেয়া হয় না। ফলে এদের নিকট থেকে আশানুরূপ উৎপাদনও পাওয়া যায় না। অথচ গরুকে পর্যাপ্ত কাঁচা ঘাস, পরিমিত প্রক্রিয়াজাত খড়, দানাদার খাদ্য (কুড়া, গমের ভুষি, চাউলের খুদ, খৈল, কলাই, মটর, খেসারী, কুড়া ইত্যাদি), পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ এবং স্বাস্থ্যসম্মত আবাসন ব্যবস্থা, নিয়মিত কৃমিনাশক চিকিৎসা ও টিকা প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হলে এদের উৎপাদন অনেকাংশে বৃদ্ধি করা যায়। আমাদের দেশে গবাদি পশুর সবচেয়ে সহজলভ্য ও সাধারণ খাদ্য হল খড় যার ভিতর আমিষ, শর্করা ও খনিজের ব্যাপক অভাব রয়েছে। বর্তমানে খড়কে ইউরিয়া দ্বারা প্রক্রিয়াজাত করলে তার খাদ্যমান বহুগুণে বেড়ে যায়।

পানি ঃ দেহ কোষে শতকরা ৬০- ৭০ ভাগ পানি থাকে। তাই কোন প্রাণি খাদ্য না খেয়েও কিছু দিন বাঁচতে পারে, কিন্তু পানি ছাড়া মাত্র কিছু দিনের বেশী বাঁচে না। সাধারণত দেহ থেকে পানির ক্ষয় হয় মলমূত্র ও শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে। অপরদিকে পানি অর্জিত হয় পানি পান করে, রসালো খাদ্য গ্রহণ করে এবং দেহের ভিতর বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের অক্সিডেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। দেহের বেশির ভাগ অংশ পানি দ্বারা গঠিত। গাভীকে প্রচুর পরিমানে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হবে। একটি দুধাল গাভীকে দৈনিক ৩০-৪০ লিটার পানি সরবরাহ করতে হবে।

প্রাণির দেহে পানির কাজ ঃ

- খাদ্যতন্ত্রের মধ্যে খাদ্য বস্তু নরম ও পরিপাকে সহায়তা করে।
- খাদ্যতন্ত্রের মধ্যে পুষ্টি উপাদান তরল করে দেহের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পরিবহণ করে।
- দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ করে ও দেহকে সতেজ রাখে।
- দেহের ভিতরের দূষিত পদার্থ অপসারণ করে।
- দেহের গ্রন্থি হতে নিঃসৃত রস, হরমোন, এনজাইম এবং রক্ত গঠনে ভূমিকা রাখে।

গবাদিপ্রাণির খাদ্যকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যেমন ঃ

১. আঁশ বা ছোবড়া জাতীয় খাদ্য, যেমন ঃ খড়, সবুজ ঘাস বা কাঁচা ঘাস, ইত্যাদি

২. দানাদার জাতীয় খাদ্য, যেমন ঃ চালের কুঁড়া, গমের ভুষি, খেসারি ভাঙ্গা, তিল বা বাদাম খৈল, ইত্যাদি

৩. সহযোগী অন্যান্য খাদ্য যেমন ঃ খনিজ উপাদান, ভিটামিন, ইত্যাদি

শুকনা খড় ঃ

একটি দেশী গাভীকে দৈনিক ৩ কেজি খড় খাওয়াতে হয়। উন্নত সংকর জাতের একটি গাভীর জন্য দৈনিক ৪ কেজি খড় প্রয়োজন হয়। খড় কেটে ও কাটা খড়ের সাথে ১০% চিটাগুড় মিশিয়ে খাওয়ালে পুষ্টির মান বেড়ে যায়। খড়ে প্রোটিনের মান বাড়ানোর জন্য ইউরিয়া-মোলাসেস-খড় প্রক্রিয়াজাত করে খাওয়াতে হবে,

সবুজ কাঁচা ঘাস ঃ

গাভীর সুষম খাদ্যের প্রধান অংশ সবুজ কাঁচা ঘাস। কাঁচা ঘাস গাভীর দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি করে। তাই দুগ্ধবতী গাভীর খাদ্যে প্রতিদিন ১০-১২ কেজি কাঁচা ঘাস অবশ্যই যোগ করতে হবে। একটি উন্নত সংকর জাতের গাভীকে দৈনিক ১৫ কেজি সবুজ কাঁচা ঘাস খাওয়াতে হয়।

দানাদার খাদ্য মিশ্রণ ঃ

গাভীর প্রথম ৩ লিটার দুধের জন্য ৩ কেজি এবং পরবর্তী ৩ লিটারের জন্য ১ কেজি হারে দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। দানাদার খাদ্য মিশ্রণের তালিকা ঃ

(ক) চালের কুঁড়া	২ কেজি
(খ) গমের ভুষি	৫ কেজি
(গ) খেসারি ভাঙ্গা	১.৮ কেজি
(ঘ) তিল বা বাদাম খৈল	১ কেজি
(ঙ) লবণ	০.১ কেজি
(চ) খনিজ মিশ্রণ	০.১ কেজি
মোট	১০ কেজি

গাভীর দৈনন্দিন খাদ্য প্রস্তুত করার সময় নিম্নে বর্ণিত বিষয় বিবেচনায় এনে খাদ্য তৈরী করতে হবে ঃ

১. গাভীর খাদ্য সুষম হতে হবে, অর্থাৎ খাদ্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানসমূহ সঠিক মাত্রায় থাকতে হবে

২. খাদ্য অবশ্যই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে লাভজনক হতে হবে। অর্থাৎ সহজ প্রাপ্য এবং দাম কম এরূপ উপকরণ দিয়ে খাদ্য প্রস্তুত করতে হবে।

৩. একটি দেশী গাভীর চেয়ে উন্নত জাতের একটি গাভী অনেক বড় হয়। দুধও বেশী দেয় এবং সেজন্য খায়ও বেশী। তাই খাদ্য প্রদানের সময় খেয়াল রাখতে হবে, যাতে গাভীর পেট ভরে এবং পুষ্টির অভাবও পূরণ হয়

৪. গাভীর খাদ্যেরা টাটকা ও পরিষ্কার হতে হবে। ময়লা, কাঁকড়, পাথর, বালু, মাটি, ছাতাপড়া দুর্গন্ধযুক্ত খাদ্য, গাভীকে দেওয়া যাবে না

৫. কাঁচা ঘাসে প্রচুর খনিজ উপাদান ও ভিটামিন থাকে যা সহজে হজম হয়। তাই গাভীকে দৈনিক প্রয়োজনীয় কাঁচা ঘাস খাওয়াতে হবে।

৬. গাভীর দেহ গঠনে, দুধ উৎপাদনে, গর্ভধারণে, বাচ্চা উৎপাদনে এ উপাদানটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাই দুগ্ধবতী গাভীর খাদ্যে প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ ও খাদ্য উপাদান সরবরাহ করতে হবে।

৭. দানাদার খাদ্যের সাথে নিয়মিত ভিটামিন ও খনিজ মিশ্রণ মিশিয়ে খাওয়ালে এগুলোর অভাব হবে না।

৮. আঁশ বা খোসা জাতীয় খাদ্য যেমনঃ খড়, কাঁচা ঘাস, গাছপাতা ইত্যাদি আস্ত না দিয়ে ছোট ছোট করে কেটে গাভীকে খাওয়াতে হবে। এতে খাদ্য দ্রব্যের অপচয় হবে না। গাভীর খেতে সুবিধা হবে এবং হজমেও সহায়ক হবে

৯. খড় কুচিকুচি করে কেটে পানিতে ভিজিয়ে অন্যান্য দানাদার মিশ্রণ ও চিটাগুড় মিশিয়ে দিলে গাভী খেতে অধিক পছন্দ করবে এবং সহজে পাচ্য হবে।

১০. খাদ্য উপকরণ হঠাৎ করে পরিবর্তন করা উচিত নয়। খাদ্য উপকরণের পরিবর্তন প্রয়োজন হলে আস্তে আস্তে করতে হবে।

গবাদি প্রাণীর খাদ্যে দৈনিক খড়, কাঁচা ঘাস ও ইউ.এম.এস সরবরাহের পরিমান ঃ

- ৩ কেজি কাঁচা ঘাস = ১ কেজি খড়।
- প্রাপ্ত বয়স্ক একটি গরুকে ৮ কেজি খড় সরবরাহ করা প্রয়োজন
- ১-৩ বছরের একটি গরুকে ৩ কেজি খড় সরবরাহ করা প্রয়োজন।
- ১ বছরের নিচে একটি গরুকে ১ কেজি খড় সরবরাহ করা প্রয়োজন।
- প্রাপ্ত বয়স্ক একটি গরুকে ১৫-২০ কেজি কাঁচা ঘাস সরবরাহ করা প্রয়োজন।
- ১-৩ বছরের একটি গরুকে ১০ কেজি কাঁচা ঘাস সরবরাহ করা প্রয়োজন।
- ১ বছরের নিচে একটি গরুকে ৩ কেজি কাঁচা ঘাস সরবরাহ করা প্রয়োজন।
- প্রাপ্ত বয়স্ক একটি গরুকে ২-৩ কেজি ইউ.এম.এস (প্রক্রিয়াজাত খড়) সরবরাহ করা প্রয়োজন।

দুগ্ধবতী গাভীকে দৈনিক দানাদার খাদ্য সরবরাহের পরিমান ঃ

একটি গাভীকে প্রথম ৫ লিটার দুধ উৎপাদনের জন্য ৩ কেজি দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। পরবর্তী প্রতি এক লিটার দুধ দুধ উৎপাদনের জন্য ০.৫০ কেজি হারে সর্বমোট ৮ কেজি দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

প্রাণিকে ইউ.এম.এস খাওয়ানো সুবিধা ঃ

- ইউ.এম.এস ৬ মাসের উর্দ্ধে বাছুর গরু থেকে শুরু করে সকল বয়সের গরুকে এদের চাহিদা মত খাওয়ানো যায়।
- শুধু ইউ.এম.এস খাওয়ালেও গরুর ওজন বৃদ্ধি পায়।
- ইউ.এম.এস তৈরীর পদ্ধতি সহজ। একজন শ্রমিক প্রায় ৫০০-৬০০ কেজি খড় তৈরী করতে পারেন।
- গবেষণা করে দেখা গেছে যে, এ পদ্ধতিতে খড়ের সাথে ১.০০ টাকার মোলাসেস খাইয়ে প্রায় ৫.০০ থেকে ৭.০০ টাকার গরুর মাংস উৎপাদন সম্ভব।
- যেহেতু ইউরিয়া ও মোলাসেস খড়ের সাথে ধীরে ধীরে যাচ্ছে, তাই প্রাণির বিষক্রিয়া হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

- কৃষক তার দৈনিক চাহিদা মত খড় প্রস্তুত করে প্রতিদিন খাওয়াতে পারেন। তবে প্রক্রিয়াজাত খড় তিন দিনের বেশী সংরক্ষণ করে রাখা যাবে না। কেননা তিন দিনের বেশী সংরক্ষণ করলে এর গুণগত মান কমে যাবে।

প্রাণিকে ইউ.এম.এস খাওয়ালে অসুবিধা

- ইউ.এম.এস পদ্ধতিতে ইউরিয়া মোলাসেস খাওয়ানোর তেমন কোন অসুবিধা নেই। তবে ছয় মাসের কম বয়সের বাছুরকে ইউ.এম.এস খাওয়ানো যাবে না।

প্রাণিকে ইউ.এম.এস খাওয়াতে সাবধানতা অবলম্বন ঃ

- ইউ.এম.এস তৈরী করার সময় অবশ্যই ইউরিয়া-মোলাসেস-খড় ও পানির অনুপাত ঠিক রাখতে হবে।
- ইউরিয়ার মাত্রা কোন অবস্থাতেই বাড়ানো যাবে না। ইউ.এম.এস এর গঠন পরিবর্তন করলে কাঙ্খিত ফল পাওয়া যাবে না

প্রাণিকে কোন কোন অবস্থায় ইউ.এম.এস খাওয়ানো যাবে না ঃ

নিম্ন বর্ণিত অবস্থায় প্রাণিকে ইউ.এম.এস খাওয়ানো যাবে না -

- ৬ মাসের কম বয়সের বাছুর গরুকে।
- অসুস্থ পশুপ্রাণিকে
- প্রাণিকে সালফার জাতীয় ঔষধ খাওয়ানোর পর অন্ততঃ পরবর্তী ১৫-৩০ দিন।
- গর্ভবতী গাভীর গর্ভকালীন অবস্থার শেষের দিকে।
- যে সকল প্রাণি ইউ.এম.এস. খাওয়ালে প্রায়ই অসুবিধা বোধ করে বা এলার্জি দেখা দেয়।

খাদ্য ব্যবস্থাপনায় পশুর অন্যান্য যত্ন ঃ

খাদ্য পরিবেশনার উপরও গরুর খাদ্য গ্রহণের তারতম্য হয়। যেমন ঃ

- নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিদিন খাদ্য সরবরাহ করা।
- গরুর সম্মুখে সর্বদা খাদ্য রাখা।
- খাদ্য সরবরাহের আগে অবশ্যই পাত্র পরিষ্কার করা।
- দানাদার খাদ্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ মেপে ২ বারে (সকালে ও বিকালে) পরিবেশন করা।
- দানাদার খাদ্য শুকনা অবস্থায় ভিজিয়ে খেতে অভ্যস্ত হলে সেভাবে দেয়া।
- শুকনা দানাদার খাদ্য দিলে খাদ্য গ্রহণের পরপরই পানি দেয়া।
- খড় কেটে ভিজিয়ে পরিবেশন করলে কম নষ্ট হয় এবং খাদ্যের গ্রহণ হারও বাড়ে।
- খাদ্য অবশ্যই মাটি/বালি মুক্ত থাকে, খাদ্য পচা, বাসি, অতি পুরাতন না হওয়া।

গাভীর প্রজনন, গর্ভকালীন পরিচর্যা ও নবজাত বাছুরের পরিচর্যা

গবাদি পশুর বংশ বিস্তারের জন্য প্রজনন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রজনন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় ব্যাঘাত ঘটলে বাচ্চা ও দুধ উৎপাদন ব্যাহত হবে। বাংলাদেশে দুগ্ধ খামারে প্রজনন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো বন্ধ্যাত্ব। বন্ধ্যাত্ব হলে গাভী সময়মত গরম হবে না, বীজ দিলে গর্ভধারণ করবে না। এক্ষেত্রে বাচ্চা দিলে ঋতুচক্র প্রদর্শন করতে সময় বেশি লেগে যাবে ইত্যাদি। দুগ্ধ খামারে এ সকল সমস্যার যে কোন একটি দেখা দিলে উক্ত দুগ্ধ খামার থেকে লাভ করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। তাই গাভী/বকনা এর প্রজনন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে খামার মালিকদের সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন।

একটি আদর্শ বকনা/গাভীর বৈশিষ্ট্য ঃ

- একটি আদর্শ বকনা/গাভীর জন্য জন্মের পর থেকেই বাছুরকে সুষ্ঠু পরিচর্যা করা হলে দেশী জাতের বকনা বাছুর ২৪-৩৬ মাস এবং সংকর জাতের বকনা বাছুর ১০-১৮ মাস বয়সে থেকেই ডাকে আসে। তবে বকনা বাছুরকে প্রথম প্রজননের জন্য তার বয়স ১৮-২২ মাস না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা উত্তম।

- সুস্থ অবস্থায় বকনা/গাভীর ডাক থাকে ১২-২৪ ঘন্টা, তবে ১২-১৮ ঘন্টার মধ্যে প্রজনন করা উত্তম
- বকনা/গাভী গর্ভধারন না করলে দুই ঋতুচক্রের ব্যবধান হবে ২১ দিন।
- বকনা/গাভী গর্ভধারণের/গর্ভকালীন সময় হবে ২৮০ (+-) ১০ দিন।
- জন্মের সময় বাছুরের ওজন হবে ১৫-১৮ কেজি।
- বাচ্চা প্রসবের পর গাভীর দুধ প্রদানের সময়কাল হবে ২৮৫-৩০৫ দিন।
- বাছুর এর দুধ সেবনকাল হবে ১৮০ দিন।
- প্রসব পরবর্তী প্রথম প্রজননের সময় হবে ৬০-৯০ দিন।
- বাচ্চা প্রসবের পর গাভীর পরবর্তী বাচ্চা উৎপাদনকাল হবে ৩৭৫-৪০০ দিন।

বকনা/গাভী ডাকে আসা/গরম হওয়ার লক্ষণ ঃ

- বকনা/গাভী অস্থির থাকবে এবং এক জায়গায় দাঁড়িয়ে না থেকে ছটফট করবে।
- বকনা/গাভীকে খুব সতর্ক মনে হবে এবং কান খাড়া রেখে সতর্কতা প্রকাশ করবে।
- ঘন ঘন হাম্বা হাম্বা করে ডাকবে।
- ডাকে আসা বকনা/গাভী অন্য পশুর উপর লাফিয়ে উঠার প্রবণতা দেখা দেবে।
- ঘন ঘন ও অল্প অল্প প্রস্রাব করবে।
- খাদ্য গ্রহনের প্রতি অনিহা প্রবন থাকবে।
- বার বার লেজ নাড়া বা লেজ ডানে/বামে সরিয়ে নেবে।
- যোনি মুখ হালকা ফুলে যাবে বা ঈষৎ লাল হবে।
- যোনির পথ দিয়ে জেলীরমত স্বচ্ছ শ্লেষ্মা বা মিউকাস বের হবে।
- দুধাল গাভী ডাকে আসার সময় স্বাভাবিক এর চেয়ে দুধ কম দেবে।

গাভীর প্রজনন কার্যক্রম ঃ

যে কোন প্রাণির বংশ বিস্তার ঘটে প্রজননের মাধ্যমে। এই প্রজনন প্রক্রিয়া দু'টি পদ্ধতিতে করা যেতে পারে -

১. প্রাকৃতিক প্রজনন পদ্ধতি - এই পদ্ধতিতে ষাড়ের দ্বারা গাভীকে সরাসরি প্রজনন করা হয়।

২. কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি - এই পদ্ধতিতে ষাঁড় থেকে সরাসরি বীজ সংগ্রহ করে গবেষণাগারে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণ করা হয়। পরবর্তীতে গাভী গরম হলে উক্ত বীজ দিয়ে কৃত্রিমভাবে গাভীকে প্রজনন করা হয়।

কৃত্রিম প্রজননের সুবিধা ঃ

- উন্নত জাতের ষাঁড়ের সিমেন/বীজ দিয়ে দ্রুত এবং ব্যাপক ভিত্তিতে প্রাণীর উন্নত জাত তৈরী করা সম্ভব হয়
- এ পদ্ধতিতে শুক্রাণুর গুনাগুণ পরীক্ষা করা সম্ভব হয় এবং অনুর্বর ষাঁড় বাতিল করতে সহজ হয়।
- ষাঁড়ের জন্মগত ও বংশগত রোগ বিস্তার প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়
- একটি ষাড় থেকে একবার সংগৃহীত সিমেন/বীজ দ্বারা ১০০-৪০০ গাভী প্রজনন করানো যায়, ফলে বাড়তি ষাঁড় পালনের প্রয়োজন হয় না।
- কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে কম খরচে অনেক বেশী গাভীকে পাল দেয়া যায়। গবেষণায় দেখা গেছে একটি ষাঁড়ের সারা জীবনের সংগৃহীত সিমেন/বীজ দ্বারা প্রায় ১-১.৫ লক্ষ গাভীকে প্রজনন করা সম্ভব হয়।
- প্রজনন কার্যক্রম সহজ হয়, অর্থাৎ যে কোন সময় যে কোন স্থানে কৃত্রিম প্রজনন করা যায়।
- প্রাকৃতিক উপায়ে প্রজননে ষাঁড়ের মাধ্যমে একটি গাভী থেকে অন্যান্য গাভীর মধ্যে বিভিন্ন যৌন রোগ সংক্রমিত হতে পারে। কিন্তু কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে গাভীর যৌন রোগ সংক্রমন সহজেই রোধ করা সম্ভব হয়।
- নির্বাচিত ষাঁড়ের সিমেন/বীজ দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায় এবং প্রয়োজনমত যে কোন সময় ব্যবহার করা যায়।
- বিদেশ থেকে উন্নত জাতের ষাঁড় না এনে প্রয়োজনে অল্প খরচে উক্ত ষাঁড় এর সিমেন/বীজ আমদানী করা যায়।
- প্রাকৃতিক প্রজননে অক্ষম উন্নত জাতের ষাঁড় থেকেও সিমেন সংগ্রহ করে তা ব্যবহার করা যায়।
- ষাঁড় ও গাভীর দৈহিক ও অসামঞ্জস্যতার কারণে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে সম্ভাব্য সংগঠিত দুর্ঘটনা এড়ানো যায়।

কৃত্রিম প্রজননের উপকারিতা ঃ

- প্রাকৃতিক প্রজননে সম্ভাব্য যৌন রোগ থেকে গাভীকে রক্ষা করা যায়।
- সহজেই উন্নত জাতের বাছুর উৎপাদন করে অধিক দুধ/মাংশ উৎপাদন করা যায়।

কৃত্রিম প্রজননের সীমাবদ্ধতা ঃ

- সুষ্ঠু প্রজননের জন্য সিমেন/বীজ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহারে দক্ষ জনশক্তির প্রয়োজন হয়।
- গর্ভবতী গাভীকে ভুলক্রমে জরায়ুর গভীরে প্রজনন করালে গর্ভপাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- গাভীর উত্তেজনা কাল সুষ্ঠুভাবে নির্ণয় করতে হয়
- প্রজননের জন্য রক্ষিত ষাঁড়ের জন্য বিশেষ পরিচর্যার প্রয়োজন হয়।
- কৃত্রিম প্রজনন কাজের জন্য সহায়ক গবেষণাগারের প্রয়োজন হয়।

প্রজনন পরবর্তী নজরদারী ঃ

বকনা/গাভীকে প্রজনন করার পর পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। প্রজননকৃত প্রাণীটি যদি গর্ভধারণ করে থাকে তাহলে এক ধরণের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করবে। আর যদি গর্ভধারণ না করে থাকে তা হলে ২১ দিন পর পুনরায় ডাকে আসার সকল বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করবে। অনেক সময় বকনা/গাভী গর্ভধারণও করেনা আবার হিটেও আসেনা, বরং গর্ভধারণের বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রকাশ করে। তাই বকনা/গাভী গর্ভধারণ করেছে কি না তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য প্রজননকৃত বকনা/গাভীকে ৩ মাস পর ভেটেরিনারি হাসপাতালে নিয়ে গর্ভ পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে হবে। গর্ভধারণ না করলে খাবার এবং চিকিৎসার মাধ্যমে পুনরায় হিটে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। আর গর্ভধারণ করলে গর্ভবতী বকনা/গাভীর সুষ্ঠু পরিচর্যা করতে হবে।

গর্ভবতী বকনা/গাভীর পরিচর্যা ঃ

- ➢ গর্ভবতী বকনা/গাভীকে সুষ্ঠু পরিচর্যা করা হলে তার স্বাভাবিক প্রসব, পূর্ণ মাত্রায় দুধ উৎপাদন ও পরবর্তীতে সময়মত ডাকে আসা ও গর্ভধারণ করার সম্ভাবনা থাকে।
- ➢ গর্ভধারণের ৭ মাস পর্যন্ত তার খাদ্য, দুধ দোহন ও অন্যান্য পরিচর্যা স্বাভাবিক নিয়মে চলবে।
- ➢ গর্ভধারণের ৭ মাস পর থেকে গর্ভবতী বকনা/গাভীকে অন্যান্য প্রাণী থেকে পৃথক করে পর্যাপ্ত আলো বাতাসপূর্ণ ঘরে রাখতে হবে যাতে প্রাণীটি উক্ত ঘরে সহজেই নড়াচড়া করতে পারে।
- ➢ গর্ভবতী বকনা/গাভী যেন পড়ে গিয়ে আঘাত না পায় বা তার উপর অন্য কোন প্রাণি লাফিয়ে না উঠে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- ➢ গর্ভবতীর প্রাণির স্বাভাবিক প্রসব ও দুধ উৎপাদনের জন্য ভেটেরিনারী ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে গর্ভবতী বকনা/গাভীর অবস্থার উপযোগী খাদ্য, দুধ দোহন ও অন্যান্য পরিচর্যার ব্যবস্থা করতে হবে।
- ➢ অতিরিক্ত ঠান্ডা ও গরম থেকে গর্ভবতী বকনা/গাভীকে রক্ষা করতে হবে।
- ➢ ঘরের মেঝেতে শুকনা পরিষ্কার খড় সুন্দরভাবে বিছিয়ে দিতে হবে, যাতে প্রাণীটি আরাম করে শুতে পারে। ঘরের মেঝেতে এ জন্য প্রয়োজনে ভেজা মাটি ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ➢ মশা-মাছির উপদ্রব হতে প্রাণীকে রক্ষা করতে হবে।
- ➢ গর্ভবতী বকনা/গাভীকে প্রত্যহ সবুজ কাঁচা ঘাস, দানাদার খাদ্য ও প্রচুর পরিমান পরিষ্কার পানি খাওয়াতে হবে।
- ➢ গর্ভবতী বকনা/গাভীকে শীতের সময় পানি কুসুম গরম করে খেতে দিতে হবে এবং গরমের দিন হলে
- ➢ প্রতিদিন গোসল করাতে হবে।

গর্ভকালের শেষের দিকে গাভীর দোহন বন্ধকরণ ও উহার সুফল ঃ

- দুগ্ধবতী গাভীকে গর্ভধারণের ৮ মাস পর্যন্ত দুধ দোহনের পর দোহন বন্ধ করতে হবে।

- এ সময়ে দুধের প্রবাহ বন্ধ না হলে দানাদার খাদ্য কিছুটা কমিয়ে দিতে হবে। প্রয়োজনে দুধ দোহন বন্ধ করার প্রথম ১-২ দিন খাদ্য তালিকায় মিশ্রিত দানাদার খাদ্য সরবরাহ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে হবে। তাহলে ওলানে দুধ প্রবাহে বন্ধ হতে সহায়তা করবে।
- দুধ দোহন বন্ধ করা না হলে নবজাত বাছুর অত্যন্ত নিস্তেজ ও দুর্বল হওয়া এবং গাভীর পরবর্তী দোহনে দুধ উৎপাদন হ্রাস পাবে।
- দুধ বন্ধ হলে পুনরায় পূর্বের ন্যায় মিশ্রিত দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। তবে প্রসবের প্রায় দুই সপ্তাহ পূর্ব হতে গাভীর খাদ্যের পরিমাণ আস্তে আস্তে হ্রাস করতে হবে এবং সহজে হজম হয় এমন খাদ্য খাওয়াতে হবে ও পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করতে হবে।
- গাভীর প্রতি প্রসবের ২/৩ দিন আগে থেকে ২৪ ঘন্টা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে

গাভীর প্রসবকালীন লক্ষণ ঃ

- গাভীর ওলান বড় হয়ে যাবে ও বাঁট দিয়ে দুধ জাতীয় তরল পদার্থ বের হবে।
- যোনিমুখ বড় হয়ে ফুলে যাবে এবং নরম ও ঢোলা থাকবে।
- পেট ঝুলে পড়বে ও লেজের গোড়ার দুই পাশের স্থানে গর্তের মত হবে
- যোনিমুখ দিয়ে আঠালো তরল পদার্থ নির্গত হবে ও গাভী ঘন ঘন প্রস্রাব করার চেষ্টা করবে।
- চূড়ান্ত পর্যায়ে স্বাভাবিক প্রসবের ক্ষেত্রে বাছুরের সামনের দুই পা ও নাক দেখা যাবে।

গাভীর প্রসবকালীন পরিচর্যা ঃ

➢ গাভীর যখন বাচ্চা প্রসবের সময় হয় তখন গাভীকে একটি উন্মুক্ত নির্দিষ্ট স্থানে রাখতে হবে।
➢ গাভীর প্রসবের স্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং পরিষ্কার শুকনা খড় বিছিয়ে দিতে হবে।
➢ গাভীকে লোক চোখের আড়ালে নিরিবিলি স্থানে রাখতে হবে এবং অন্য গরুর সাথে যেন মারামারি না করে তা খেয়াল রাখতে হবে
➢ প্রসবের সময় যেন কুকুর, বিড়াল, শিয়াল ইত্যাদি কাছে না আসে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
➢ স্বাভাবিক প্রসবের সময় প্রসূত বাচ্চার সামনের দু'পা তার মধ্যে মাথাসহ বেরিয়ে আসবে। তারপর সমস্ত শরীর বেরিয়ে বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হবে।
➢ প্রসবকালীন সময়ে গাভী বারবার উঠা-নামা করবে। এ সময় অতি সতর্কে বাছুরের সামনের দু'টি পা ও মাথাকে ধরে আস্তে আস্তে টেনে ভূমিষ্ঠ করাতে হবে।
➢ স্বাভাবিক প্রসব না হলে সাথে সাথে ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে আবশ্যক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
➢ প্রসব হয়ে গেলে বাছুরকে গাভীর সামনে দিতে হবে, যাতে গাভী বাছুরের শরীর চেটে পরিষ্কার করতে পারে।

প্রসব পরবর্তী গাভীর যত্ন ও পরিচর্যাঃ

- প্রসবের পর গাভীর পিছনের অংশ জীবাণুনাশক মিশ্রিত পানি দিয়ে ভালভাবে পরিষ্কার করতে হবে
- আবহাওয়া বেশী ঠান্ডা হলে গাভী ও বাছুরের জন্য উষ্ণতার ব্যবস্থা করতে হবে
- প্রসবের পরপরই একটি বালতিতে কুসুম গরম পানির সাথে দেড় কেজি গমের ভূষি, আধা কেজি চিটাগুড়, ৫০ গ্রাম লবন মিশিয়ে গাভীকে খেতে দিতে হবে। এরূপ খাদ্য খাওয়ালে গাভীর গর্ভফুল তাড়াতাড়ি পড়ে যেতে সহায়তা করবে। তাছাড়া কুসুম গরম পানিতে শুধু খোলাগুড় মিশিয়েও গাভীকে খাওয়ানো যেতে পারে।
- প্রসবের পরপরই ওলান ঈষৎ উষ্ণ পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে বাছুরকে শাল দুধ খাওয়াতে হবে। গাভীর শাল দুধে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম থাকে। শাল দুধের সাথে অধিক পরিমাণে ক্যালসিয়াম বের হয়ে যাওয়ার ফলে গাভীর ক্যালসিয়ামের অভাবজনিত রোগ মিল্ক ফিভার হতে পারে। এজন্য গাভীকে প্রচুর কাঁচা সবুজ ঘাস এবং খনিজ সমৃদ্ধ দানাদার খাদ্য খাওয়াতে হবে
- সাধারণত বাচ্চা জন্মানোর ৬-১২ ঘন্টার মধ্যে প্রসবকৃত গাভীর ফুল (Placenta) বের হয়ে যায়।
- স্বাভাবিকভাবে গর্ভফুল না পড়লে ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

- প্রসবের ২/১ দিন আগে থেকে রাতে পাহারা দিতে হবে, কেননা রাতে প্রসব হলে বাছুর ঠান্ডায় মারা যেতে পারে। গর্ভফুল পড়া মাত্র
- গাভী তা খেয়ে ফেলতে পারে। গাভী গর্ভফুল খেলে গাভীর স্বাস্থ্যহানী হবে ও দুধ উৎপাদন কমে যাবে।
- সময়মত ফুল (Placenta) পড়লে সাথে সাথে তা সরিয়ে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে।
- বাচ্চা প্রসবের ২ দিন পর থেকে গাভীকে নিয়মিত দানাদার খাদ্য খাওয়াতে হবে।

গবাদিপশুর কৃত্রিম প্রজনন

বংশ বিস্তারের মাধ্যম হল প্রজনন। প্রজননে গাভীর গর্ভে তার ডিম্বাণুর সাথে ষাঁড়ের শুক্রাণুর মিলনের ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উদ্ভব হয়। ভাল জাতের বীজ বপন করলে যেমন ভাল ফসল হয় তেমনি ভাল জাতের ষাঁড়ের সিমেন ভাল জাতের বাছুর উৎপাদনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। গবাদিপশুর জাত উন্নয়নের মাধ্যমে দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে হালচাষ ও পরিবহন শক্তি বৃদ্ধি অপরিহার্য। এজন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিকল্পিত পদ্ধতি অনুসারে প্রজনন কার্যক্রম পরিচালনা ও প্রজনন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন। সাধারণত গবাদিপশুর প্রজননের জন্য দুটি পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়।

- প্রাকৃতিক প্রজনন- এই পদ্ধতিতে কোন ষাঁড়ের দ্বারা সরাসরি গাভীকে প্রজনন করানো হয়।
- কৃত্রিম প্রজনন- ষাঁড়ের সিমেন বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে তা গরম হওয়া (হিটপ্রাপ্ত অবস্থায়) গাভীর জরায়ুতে প্রয়োগ করে গর্ভসঞ্চারণের পদ্ধতিকে কৃত্রিম প্রজনন বলা হয়। অর্থাৎ, কৃত্রিম প্রজনন হচ্ছে এমন একটি কৌশল যার মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে ষাঁড় থেকে বীর্য সংগ্রহ করা হয়, সংগৃহীত বীর্যের গুণাগুণ পরীক্ষা করা হয়, বীর্যকে তরল করা হয় এবং সঠিক উপায়ে স্ত্রী জননতন্ত্রের নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট পরিমাণ বীর্য প্রবেশ করানো হয়। কৃত্রিম প্রজননে দুই প্রকারের সিমেন ব্যবহার করা হয়। যথা-
  - ✓ তরল সিমেন: এই সিমেনের প্রতি মাত্রা থাকে এক মিলি যাতে ২০-৩০ মিলিয়ন শুক্রাণু থাকে। ৩ থেকে ৫° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় এই সিমেন ২-৩ দিন সংরক্ষণ করা যায়।
  - ✓ হিমায়িত সিমেন: এই সিমেন ধারনের জন্য ব্যবহৃত নলে ০.২৫ মিলিলিটার সিমেন থাকে। যাতে ২০-৩০ মিলিয়ন শুক্রাণু থাকে। এই সিমেন ১৯৬° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় তরল নাইট্রোজেনে ২০-২৫ বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণের বর্তমান পদ্ধতি

কৃত্রিম প্রজনন একটি আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য সম্প্রসারণ কার্যক্রমে নিয়োজিত উপজেলা, জেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা, কর্মচারীদেরকে অত্যন্ত সচেতন ও নিষ্ঠার সাথে যাবতীয় কার্য সম্পাদন করতে হয়। সেই সঙ্গে এ কার্যক্রমের তদারকী, নিয়ন্ত্রণ, মনিটরিং, রেকর্ড সংরক্ষণ ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হয়। অন্যথায় কৃত্রিম প্রজনন কর্মসূচির মাধ্যমে গবাদিপশুর ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন প্রক্রিয়া তথা গবাদিপশু উন্নয়নের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। গবাদিপশুর কৃত্রিম প্রজনন কর্মসূচি সফল বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিম্নবর্ণিত কর্মপদ্ধতি কার্যকরী করতে হয়-

- সাভারস্থ কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার, রাজশাহীস্থ দুগ্ধ ও গবাদিপশু উন্নয়ন খামার এবং কেন্দ্রীয় কৃত্রিম প্রজনন কার্যালয় যৌথভাবে প্রজনন নীতি অনুযায়ী প্রজনন ষাঁড় উৎপাদন করে হিমায়িত সিমেন উৎপাদন করেন এবং জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রে চাহিদা অনুসারে সরবরাহ করে তরল সিমেন উৎপাদনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।
- জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রের সহকারী পরিচালক তার কেন্দ্রের প্রজনন ষাঁড় সমূহের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, বিজ্ঞানসম্মত যত্ন পরিচর্যা, সিমেন উৎপাদন, সিমেন সংরক্ষণ, উপকেন্দ্র/পয়েন্টে সপ্তাহে ৩ দিন তরল সিমেন এবং মাসে ১ দিন প্রয়োজনে ২ দিন পর্যাপ্ত হিমায়িত সিমেন ও তরল নাইট্রোজেন সরবরাহ নিশ্চিত করেন। তিনি কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ কার্যক্রমের তদারকী, নিয়ন্ত্রণ, মনিটরিং, লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করেন।
- উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ কার্যক্রমে তার নিয়ন্ত্রণাধীন উপকেন্দ্র/পয়েন্ট সমূহ তদারকী, নিয়ন্ত্রণ, মনিটরিং, লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, রেকর্ড সংরক্ষণ ইত্যাদি দায়িত্ব একইভাবে পালন করেন এবং এ ব্যাপারে তিনি জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রের সহকারী পরিচালক এর নির্দেশ মোতাবেক কার্য সম্পাদন করেন।

❖ উপজেলায় কর্মরত সকল মাঠকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীকে প্রজননকৃত প্রতিটি প্রজননের জন্য এআই সার্টিফিকেট সঠিকভাবে পূরণ করতে হয়। গাভীর বাচ্চা জন্ম সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহে ও রেকর্ড সংরক্ষণে অংশগ্রহণ করতে হয়। কৃত্রিম প্রজনন প্রক্রিয়ার প্রজননের রেকর্ড, বাছুর হওয়ার রেকর্ড এবং সিমেনের রেকর্ড নির্ভুলভাবে লিপিবদ্ধ করতে হয়। বিভিন্ন তথ্যাদি লিপিবদ্ধের জন্য সর্বদা একটি নোটবুক সঙ্গে রাখতে হবে এবং আনুষাঙ্গিক কাগজপত্র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পাঠাতে হয়। কৃত্রিম প্রজননের সঠিক ফলাফল পাওয়ার জন্য নিয়মিত কৃত্রিম প্রজননের রেকর্ড অত্যন্ত প্রয়োজন। কৃত্রিম প্রজনন রেকর্ড সর্বদা নির্ভুল, সম্পূর্ণ এবং প্রাত্যহিক হওয়া বাঞ্ছনীয়

ডেইরি প্রাণির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

সুস্থ গবাদিপশুর বাহ্যিক লক্ষণ

সুস্থ গবাদিপশুর বাহ্যিক লক্ষণ জানতে হলে প্রথমে অসুস্থ পশুর লক্ষণসমূহ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা অপরিহার্য। সে কারণেই এখানে সুস্থ ও অসুস্থ পশুর বাহ্যিক লক্ষণসমূহ তুলনামূলকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যথা-

- মাজেল (muzzle) : উপরের ঠোঁটের লোমবিহীন অংশকে মাজেল বলে। একটি সুস্থ পশুর মাজেল সর্বদা ঘর্মাক্ত থাকে। বিন্দু বিন্দু ঘামে সিক্ত এ অংশ সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। অসুস্থ পশুর মাজেল সাধারণত শুষ্ক থাকে
- লালা (saliva) : কোন সুস্থ পশুর মুখ থেকে সাধারণত লালা পড়ে না। মুখ থেকে অতিরিক্ত লালা নির্গত হলে তা রোগাবস্থা নির্দেশ করে। উদাহরণস্বরূপ, মুখগহ্বরে কোন ক্ষত হলে (যেমন- ক্ষুরারোগ) মুখ থেকে অতিরিক্ত লালা পড়ে। আবার জলাতঙ্ক রোগে ক্ষতাবস্থা ছাড়াও লালা পড়ে।
- খাদ্য গ্রহণ(feeding) : সুস্থ পশুতে স্বাভাবিকভাবে ক্ষুধা ও অসুস্থ পশুতে ক্ষুধামন্দা দেখা দেয়। গলবিল বা ফ্যারিংসের অবশতার কারণে পশু খাদ্য গলাধঃকরণ করতে পারে না। ফলে খাবার নাকমুখ দিয়ে বের হয়ে আসে।
- জাবরকাটা(rumination) : রোমন্থক পশু, যেমন-গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি জাবর কাটে। তৃণভোজী এসব প্রাণি খাদ্য যথাযথভাবে না চিবিয়ে গলাধঃকরণ করে। পরে বিশ্রামকালে বিশেষ প্রক্রিয়ায় এসব খাদ্য পাকস্থলী থেকে অন্ননালির মাধ্যমে মুখগহ্বরে আসে। লালা সংমিশ্রণ ও চর্বিতচর্বণের পর এ খাদ্য পুনরায় অন্ননালি হয়ে পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। এ প্রক্রিয়াকে জাবরকাটা বা রোমন্থন বলে। রোমন্থন সুস্থতার লক্ষণ। কোন অসুস্থ পশু সাধারণত রোমন্থন করে না।
- নাসিকারন্ধ্র (nostrils) : সুস্থ গবাদিপশুর নাসিকারন্ধ্র পরিষ্কার থাকে। নাক থেকে কোনো শ্লেষ্মাজাতীয় তরল পদার্থ বের হলে তা সাধারণত শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ ইঙ্গিত করে।
- শ্বাসপ্রশ্বাস (respiration) : বিভিন্ন প্রজাতির পশুর নির্দিষ্ট শ্বাসপ্রশ্বাসের হার রয়েছে। সুস্থ পশুতে এ হার স্বাভাবিক থাকে। শ্বাসপ্রশ্বাসের অস্বাভাবিকতা তাই অসুস্থতার লক্ষণ। এ লক্ষণ বাহ্যিকভাবে সহজেই পর্যবেক্ষণ করা যায়।
- চোখ ও কান (eye and ear) : সুস্থ পশুর চোখ পরিষ্কার থাকে। চোখে আঘাত লাগলে, ডারময়েড সিস্ট (dermoid cyst) হলে চোখ থেকে পানি পড়ে। জীবাণু সংক্রমণ হলে চোখে ময়লা জমতে পারে এবং চোখ লাল হতে পারে। তাছাড়া জন্ডিস (jaundice) হলে চোখ হলুদ বর্ণ ধারণ করে। সুস্থ পশুর কান সর্বদা সজাগ থাকে এবং কোন শব্দ হলে কান খাড়া করে ও সতর্ক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। পশু অসুস্থ হলে এরূপ প্রতিক্রিয়া নিস্তেজ হয়।
- লেজ (tail) : সুস্থ পশুর লেজ সর্বদা ব্যস্ত থাকে। কোন মশামাছি বা কীটপতঙ্গ গায়ে বসলে লেজের সাহায্যে তাৎক্ষণিকভাবে তাড়িয়ে দেয়। অসুস্থ পশুতে লেজ নিশ্চল থাকে এবং মশামাছি সারা শরীরে স্বাচ্ছন্দ্যে বিচরণ করে। এছাড়া গরু-মহিষের লেজে পচনশীল ঘা (gangrene) থাকতে পারে। আবার সুস্থ পশুর লেজ পরিষ্কার থাকে। আমাদের দেশে গরু-মহিষে প্রায়শ ডায়রিয়া বা পাতলা পায়খানা হয়। এসব ক্ষেত্রে পশুর লেজ এবং এর সংলগ্ন স্থানসমূহে পায়খানা লেগে থাকতে দেখা যায়। জরায়ুতে পুঁজ (pyometra) হলে লেজের উপরিভাগে পুঁজ জড়িয়ে থাকতে। কখনও কখনও রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা লেজের সাথে সংযুক্ত থাকতে পারে। এসব অসুস্থতার লক্ষণ
- বহিরাবরণ (body coat) : সুস্থ পশুর বহিরাবরণ কোমল, মসৃণ ও চাকচিক্যপূর্ণ হয়। অপুষ্টি, চর্মরোগ প্রভৃতির কারণে বহিরাবরণের এ বৈশিষ্ট্য খর্ব হয় এবং খসখসে ও রুক্ষরূপ ধারণ করে। কখনও কখনও শরীরের অংশবিশেষ

লোমহীন হয়ে পড়ে। এছাড়া খোসপাঁচড়া, ফোঁড়া, বিভিন্ন প্রকার ক্ষত, কীড়াপড়া (myiasis), টিউমার, সিস্ট (cyst), আঁচিল (papillomatosis), জোয়ালকান্দা, কুঁজে ঘা প্রভৃতি রোগ শরীরের বাহিক আবরণ পরীক্ষা করে সহজেই চিহ্নিত করা যায়। সুস্থ পশুর লোম শায়িত অবস্থায় থাকে। পক্ষান্তরে, অতিরিক্ত শীত ও জ্বরে পশুর লোম খাড়া থাকে

- নাভি (navel) : বাছুরের নাভিতে প্রায়ই ফোঁড়া (navel abscess) ও হার্নিয়া (umbilical hernia) দেখা যায়। শংকর জাতের বাছুরে এ দুটি রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। এসব রোগে নাভি সংলগ্ন এলাকা স্ফীত হয় এবং সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়।
- পা (চলন) : পশুর প্রতি পা অতি গুরুত্বপূর্ণ। এর কোনটিতে ত্রুটি হলে পশু তার কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। ক্ষুরারোগ (Foot and Mouth Disease), পা পঁচা (Foot Rot), ক্ষুরপ্রদাহ (laminitis), চাক্কি বা টাশ রোগ (upward patellar fixatioin), সন্ধিচ্যুতি (dislocation of joint), সন্ধিপ্রদাহ (arthritis), পায়ের অবশতা (limb paralysis), হাড়ভাঙ্গা (Fracture) প্রভৃতি রোগে পশু খোঁড়া হয়ে যায়। সুস্থ পশুর পাগুলো ত্রুটিমুক্ত থাকবে।
- স্বাস্থ্যগত অবস্থা(health status) : পুষ্টিহীনতা আমাদের গবাদিপশুর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। পুষ্টিহীন পশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকায় এরা সহজেই রোগাক্রান্ত হয়। আমাদের দেশের গবাদিপশুকে স্বাস্থ্যগতভাবে ৪ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন- অতি স্বাস্থ্যবান, স্বাস্থ্যবান, স্বাস্থ্যহীন ও অতি স্বাস্থ্যহীন। এদের মধ্যে অতি স্বাস্থ্যহীন পশুকে অসুস্থ হিসেবে ধরে নেয়া যায়। এ ধরনের পশুর বৈশিষ্ট্য/লক্ষণ এখানে দেয়া হয়েছে। যেমন- এদের বক্ষদেশের সকল হাড় (ribs) স্পষ্ট দেখা যাবে; লাম্বার ট্রান্সভার্স প্রসেস (Lumbar Transverse Process) স্পষ্ট দেখা যাবে; প্যারালাম্বার ফোসা (Paralumbar Fossa) গভীর হবে; লেজের গোড়া সংকীর্ণ থাকবে। নিতম্বের পেশি অবতল (concave) থাকবে এবং টিউবার কক্সি (Tuber Coxae) ও টিউবার ইস্কি (Tuber Ischi) খাড়াভাবে বের হয়ে উঠবে।

গবাদিপশুর রোগসমূহ ও তাদের প্রতিকার

রোগের নাম	কারণ	লক্ষণ	প্রতিকার
বাদলা	*Clostridium chauvoei* নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এ রোগ হয়। বর্ষাকালে ৬ মাস থেকে ২ বছর বয়সের প্রাণিতে বেশি হয়। খাদ্য ও পানির মাধ্যমে এ রোগ সংক্রামিত হয়। এ রোগের জীবাণু স্পোর সৃষ্টি করে মাটিতে ৩-৪ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে।	অতি তীব্র প্রকৃতির হলে প্রাণি হঠাৎ মারা যায়। তীব্র প্রকৃতির হলে মুখমণ্ডল, বুক, পেট ফোলে, নাকের শ্লেষ্মা দেখা যায়। প্রাণির পায়ের মাংসপেশী আক্রান্তের ফলে প্রাণি হাঁটতে পারে না ও খুঁড়িয়ে হাঁটে এবং ফোলা পেশিতে চাপ দিলে পচ পচ শব্দ হয়।	আক্রান্ত প্রাণিকে আলাদা রাখতে হবে। মৃত দেহ মাটির নিচে পুঁতে রাখা বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। সংক্রমিত এলাকা চারণভূমি বা বসবাসের জন্য ব্যবহার করা যাবে না। বর্ষার ২ মাস পূর্বে ৬ মাস থেকে ২ বছরের সকল প্রাণিকে টিকা দিতে হবে।
গলাফুলা	*Pasteurella multocida* নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এ রোগ হয়। সকল বয়সের প্রাণিই আক্রান্ত হয়। বর্ষার পর স্যাঁতস্যাঁতে জমিতে চরালে এ	অতি তীব্র প্রকৃতির হলে হঠাৎ করে প্রাণির জ্বর আসে, অস্থিরতা দেখা যায়, শ্বাসকষ্ট হয়, নাক, মুখ দিয়ে লালা ঝরে ও ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রাণি মারা যায়। তীব্র প্রকৃতির হলে উপরের লক্ষণ	অসুস্থ প্রাণিকে আলাদা রাখা ও সালফোনামাইড জাতীয় ইনজেকশন ব্যবহার করা। মৃতদেহের সৎকার করা। সব সুস্থ প্রাণিকে সুস্থ অবস্থায়

	রোগ বেশি হয়। অসুস্থ প্রাণির সংস্পর্শে, লালা, মলমূত্র, দূষিত খাদ্য ও পানি দ্বারা এ রোগ ছড়ায়।	হয় ও প্রথমে গলার নিচে, পরে চোয়াল, বুক পেট ও কানের অংশ ফুলে যায়। শ্বাস নিতে কষ্ট হওয়ার কারণে গলা বাড়িয়ে মুখ দিয়ে শ্বাস নেয়।	নিয়মিত প্রতিষেধক টিকা দেয়া।
ম্যাসটাইটিস বা ওলান প্রদাহ	*Streptococcus genus* ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ও মাইকোপ্লাজমা দ্বারা হয়। [illegible] সাঁতসেঁতে বাসস্থান, ময়লা হাতে দোহন, বাটে বা ওলানে আঘাত, ওলানে দুধ জমাট বেঁধে থাকা ইত্যাদি কারণে রোগজীবাণু সংক্রমিত হয়ে রোগ সৃষ্টি করে অর্থাৎ সংক্রমিত ওলান ও দূষিত পরিবেশ এ রোগ সৃষ্টি করে।	অতি তীব্র রোগের ক্ষেত্রে দুধের পরিবর্তন লক্ষণীয়, দুধ পাতলা ও কিছু জমাট বাঁধা হয়। ওলান শক্ত হয়ে ফুলে যায় ও গরম হয়। প্রাণি খাদ্য গ্রহণ কমে ও তাপমাত্রা বেড়ে যায়, ক্ষুধামন্দা, অবসাদগ্রস্ত, জ্বর ইত্যাদি হয়। দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতির হলে দুধের পরিমাণ কমে যায় ও ক্রমান্বয়ে দুধ ছানার মত ছাকা ছাকা হয়।	অসুস্থ প্রাণিকে সুস্থ প্রাণি থেকে আলাদা করা। গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। এ রোগ প্রতিরোধ করা খুব কঠিন, কারণ ওলানে কোন এন্টিবডি তৈরি হলে তা দুধের মাধ্যমে বের হয়ে যায়।
ব্যাবেসিওসিস	ব্যাবেসিয়া দল ভুক্ত প্রোটোজোয়া এঁটুলির মাধ্যমে সংক্রমিত হয়	আক্রান্ত প্রাণির জ্বর, রক্তাল্পতা ও হিমোগ্লোবিনিউরিয়া দেখা যায়।	আক্রান্ত প্রাণির সুষ্ঠু চিকিৎসা ও বাহক (এঁটুলি) নিয়ন্ত্রণ।
দুগ্ধ জ্বর	রক্তে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ কমে যাওয়া।	ক্ষুধামন্দা, উত্তেজিত ভাব, মাথা ও পা কাঁপা, দাঁড়িয়ে থাকা, হাঁটতে গেলে টলতে থাকা, পিছনের পায়ের দুর্বলতার কারণে শুয়ে পড়ে। পা ঠান্ডা হতে থাকে ও [illegible] ও দুর্বল দেখায়।	ক্যালসিয়াম [illegible] দেওয়া, দানাদার খাদ্যের সাথে ভিটামিন ডি ও ক্যালসিয়াম খাওয়ানো।
কিটোসিস	গর্ভবতী গাভীর শর্করা খাদ্যের ত্রুটিপূর্ণ বিপাকের কারণে সৃষ্ট বিপাকীয় রোগ। রক্তে গ্লুকোজের অভাব, খাদ্যে শর্করা জাতীয় খাদ্যের অভাবে এ রোগ হয়	ক্ষুধামন্দা, দুধ উৎপাদন কম, দানাদার খাদ্য। খাওয়া বন্ধ করে বিভিন্ন বস্তু খেতে থাকে। হঠাৎ শুয়ে পড়ে, গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস, প্রস্রাব ও গোবরে অ্যালকোহলিক গন্ধ থাকে। [illegible] চাটতে থাকে, টলমল করে দাঁড়াতে পারে না, দেহে কাঁপুনি ও খিঁচুনি থাকে।	গ্লুকোজ বা ডেক্সট্রোজ ইনজেকশন দিয়ে প্রতিরোধ করা হয়।

জরায়ু ঝিল্লির প্রদাহ: অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাচ্চা প্রসব, গর্ভপাত, গর্ভফুল নির্গমনে ব্যাহত এবং কৃত্রিম প্রজননে ব্যবহৃত ডিভাইসের মাধ্যমে জীবাণু জরায়ুতে প্রবেশ করে প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে।

জরায়ুর প্রদাহ: বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া, ভাইরাস ও ছত্রাক, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ এবং দুর্বল জৈবনিরাপত্তার কারণে জরায়ুতে রোগ জীবাণু প্রবেশ করে প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে।

জরায়ুতে পুঁজ: জীবাণুর সংক্রমণের ফলে জরায়ুতে পুঁজ হতে পারে। অপরিচ্ছন্ন পরিবেশের কারণে বিশেষ করে প্রসবের সময় জরায়ুতে জীবাণুর সংক্রমণ ঘটে।

গাভী বার বার গরম হওয়া: তিন বা তার অধিক বার পাল দেয়া বা কৃত্রিম প্রজনন করা সত্ত্বেও গর্ভধারণ না করা এই রোগের অন্যতম লক্ষণ। বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া ও প্রোটোজোয়া এ রোগ সৃষ্টি করতে পারে।

এছাড়া জীবাণু দ্বারা সৃষ্ট অন্যান্য রোগ হল (১) ভিবরিওসিস এবং (২) লেপ্টোস্পাইরোসিস।

দশটি গাভীর দুগ্ধ খামারের আয়-ব্যয়ের হিসাব

সারণি : দশটি গাভীর খামার তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় গবাদিপশুর ধরন, সংখ্যা, তাদের দৈহিক ওজন এবং দৈনিক গড় দুধ উৎপাদন।

পশুর ধরন	পশুর সংখ্যা	গড় দৈহিক ওজন (কেজি)	গড় দুধ উৎপাদন (লিটার)
দুধালো গাভী	৬	৩০০	৮
দুধহীন গাভী	৪	৩০০	-
বকনা	৪	১৫০	
বাছুর	৬	৭৫	

(ক) প্রয়োজনীয় গৃহায়ন: প্রতিটি দুধালো গাভীর জন্য ৫০ বর্গফুট, দুধবিহীন ও বকনার জন্য ৪০ বর্গফুট এবং ৬টি বাছুরের জন্য ৩০ বর্গফুট হিসেবে আধুনিক পদ্ধতির একক আদর্শ গোশালায় মোট ৮০০ বর্গফুট ঘরের প্রয়োজন। পাকা খাদ্য ও পানির পাত্র এবং ইটের দেয়াল ও তারজালি-টিনের বেড়াসহ দোচালা টিনের ঘর নির্মাণে প্রতি বর্গফুট ১৬০ টাকা হিসেবে ৮০০ বর্গফুট ঘর তৈরি বাবদ মোট খরচ ১,২৮,০০০ টাকা।

(খ) বাছুরসহ ৬টি সংকর জাতের গাভী যার প্রতিটির মূল্য ৮০,০০০ টাকা হিসেবে মোট খরচ ৪,৮০,০০০ টাকা।

(গ) দুধবিহীন ৪টি সংকর জাতের গাভী যার প্রতিটির মূল্য ৬০,০০০ টাকা হিসেবে মোট খরচ ২,৪০,০০০ টাকা।

(ঘ) সংকর জাতের ৪টি বকনা যার প্রতিটির মূল্য ৪০,০০০ টাকা হিসেবে মোট খরচ ১,৬০,০০০ টাকা।

(ঙ) খামার ব্যবস্থাপনার সরঞ্জামাদিসহ বিবিধ মোট খরচ ৪২,০০০ টাকা।

সুতরাং খামারে সর্বমোট মূলধন বিনিয়োগ হবে (প্রয়োজনীয় গৃহায়ন ১,২৮,০০০ টাকা + বাছুরসহ ৬টি সংকর জাতের গাভী ৪,৮০,০০০ টাকা + দুধবিহীন ৪টি সংকর জাতের গাভী ২,৪০,০০০ টাকা + সংকর জাতের ৪টি বকনা ১,৬০,০০০ টাকা + খামার ব্যবস্থাপনার সরঞ্জামাদি ৪২,০০০ টাকা) ১০,৫০,০০০ টাকা।

১। বাৎসরিক আবর্তক খরচ:

(ক) খাদ্য খরচঃ গরুর স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য ওজনের শতকরা ৩ ভাগ হারে আঁশ জাতীয় খাদ্য (কাঁচা ঘাস), শতকরা ১ ভাগ শুষ্ক আঁশ জাতীয় খাদ্য (খড়) ও শতকরা ১ ভাগ দানাদার জাতীয় খাদ্যের দরকার হয়। উপরন্তু দৈনিক ৮ লিটার দুধ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন গাভীর অতিরিক্ত ১ কেজি দানাদার খাদ্যের দরকার। সে মোতাবেক দশটি গাভীর খামারে বার্ষিক খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা ও খরচ উল্লেখ করা হল

সারণি ঃ পাঁচটি গাভীর খামারে বার্ষিক খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা ও খরচ

খাদ্যের ধরন	বার্ষিক খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা (কেজি)					প্রতি কেজির মূল্য (টাকা)	বার্ষিক খরচ (টাকা)	মন্তব্য
	দুধালো গাভী	দুধবিহীন গাভী	বকনা	বাছুর	মোট			
সবুজ আঁশ জাতীয় খাদ্য	৩২,৮৫০	২১,৯০০	১০,৯৫০	৫,৪৭৫	৭১,১৭৫	০.৫০	৩৫,৫৮৭.৫০	এখানে সবুজ আঁশ জাতীয় খাদ্যের শুধু উৎপাদন খরচ ধরা হয়েছে।
শুষ্ক আঁশ জাতীয় খাদ্য	৬,৫৭০	৪,৩৮০	২,১৯০	১,০৯৫	১৪,২৩৫	১.৫০	২১,৩৫২.৫০	
দানাদার জাতীয় খাদ্য	৬,৫৭০	৪,৩৮০	২,১৯০	১,০৯৫	১৪,২৩৫	২৫.০০	৩,৫৫,৮৭৫	
সর্বমোট =							৪,১২,৮১৫	

(খ) খামার ব্যবস্থাপনায় বিবিধ সরঞ্জামসহ স্বাস্থ্যবিধি ও প্রজনন কাজে বার্ষিক সর্বমোট খরচ ৫০,০০০ টাকা।

সুতরাং দশটি গাভীর খামারে বার্ষিক আবর্তক খরচ সর্বমোট (খাদ্য খরচ ৪,১২,৮১৫ টাকা + খামার ব্যবস্থাপনা ৫০,০০০ টাকা) ৪,৬২,৮১৫ টাকা যাহা খামারের বার্ষিক আয় হতে মেটানো হবে

১০। বাৎসরিক আয় ঃ

(ক) দুধ বিক্রি- প্রতিটি গাভী হতে দৈনিক গড়ে ৮ লিটার দুধ উৎপাদন হলে ৩০০ দিনে ৬টি হতে, প্রতি লিটার ৫০ টাকা হিসেবে মোট বাৎসরিক আয় ৭,২০,০০০ টাকা

(খ) গোবর বিক্রি- প্রতি ১০০ কেজি দৈহিক ওজনে ৬ কেজি গোবর উৎপন্ন করলে খামারের ৩,৯০০ কেজি দৈহিক ওজন বছরে প্রায় ৮৫.৪ টন গোবর উৎপন্ন করবে। গোবর ৫০০ টাকা টন হিসেবে বাৎসরিক মোট আয় ৪২,৭০০ টাকা।

সুতরাং দুগ্ধ খামার হতে বার্ষিক আয় হবে (দুধ বিক্রি ৭,২০,০০০ টাকা + গোবর বিক্রি ৪২,৭০০ টাকা + বাছুর বিক্রি ১,৫০,০০০ টাকা) সর্বমোট ৯,১২,৭০০ টাকা

১১। বাৎসরিক মুনাফা ঃ বার্ষিক সর্বমোট আয় ৯,১২,৭০০ টাকা হতে বার্ষিক আবর্তক খরচ ৪,৬২,৮১৫ টাকা বাদ দিলে বার্ষিক নীট মুনাফা থাকবে ৪,৪৯,৮৮৫ টাকা।

পনির উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ

ভূমিকাঃ

পনির দুগ্ধজাত পণ্যের মধ্যে একটি অন্যতম পণ্য যা দুধ প্রথমে এনজাইম রেনিন দিয়ে জমাট করে তৈরী করা হয়। আমাদের দেশীয় পনির মূলত কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রাম থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে যা আন্তর্জাতিকভাবে ঢাকাই পনির নামে পরিচিত। অষ্টগ্রামবাসীরা জানান যে, ৩০০-৩৫০ বছর আগে থেকে অষ্টগ্রামে পনির উৎপাদন শুরু হয়। স্থানীয় বৃদ্ধদের সাথে আলোচনায় অষ্টগ্রামের পনির তৈরির ইতিহাস সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় তা হলো পূর্বে এ এলাকায় প্রচুর মহিষের দুধ হতো। কিন্তু অনুন্নত যোগাযোগ, দুর্বল বাজার ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি তেমন চাহিদা না থাকায় এই দুধ বাজারে বিক্রি হতো না। অপর দিকে দুধের সংরক্ষণকাল কম হওয়ায় দুধ বাইরে পাঠানো যেত না ফলে প্রচুর পরিমাণ দুধ নষ্ট হয়ে যেত। উক্ত দুধ সংরক্ষণের উপায় হিসেবেই প্রথমত অষ্টগ্রামে পনির উৎপাদন শুরু হয়। কারণ দুধের চেয়ে দুধের তৈরি পনির বেশিদিন দেশীয় দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি তৈরির কৌশল সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করা হয়। পনির উৎপাদনের অষ্টগ্রাম প্রযুক্তিটি সংশোধিত আকারে খামারিদের ব্যবহারের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য/সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

* দুধ উত্তম পানীয় ও পুষ্টিকর খাদ্য হলেও অতি অল্প সময়েই নষ্ট হয়ে যায়
* দুগ্ধজাত দ্রব্য পনির সংরক্ষণ সমস্যা কম এবং একটি লাভজনক পণ্য
* পনিরকে সাধারণ তাপমাত্রায় ১৫-২০ দিন রাখা যায়
* অনুন্নত হাতে সহজ উপায়ে এবং কোন বড় রকমের দুগ্ধ সংরক্ষণের অন্যতম ও প্রধান উপায় হচ্ছে পনির উৎপাদন
* প্রাকৃতিক তাপমাত্রায় এর সংরক্ষণকাল অধিক হওয়ায় পনিরকে সুবিধাজনক সময়ে বাজারজাত করা যায় যা দুধের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়
* অধিক সংরক্ষণকাল থাকায় পনিরকে দূর দূরান্তে বাজারজাত করাও সম্ভব
* পনির দুধ অমিষ জাতীয় খাদ্যের অতি উত্তম উৎস যা বাচ্চা ও বৃদ্ধদের আমিষ পুষ্টি চাহিদা মেটাতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম
* স্বল্প বিনিয়োগে প্রযুক্তিটি ব্যবহার করা যায়, প্রতিদিন মাত্র ২০০০ টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে একটি পরিবার সহজেই জীবিকা নির্বাহ করতে পারে বিধায় পনিরের প্রযুক্তিটি দুগ্ধ উৎপাদন এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম হাতিয়ার হতে পারে।

ব্যবহার পদ্ধতিঃ

পনির তৈরির উপকরণঃ গরু, মহিষ বা ছাগলের দুধ, মাওয়া (প্রক্রিয়াজাত পাকস্থলী), মাওয়ার পানি, অ্যালুমিনিয়াম পাত্র (৫০ লিটার), স্টেইনলেস স্টিলের ধারালো ছুরি, বাঁশের তৈরি ঝুরি, বাঁশের তৈরি ঝুড়ি বা টুকরি, খাবার লবণ এবং পনির ছিদ্র করার জন্য ফোঁটা কাঠি (পরিধি প্রায় ২.৫-৩ সে.মি.)।

মাওয়া তৈরিঃ সাধারণভাবে মাওয়া বলতে লবণ দ্বারা বিশেষভাবে প্রক্রিয়াকৃত গরু বা ছাগলের পাকস্থলী যা রোদে শুকিয়ে তৈরি করা হয়। গরু বা ছাগলের পাকস্থলী চারটি অংশে বিভক্ত যথা ঃ রুমেন, রেটিকুলাম, ওমেসাম ও অ্যাবোমেসাম বা প্রকৃত পাকস্থলী (পাকস্থলীর শেষাংশ)। এই অ্যাবোমেসাম বা প্রকৃত পাকস্থলী দিয়েই মাওয়া তৈরি করা হয়। বাণিজ্যিকভাবে বা দেখতে অনেকটা বাংলা অক্ষর ৫ এর মত। জবাই করা হতে বাছুর গরুর এই পাকস্থলী ৩০০-৩৫০ টাকা দরে ক্রয় করা হয়। পাকস্থলীর ভিতরের ময়লা অপসারণের জন্য ধারালো চাকু দিয়ে কেটে টিউবওয়েলের পানি দিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত ধুতে হবে যাতে পাকস্থলীর ভেতরের পিচ্ছিল (মিউকাস) অংশ পানির সাথে ধুয়ে না যায়। এবার বাঁশের চটাই এর উপর পাকস্থলী এমনভাবে বিছানো হয় যাতে পাকস্থলীর ভিতরের অংশ উপরে থাকে। তারপর ২৫০-৩০০ গ্রাম পরিমাণ খাবার লবণ পাকস্থলীতে সমভাবে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে পাকস্থলী ৫-৬ দিন রোদে শুকিয়ে টুকরা টুকরা করে কেটে মাওয়া তৈরি করা হয়। মাওয়াকে সাধারণত ঠান্ডা জায়গায় যে কোন পাত্রে রেখে প্রায় এক বছর পর্যন্ত ভালোভাবে সংরক্ষণ করা যায়।

পনিরের জন্য মাওয়ার পানি প্রস্তুতকরণ (৪০ কেজি দুধের হিসাব):

গ্রীষ্মকালে একটি পনির প্রক্রিয়াকৃত প্রস্তুত পাকস্থলী বা মাওয়ার ১/৪ অংশ বা ২৫ শতাংশ এবং শীতকালে ১/৩ অংশ বা ৩৩ শতাংশ পরিমাণ মাওয়া একটি পাত্রে নিয়ে এতে ২-৩ কেজি পরিমাণ পানি ও ১ কেজি পরিমাণ কাঁচা দুধ মিশিয়ে ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। পনির তৈরির পূর্বে মাওয়ার পানি অবশ্যই পাতলা পরিষ্কার কাপড়ে ছেঁকে নিতে হবে। স্থানীয় ভাষায় এই পানিই "মাওয়ার পানি" নামে পরিচিত।

দুধ থেকে পনির তৈরি:

* দুগ্ধ দোহনের ৩-৪ ঘন্টা পর ৪০ কেজি কাঁচা দুধ ছেঁকে একটি অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে নিতে হবে। ২-৩ কেজি পরিমাণ মাওয়ার পানি ধীরে ধীরে দুধে যোগ করতে হবে এবং ভালোভাবে নাড়াতে হবে। দুধ জমাট বাধার জন্য ৩০-৪০ মিনিট সময় স্থিরভাবে রেখে দিতে হবে। দুধ জমাট বেঁধেছে কি না তা পরীক্ষা করার জন্য বাঁশের তৈরি পাতলা ছুরি দুধে প্রবেশ করিয়ে দেখতে হবে। যদি ছুরিটি সোজা দন্ডায়মান থাকে তবে বুঝতে হবে দুধ জমাট সঠিক হয়েছে।
* জমাট বাঁধার ১০ মি. পর বাঁশের তৈরি ছুরি দ্বারা জমাট দুধকে আড়াআড়ি ভাবে কেটে দিতে হবে।
* কাটার পরে কাটা জায়গা থেকে হলুদাভ বর্ণের পানি বের হয়ে এলে এর ১০ মিনিট পর কাটা জমাট দুধকে হাত দিয়ে ভালোভাবে ভেঙে দিতে হবে।
* ছানাকে উত্তমরূপে মিতানোর জন্য ৫-১০ মিনিট সময় ধরে দুই হাত দিয়ে চাপ প্রয়োগ করে খুব ধীরে ধীরে পাত্রের একপার্শ্বে জমা করতে হবে। এমনভাবে চাপ প্রয়োগ করতে হবে যাতে ছানার ভেতর খুব বেশি পানি না থাকে এবং চাপা (compact mass) অবস্থায় থাকে।
* এবার ছানাকে স্টেইনলেস স্টিলের ধারালো ছুরি দ্বারা টুকরো টুকরো (thin slices) করে কাটতে হবে।
* অতপর এবার টুকরাকে বাঁশের তৈরি ঝুড়িতে (প্রতিটি ঝুড়ির ব্যাস হবে প্রায় ১২ সেমি. এবং উচ্চতা হবে প্রায় ৬-৭ সেমি.) হাত দ্বারা চেপে ভরতে হবে। ৪০ কেজি দুধের ছানা দিয়ে ৫টি ঝুড়ি। প্রতিটি ঝুড়িতে পনিরের ওজন হবে ১ কেজি) পূর্ণ করা সম্ভব।
* নির্দিষ্ট আকার আকৃতির (ঝুড়ির ছাপ) জন্য ১৫ মিনিট পর ঝুড়ির ছানা পিণ্ডকে প্রথম উল্টিয়ে দিতে হবে।
* পানি নিষ্কাশনের জন্য ছানার পিণ্ডসহ ঝুড়ি একটি পাত্রে প্রায় ১৫ ঘন্টা রাখতে হবে এবং সেই সাথে ঝুড়িটি অন্য একটি পাত্র দ্বারা ঢেকে রাখতে হবে, যাতে বাইরের ময়লা বা পোকামাকড় না পড়ে।
* ১৫ ঘন্টা পর ঝুড়ির পনির পিণ্ডকে দ্বিতীয় বার উল্টিয়ে চোখা (সূক্ষ্মমুখযুক্ত) কাঠি দ্বারা (দৈর্ঘ্য প্রায় ২.৫-৩ সেমি.) কেন্দ্র বা মধ্য বরাবর তিনটি ছিদ্র করে (ত্রিভুজাকৃতির) তাতে ৫০ গ্রাম খাবার লবণ ঢুকিয়ে দিতে হবে।
* বাড়তি লবণ পনির পিণ্ডের চারপার্শে রেখে দিতে হবে। এতে লবণ ধীরে ধীরে গলে সমস্ত পনির পিণ্ডে বিস্তার লাভ করবে। এভাবে ৩ দিন পর্যন্ত রাখতে হবে।

পনির উৎপাদন:

গরুর দুধ:
শীতকালে প্রতি ৮ কেজি দুধ থেকে ১ কেজি পনির (১মণ দুধে ৫ কেজি পনির) এবং গ্রীষ্মকালে ৯ কেজি দুধ থেকে ১ কেজি পনির (১ মন দুধে ৪.৫ কেজি পনির) উৎপাদিত হয়ে থাকে।

মহিষের দুধ: গড়ে প্রতি ৭ কেজি দুধ থেকে ১ কেজি অর্থাৎ প্রতি মণ দুধ থেকে প্রায় ৬ কেজি পনির উৎপাদিত হয়।

পনির সংরক্ষণ:

গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে স্বাভাবিক পরিবেশ/তাপমাত্রায় অধিকাংশে পনিরকে ৭-১০ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। কিন্তু শীতকালে ১৫-২০ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। পনির বেশি দিন সংরক্ষণ করতে হলে ২ দিন পর পর লবণ পানি দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে। তবে কোনো কোনো প্রস্তুতকারক পনিরের সংরক্ষণকাল বৃদ্ধি এবং বিশেষ আকর্ষণের জন্য উনুন বা অন্যের চুলার ধোঁয়ায় রেখে ধোঁয়ায়িত (smoking) করে থাকেন। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পনিরকে ১ মাস থেকে ২ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

বাজারজাতকরণঃ
অষ্টগ্রামের পনির প্রস্তুতকারক সাধারণত হবিগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী এলাকার খুচরা বাজারে প্রতি কেজি পনির ৮০০ এবং ঢাকাতে পাইকারি বাজারে ৭৫০ টাকা হিসেবে বিক্রি করে থাকেন। খুচরা বাজারে পনিরকে অনেক সময় ক্রেতার চাহিদা মত কেটে কেটে বিক্রি করা হয়। এ ছাড়াও কিছু প্রস্তুতকারক তাদের উৎপাদিত পনির বাড়িতে বসে বিক্রি করে থাকেন।

ছানার পানির ব্যবহারঃ
প্রতি ৪০ কেজি দুধ থেকে পনির তৈরির সময় উপজাত হিসেবে প্রায় ৩৫-৩৬ লিটার ছানার পানি পাওয়া যায়। এই পানির ২-৩ লিটারে প্রথম দিনের ভিজানো মাওয়া যোগ করে মাওয়ার পানি তৈরি করা যায়। এভাবে ভিজানো মাওয়া ৩ দিন পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়। এছাড়াও ছানার পানি মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

আয়-ব্যয়ঃ সারণিঃ প্রতি দিন ৪০ লিটার দুধের পনির তৈরি খরচ

৪০ লিটার দুধের ক্রয় মূল্য প্রতি লিটার ৪০টাকা হিসাবে	= ১৬০০ টাকা
মাওয়াসহ মাওয়ার পানি তৈরিতে খরচ	= ৫০ টাকা
লবণ ২৫০ গ্রাম এর মূল্য	= ১০ টাকা
শ্রমিকসহ বিবিধ খরচ	= ৩৪০ টাকা
মোট খরচ	= ২০০০টাকা।

উল্লেখিত সারণিতে প্রস্তুতকারকদের দেয়া তথ্যমতে, প্রতি কেজি দুধের দাম ৪০ টাকা হলে ৪০ লিটার দুধের পনির তৈরি করতে মোট খরচ পড়বে ১৬০০ টাকা। প্রতিদিন দুধ থেকে সাধারণত শীতকালে ৫ কেজি এবং গ্রীষ্মকালে ৪.৫ কেজি পনির উৎপাদিত হয়। সেহেতু, প্রতি কেজি পনিরের খরচ পড়ে যথাক্রমে ৪০০ টাকা এবং ৪৪৫টাকা। প্রতি কেজি পনির খুচরা (স্থানীয় বাজার) এবং পাইকারি (ঢাকাতে) বাজারে যথাক্রমে গড়ে ৮০০ টাকা এবং ৭৫০ টাকায় বিক্রি হলে একজন প্রস্তুতকারক পনির উৎপাদনে প্রতিদিন মাত্র ২০০০ টাকা বিনিয়োগ করে খুচরা বাজার থেকে শীতকালে ২০০০ টাকা, গ্রীষ্মকালে ১৭০০ টাকা এবং পাইকারি বাজার থেকে ১৬০০ টাকা আয় করতে পারেন। এছাড়াও গবেষণাতে দেখা যায় অষ্টগ্রামে প্রায় ৫৭ শতাংশ মহিলা সরাসরি পনির তৈরি করে থাকেন এবং উক্ত পরিমাণ দুধের তৈরি করতে সময় লাগে মাত্র ১.৫ ঘন্টা। এতে মহিলাদের কর্মসংস্থান তথা ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ব্যবহারের সম্ভাবনাঃ
বাংলাদেশের যেসব অঞ্চলে অধিক দুধ উৎপাদন হয়। কিন্তু ন্যায্য মূল্যে বাজারজাত করতে পারে না সেসব অঞ্চলে প্রযুক্তিটি প্রযোজ্য। সব ঋতুতেই প্রযুক্তিটি ব্যবহার করা যেতে পারে।

সতর্কতাঃ
যে সকল অঞ্চলে দুধের দাম খুব বেশি সেখানে পনির তৈরি না করাই শ্রেয়। কারণ এতে করে পনিরের উৎপাদন খরচ বেশি পড়বে।

নবায়ন যোগ্য জৈব জ্বালানি, বায়োগ্যাস প্রযুক্তি আয় ব্যয়ের হিসাব

প্রকৃতি আমাদের দেশকে বিভিন্ন সম্পদ যেমন সবুজ ও সমৃদ্ধশালী বন এবং উর্বর সমতল ভূমি দান করেছে। প্রকৃতি সম্পদ হওয়া সত্ত্বেও এই সম্পদগুলো সুষম ব্যবহারের অজ্ঞতার কারণে আমরা সমস্যায় পড়ছি। জ্বালানী সরবরাহের অবস্থা এবং সার ব্যবস্থাপনা একটা উদাহরণ হিসেবে নেয়া যেতে পারে। নির্বিচারে গাছ কেটে আমরা জ্বালানি কাঠ হিসেবে ব্যবহার করছি কিন্তু শক্তির অন্যান্য উৎসের প্রতি মনোযোগ দিচ্ছি না। জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য গোবর, মুরগীর বিষ্ঠা এবং লতাপাতা ব্যবহার না করে সেগুলো চুলোয় পুড়াচ্ছি। ফসলের ক্ষেত্রে এগুলো ব্যবহার না করে আমরা নর্দমা ও খাল-বিলে ফেলে দিচ্ছি। সঠিক পুষ্টি সংরক্ষণে প্রচলিত জৈব সার ব্যবস্থাপনা কার্যকর নয়। এই সব অযৌক্তিক কর্মকাণ্ডের জন্য আমাদের বনভূমি দিনদিন বেদখল হয়ে যাচ্ছে এবং উর্বর জমি অনুৎপাদনশীল হয়ে পড়ছে। অধিকন্তু এই সব প্রচলিত শক্তির উৎস ব্যবহারের কারণে আমরা ধোঁয়া-সৃষ্ট অনেক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ছি। দূরবর্তী স্থান থেকে এই উৎসগুলো সংগ্রহ ও পরিবহন করতে গিয়ে আমাদের মূল্যবান সময় ও উদ্যম নষ্ট হচ্ছে।

বর্তমান দেশে প্রচলিত জ্বালানী উৎসের একটি বিকল্প হিসেবে কাজ করছে বায়োগ্যাস প্রযুক্তির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ। জলবায়ু পরিবর্তন, অপর্যাপ্ত জ্বালানী সরবরাহ ও মজুদের মত প্রকট সমস্যাগুলো নিরসনে বায়োগ্যাস প্রযুক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। যদিও কিছুটা বিলম্বিত, তথাপি আমাদের জ্বালানী চাহিদা ও কৃষি জমি সমৃদ্ধকল্পে বায়োস্লারি (জৈব তরল মিশ্রণ) সরবরাহের জন্য বায়োগ্যাস প্লান্ট ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ এই ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

বায়োগ্যাস প্লান্ট ব্যবহারের সুবিধা

বায়োগ্যাস ব্যবহার প্রচলিত জ্বালানীর উৎস সংরক্ষণে সহায়তা করে। একটি ছোট ফ্যামিলি সাইজ বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করে একটি পরিবার বছরে প্রায় ২ টন জ্বালানী কাঠ বাঁচাতে পারে। বাড়ির ভেতর বা বাইরের পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা উন্নয়নে এটা সহায়তা করে। এটা ধোঁয়াবিহীন হওয়ায় সৃষ্ট রোগ যেমন চোখের জ্বালাপোড়া, শ্বাসজনিত রোগ, কাশি, হাঁপানি ও মাথা ঘোরানো প্রভৃতি থেকে রেহাই পেতে সাহায্য করে। বায়োগ্যাসে রান্না দ্রুত হয়, হাঁড়ি-পাতিলে কালি পড়ে না এবং রান্নাঘর থাকে ধোঁয়ামুক্ত ও পরিচ্ছন্ন। প্রচলিত বাতির তুলনায় বায়োগ্যাসের বাতি বেশী উজ্জ্বল এবং ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া ও গৃহস্থালীর কাজকর্ম করতে অনেক অধিক আলো পাওয়া যায়। জ্বালানী কাঠ সংগ্রহের প্রয়োজন না হওয়ায় সময় বেঁচে যায়। বেঁচে যাওয়া সময় অন্যান্য আয় অর্জনমূলক ও গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহার করা যায়। বায়োস্লারির ব্যবহার ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে এবং দীর্ঘ সময় জমির উর্বরতা ধরে রাখতে সাহায্য করে। সবজি জমিতে ১০০০ কেজি গোবরের বায়োস্লারি ব্যবহার করলে ১০ কেজি ইউরিয়া, ৮ কেজি ফসফেট ও ১০ কেজি পটাশ কম ব্যবহার করলেও চলবে। অন্যদিকে প্রতি ১০০০ কেজি মুরগীর বায়োস্লারি ২৫ কেজি ইউরিয়া, ৫২ কেজি ফসফেট এবং ১৪ কেজি পটাশের বিকল্প হিসাবে কাজ করে। প্লান্ট নির্মাণের ফলে গবাদিপশুর আবদ্ধ রাখার প্রবণতা বেড়ে যায়, ফলশ্রুতিতে গোবর উৎপাদনের পরিমাণও বেড়ে যায়। জ্বালানী কাঠের ব্যবহার হ্রাসের কারণে গাছপালা নিধনের হারও হ্রাস পায়। ভূমি ক্ষয়, প্লাবন ও ভূমিধসও নিয়ন্ত্রিত হয়।

বায়োগ্যাস কী?

পচনশীল যে কোন জৈব পদার্থ গরুর গোবর, মুরগীর বিষ্ঠা, প্রভৃতি বায়ুশূন্য অবস্থায় রাখলে যে পরিচ্ছন্ন জ্বালানী গ্যাস উৎপন্ন হয় তাই বায়োগ্যাস/মিথেন(CH_4)। যখন গোবর/বিষ্ঠা পানির সাথে মিশিয়ে বায়ো-ডাইজেস্টারে বায়ুশূন্য অবস্থায় উপযুক্ত তাপমাত্রায় রাখা হয় তখন অণুজীব এর ক্রিয়ার ফলে গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই গ্যাস রান্নার জন্য খুবই লাভজনক। বায়োগ্যাস ব্যবহারে রান্না করলে:

- কাঠ, কেরোসিন কিংবা শুকনো গোবর এর প্রয়োজন হয় না
- রান্না দ্রুত হয়
- শিখা পরিষ্কার, ধোঁয়া ও কালিমুক্ত
- রান্নাঘর ও বাড়িঘর পরিষ্কার থাকে
- যখন বায়োগ্যাস পোড়ানো হয় তখন শিখার রং নীল থাকে এবং কোনো ধোঁয়া উৎপন্ন হয় না
- উৎপন্ন তাপের হিসেবে ১ ঘন মিটার বায়োগ্যাস (৬০% মিথেন) ০.৭৫ লিটার কেরোসিন, ৫.২ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ, ৪.৭ কেজি জ্বালানী কাঠ এবং ৮.৬ কেজি গোবরের সমান তাপ উৎপন্ন করে।

বায়োগ্যাসের পরিচিতিঃ

বায়োগ্যাসকে জৈব গ্যাস বলা হয়। বায়োগ্যাস প্রধানত মিথেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস এর মিশ্রণ। তবে অন্যান্য গ্যাসেরও সামান্য উপস্থিত পাওয়া যায়। নিচের টেবিলে জৈব গ্যাস ও প্রাকৃতিক গ্যাসের গঠনের একটি তুলনামূলক চিত্র দেওয়া হলো।

বায়োগ্যাস ও প্রাকৃতিক গ্যাসের তুলনামূলক চিত্রঃ

পদার্থ	শতকরা হার	
	প্রাকৃতিক গ্যাস	বায়োগ্যাস
মিথেন	৯০-৯৮	৬০-৭০
কার্বন ডাই-অক্সাইড	০.১-০.২	৩০-৪০
হাইড্রোজেন	-	২-২.৫
নাইট্রোজেন	০.৪	১-১.৫
অক্সিজেন	০.১	০.৩-০.৪
হাইড্রোজেন সালফাইড	-	০.১-০.২

বায়োগ্যাস ব্যবহারের সুবিধা সমূহঃ

১। পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ জ্বালানী পাওয়া যায়।
২। ধোঁয়া হয় না বলে পাতিল এবং রান্নাঘর কালো হয় না।
৩। কেরোসিন, লাকড়ি বা গোবরের ঘুটে লাগে না বলে জ্বালানীর খরচ বাঁচে।
৪। সময় বাঁচে এবং রান্নার পাশাপাশি অন্য কাজও করা যায়।
৫। লাকড়ির চুলায় রান্না করলে যে ধোঁয়া হয় তা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এতে চোখ জ্বালা করে এবং শ্বাসকষ্টসহ শ্বাসনালী ও ফুসফুসের নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ ক্ষেত্রে বায়োগ্যাস স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ
৬। পরিবেশ দূষণ হয় না
৭। বায়ো-স্লারি (জৈব সার) ব্যবহারে অধিক ফলন পাওয়া যায়।
৮। হ্যাজাক লাইট জ্বালানো যায়।
৯। জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনও করা যায়।
১০। বাড়ী ও দোকানে গ্যাস সংযোগ করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায়

বায়োগ্যাস প্লান্ট করতে কি কি লাগে?

গোয়ালঘর অথবা রান্নাঘরের আশেপাশে ২০০ বর্গফুটের মতো খোলামেলা জায়গা থাকতে হবে যেখানে বায়োগ্যাস প্লান্ট বসানো যায়। বাড়ির মালিকের কমপক্ষে ৩টি গরু অথবা ২০০টি লেয়ার মুরগী থাকতে হবে।

বায়োগ্যাস প্লান্ট তৈরির খরচ ও লাভঃ

পরিবারের লোকসংখ্যা ও গরু বা মুরগীর সংখ্যার উপর ভিত্তি করে প্লান্টের আকার ছোট বড় হতে পারে, সেক্ষেত্রে নির্মাণ খরচও কম/বেশি হবে। মোট নির্মাণ ব্যয়ের মধ্যে আছে নির্মাণ সামগ্রী, নির্মাণ শ্রমিক মজুরি, চুলা ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ ক্রয় বাবদ ব্যয় এবং সার্ভিস চার্জ/ইঞ্জিনিয়ারিং ফি। আকার ভেদে বায়োগ্যাস প্লান্টের খরচ ও ব্যবহার নিম্নের টেবিলে বর্ণিত হলোঃ

প্লান্টের আকার (ঘনমিটার)	কত ঘন্টা জ্বলে	প্রতিদিন কত গোবর লাগে (কেজি)	কয়টি গরু থাকতে হবে	প্লান্ট স্থাপনের আনুমানিক খরচ (টাকা)
২.০	৩-৪	৪০	৩	৪০,০০০
২.৪	৪-৫	৬০	৪	৪৫,০০০
৩.২	৬-৮	৮০	৬	৫৫,০০০
৪.৮	১০-১২	১২০	৮	৬৫,০০০

ফাইবার গ্লাস বায়োগ্যাস প্লান্টঃ

ফাইবার গ্লাস বায়ো ডাইজেস্টার এর সুবিধাসমূহঃ

১। দ্রুত ও সহজে স্থাপন করা যায় এবং স্থায়িত্বকাল ন্যূনতম ৩০ বছর
২। লিকেজ/ফাটল হবার সম্ভাবনা কম
৩। অল্প জায়গায় স্থাপনযোগ্য
৪। সহজে স্থানান্তরযোগ্য
৫। ওজনে হালকা ও পানিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না

গ্যারান্টি ও নির্মাণ পরবর্তী সেবাঃ

একবার বায়োগ্যাস প্লান্ট নির্মাণ করলে তা ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ব্যবহার করা যায়। অতিরিক্ত সুবিধা হিসেবে ৫ বছরের নির্মাণ গ্যারান্টি পাবেন। এছাড়াও রয়েছে ৩ বছর নির্মাণ পরবর্তী সেবা

স্থান নির্বাচনঃ

স্থান নির্বাচনে নিম্নোক্ত বিষয় গুলি বিবেচনায় আনতে হবে-
ক) স্থানটি এমন হতে হবে যাতে নির্মাণ কাজ সহজ হয়
খ) নির্বাচিত স্থানটি এমন হবে যাতে নির্মাণ খরচ সর্বনিম্ন হ
গ) নির্বাচিত স্থানটি এমন হবে যেন তা সহজে পরিচালনা ও বিভিন্ন কর্মকান্ড যেমন প্লান্ট চার্জিং, মেইন গ্যাস ভাল্ব খোলা ও বন্ধকরণ, স্লারির কম্পোস্ট করণ ও ব্যবহার, গ্যাস লিকেজ নিয়ন্ত্রণ এবং পাইপলাইন থেকে ঘনীভূত পানি বের করা প্রভৃতি নিশ্চিত করা যায়
ঘ) সাইট এমন হবে যাতে প্লান্টের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়
ঙ) উক্ত স্থানে অদূর ভবিষ্যতে কোন দালান বা রাস্তা নির্মাণের সম্ভাবনা আছে কিনা তা বিবেচনা করতে হবে
চ) সদ্য ভরাট মাটিতে প্লান্ট নির্মাণ করলে প্লান্ট ফেটে বা ডেবে যেতে পারে
উল্লিখিত বিষয়গুলোর আলোকে নিচের বিষয়গুলো বিবেচনায় এনে প্লান্টের স্থান নির্বাচনের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছেঃ
১। বায়োগ্যাস প্লান্টের কার্যকর চালনার জন্য ডাইজেস্টারে সঠিক তাপমাত্রা (২০°-৩৫° সেঃ) বজায় রাখতে হবে
২। বায়োগ্যাস প্লান্টের নির্মাণের জায়গা যতদূর সম্ভব সমতল হতে হবে
৩। স্থানটি আশে পাশের জায়গা থেকে উঁচুতে হওয়া উচিত যার ফলে স্থানটিতে পানি জমবে না, স্থানটি একটু উঁচু হলে আউটলেটের ওভারফ্লো থেকে পিটে স্লারির অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত হবে
৪। বায়োগ্যাস প্লান্টের সহজে চালনা করতে এবং গোবর বা মুরগি বিষ্ঠার অপচয় রোধ করতে প্লান্টকে যতটা সম্ভব গোয়ালঘর বা পোল্ট্রি ফার্মের কাছাকাছি হতে হবে
৫। গোবর বা মুরগীর বিষ্ঠা ডাইজেস্টারে প্রবেশ করাতে যথেষ্ট পরিমাণ পানি প্রয়োজন, যদি পানির উৎস দূরবর্তী হয় তাহলে পানি সংগ্রহের বোঝাটা বড় হয়ে দাড়ায়, তবে পানি দূষণ এড়াতে স্লারি পিট থেকে কুয়া বা নলকূপ কমপক্ষে দূরে হওয়া ভাল
৬। গ্যাস পাইপ বেশি বড় হলে সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যয়বহুল হবে বিধায় ব্যবহারকারীর ব্যয় বেড়ে যাবে, অধিকন্তু বেশি বড় পাইপের ক্ষেত্রে গ্যাস লিকেজ এর ঝুঁকি বেড়ে যায়, গ্যাস চেম্বারের ঠিক উপরে স্থাপিত মেইন ভাল্ভ গ্যাস ব্যবহারের পূর্বে খোলা হলে ব্যবহারের পর তা বন্ধ করে দিতে হবে, কাজেই প্লান্টটি রান্নাঘরের যতটা সম্ভব নিকটে স্থাপন করাই ভাল
৭। প্লান্টের প্রান্তভাগ ঘরের ভিটা বা কোন কাঠামো থেকে কমপক্ষে ২ মিটার দূরে থাকতে হবে
৮। স্লারি-পিট হচ্ছে বায়োগ্যাস প্লান্টের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কাজেই এগুলো জন্য যথেষ্ট জায়গা থাকতে হবে
৯। গাছের শিকড়ের ক্ষতি থেকে বাঁচাতে বায়োগ্যাস প্লান্টটি বড় গাছপালা থেকে দূরে নির্মাণ করতে হবে
১০। প্লান্ট ডেবে বা বসে যাওয়ার সম্ভাবনা এড়াতে মাটির সহন ক্ষমতা যথেষ্ট হওয়া চাই
১১। মাটিতে ভাইব্রেশন সৃষ্টি করে এমন কোন মেশিন থেকে প্লান্টটি অবস্থান যথেষ্ট দূরে হতে হবে। ভাইব্রেশন কারণে গ্যাস চেম্বার বা ডাইজেস্টার ওয়াল ফেটে যেতে পারে
১২। জায়গা নিতে সমস্যা হলে প্লান্টটি তারপিক ও উপরিভাগ সঠিকভাবে মাটি ভরাট করে উহার উপরে রান্না বা গোয়াল ঘর স্থাপন করা যেতে পারে

গবাদিপশু ও পোল্ট্রি খামার বর্জ্য ব্যবহার করে কম্পোস্ট বা জৈব সার তৈরি

প্রযুক্তিটির বৈশিষ্ট্যঃ

- জৈব সার তৈরির মাধ্যমে খামারে উৎপাদিত বর্জ্যের ব্যবহার ও পরিবেশ দূষণ রোধ
- খামারীয় রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু ও আগাছার বীজ ধ্বংস করা
- জৈব সার তৈরীর ফলে বর্জ্যের গন্ধ দূর করা
- সহজে প্যাকিং ও পরিবহণ করা যায়
- কৃষিজ ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়
- জৈব সার বিক্রি করে খামারের আয় বৃদ্ধি করা হয়
- তেমন কোন শক্তি খরচের প্রয়োজন হয় না
- মাছের পুকুরে ব্যবহার করা যায়

শেড বা ছাউনিঃ বৃষ্টির পানি না ঢুকতে এমন ছাদযুক্ত হবে। শন, খড়, বাঁশ, চাটাই ও উপরে পলিথিন দিয়ে অল্প খরচে শেড তৈরী করা হয়। গর্তের আকৃতিঃ ৬ ফুট লম্বা, ৩ ফুট প্রস্থ ও ৩ ফুট গভীরতা যা ক্ষেত্রে নিচু হলে, প্রাপ্ত বর্জ্যের পরিমাণের উপর নির্ভর করবে গর্তের আকৃতি

কম্পোস্ট বা জৈব সার তৈরিতে ব্যবহৃত বর্জ্যঃ

গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া এবং মুরগির খামারে উৎপাদিত গোবর, বিষ্ঠা এর প্রধান কাঁচামাল। এছাড়া লিটার খড়ের মতো পাতা, আগাছা যেমন- কচুরি পানা, হেলেঞ্চা/কেটি ঘাস ইত্যাদি। বর্জ্যে আর্দ্রতা বেশি হলে অন্য শুকনা জল হাবার জন্য উহার সাথে কাঠের গুড়া/কাটা শুষ্ক খড় মিশিয়ে দিতে হবে। বর্জ্যের শুষ্ক বস্তু ৫৫% থাকলে তা সরাসরি ব্যবহার করা যাবে। অর্থাৎ বর্জ্যে পানির ভাগ ৫৫% এর বেশী হলে আনুপাতিক হারে শুষ্ক বস্তু যোগ করতে হবে। সাধারণত বর্জ্যে আর্দ্রতার পরিমাণ ঠিক আছে কিনা তা বুঝার সহজ উপায় হচ্ছে কিছু পরিমাণ উপাদান হাতের মুঠোয় নিয়ে মুষ্টিবদ্ধ করলে যদি একসাথে বাঁধে তবে বুঝতে হবে আর্দ্রতা ঠিক আছে। আর চাপ দেওয়ার পর যদি পানি বের হয় তবে বুঝতে হবে আর্দ্রতা বেশী আছে।

বায়ো-স্লারি

গরুর গোবর/মুরগীর বিষ্ঠা ডাইজেস্টারের ভিতরে পরিপাক বা ফেরমেন্টেড হওয়ার পর আউটলেট দিয়ে তরল অবস্থায় বের হয়ে আসলে তাকে বায়ো-স্লারি বলে। বায়ো-স্লারি একটি অতি উন্নত মানের জৈব সার। ইহা তরল, শুকনো কিংবা কম্পোস্ট আকারে ব্যবহার করা যায়।

স্লারি ব্যবহারের উপকারিতাঃ

১। উন্নত মানের জৈব সার হিসাবে কৃষি জমিতে ব্যবহার করে মাটির জৈব পদার্থ বজায় রাখার মাধ্যমে উর্বরতা বৃদ্ধি করা যায়

২। বায়ো-স্লারিতে উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদানের উপস্থিতি (প্রাপ্যতা) সনাতন জৈব সার যেমন গোবর, হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠা, খামারজাত সার ও কম্পোস্ট অপেক্ষা বেশী থাকে বলে এতে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায় ও উদ্ভিদ সহজে গ্রহণ করতে পারে

৩। রাসায়নিক সারের সাথে বায়ো-স্লারি ব্যবহার করা হলে রাসায়নিক সারের সাশ্রয় এবং জমিতে দরকারী জৈব পদার্থ যোগ হয়

৪। অম্লীয় মাটিতে বায়ো-স্লারি ব্যবহারের ফলে মাটির পুষ্টি উপাদান সহজলভ্য হয়

৫। ফসলের ফলন ও গুণগতমান বৃদ্ধিতে এ সার ব্যবহার লাভজনক

৬। বীজতলা বা চারা উৎপাদনের জন্য টবে বা পলি ব্যাগে মাটির পরিবর্তে ব্যবহার করা যায়

৭। বীজের অঙ্কুরোদগম পরীক্ষায় ব্যবহার করা যায়

৮। টবে ফুলের গাছ ও বাড়ীর ছাদে বাগান করার ক্ষেত্রে বায়ো-স্লারি ব্যবহার অধিক সুবিধাজনক

৯। পুকুরে কিংবা মৎস্য খামারে ব্যবহার করলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়
১০। ভার্মি-কম্পোস্ট তৈরিতে ব্যবহার করা যায়
১১। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মাশরুম চাষে ব্যবহার করা যায়।

স্লারি সংগ্রহ পদ্ধতি, বায়ো কম্পোস্ট তৈরি এবং ব্যবহার

বায়োগ্যাস প্লান্ট থেকে নির্গত বায়ো-স্লারি প্লান্টের আউটলেট থেকে নালা অথবা পিভিসি পাইপের মাধ্যমে পিটে সংগ্রহ করতে হয়। যদি পিট নির্মাণ করা সম্ভব না হয় তা হলে প্লাস্টিকের ড্রামেও স্লারি সংগ্রহ করা যায়। বায়ো-স্লারি পিট বায়োগ্যাস প্লান্টের একটি অবিচ্ছিন্ন অংশ। একে বাদ দিয়ে প্লান্টটিকে পরিপূর্ণ করা যায় না। ওভার ফ্লো ট্যাংকের নিকট দুটি পিট থাকবে (চিত্রানুযায়ী) যেন বায়ো-স্লারি অতি সহজে পিটে জমা হতে পারে। পিটগুলি হাইড্রোলিক চেম্বার হতে কমপক্ষে ১০০ সে.মি দূরত্বে রাখা দরকার যেন মাটি সরে গিয়ে হাইড্রোলিক চেম্বারের কোন ক্ষতি করতে না পারে। দুটি পিটের আয়তন ডাইজেস্টারের আয়তনের সমান হতে হবে। প্রাপ্যতার আলোকে আয়তন ঠিক রেখে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ পরিবর্তন করা যাবে। পিটের গভীরতা ১ মিঃ এর বেশী হওয়া উচিত নয়। কারণ এতে স্লারি সংগ্রহ কঠিন হতে পারে। পিটের চারপাশের উঁচু করে বাঁধ দিতে হবে যাতে বৃষ্টির পানি ঢুকতে না পারে।

কম্পোস্ট তৈরিঃ

বাড়ীতে প্রাপ্য বিভিন্ন জৈব পদার্থ যেমন গাছের পাতা, খড়, রান্না ঘরের আবর্জনা ইত্যাদি স্লারির সঙ্গে মিশিয়ে কম্পোস্ট তৈরি করা হয়। নিম্ন পদ্ধতিতে পিটে কম্পোস্ট তৈরি করা যায়ঃ

১। পিটের তলায় শুকনো বিভিন্ন জৈব পদার্থ যেমন খড়, কচুরী পানা, গাছের শুকনো পাতা, বাড়ির আবর্জনা ইত্যাদি ১৫-২০ সে.মি পুরো করে বিছিয়ে দিতে হবে। এই সকল শুকানো জৈব পদার্থ বায়ো-স্লারি জলীয় অংশ শুষে নেয় এবং বায়ো-স্লারিতে বিদ্যমান যে সকল উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদান চুয়ে যাওয়া প্রতিরোধ করে।
২। পিটের তলায় বিছিয়ে দেওয়া শুকনো জৈব পদার্থের উপর বায়ো-স্লারি জমা হবে। যদি সম্ভব হয় স্লারি সমানভাবে জৈব পদার্থের উপর ছড়িয়ে দিলে ভাল হয়।
৩। বায়ো স্লারি সমান স্তরে ছড়িয়ে দেবার পর এর (স্লারির) উপর ৪ সে.মি ছোট করে কাটা খড় বা অন্য কোন শুকনো জৈব পদার্থ বিছিয়ে দিতে হবে। খড় বা জৈব পদার্থের আবরণ বায়ো-স্লারিকে রোদে শুকানো থেকে রক্ষা করে গাছের খাদ্য উপাদান নষ্ট হওয়া রোধ করে।
৪। এভাবে পর্যায়ক্রমে বায়ো-স্লারি বা শুকনো খড় বা জৈব পদার্থ স্তরে স্তরে ছড়িয়ে পিট সম্পূর্ণভাবে ভর্তি করতে হবে। স্তূপীকৃত স্লারি ও খড় বা জৈব পদার্থের উচ্চতা পিটের মাটির লেভেল থেকে ১৫-২০ সে.মি উঁচু হওয়া দরকার।
৫। পিট সম্পূর্ণ ভর্তি হয়ে গেলে একটি পলিথিন পাতলা স্তরের মাটি দিয়ে ঢেকে এক মাসের জন্য রেখে দিতে হবে।
৬। একইভাবে দ্বিতীয় পিটটি পূর্ণ করা শুরু করতে হবে।
৭। সম্ভব হলে এক মাস পর প্রথম কম্পোস্টকে উল্টিয়ে দিতে হবে। পিটের কম্পোস্টকে আগের মত পলিথিন বা হালকা ভাবে মাটির কম্পোস্টকে আগের মতো পলিথিন বা হালকা ভাবে মাটির স্তর দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
৮। একইভাবে পুনরায় ১৫ দিন পর প্রথম পিটের কম্পোস্টকে উল্টিয়ে ও ঢেকে দিতে হবে।
৯। দ্বিতীয় পিটের ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।
১০। পিটের উপর চাল তৈরী করলে তা বৃষ্টির পানি প্রবেশ রোধ করবে এবং অতিরিক্ত সূর্যের আলো থেকে রক্ষা করবে।
১১। লতাজাতীয় সব্জি আবাদে এই চাল মাচা/মাচা হিসাবে ব্যবহারের মাধ্যমে চাল তৈরীর অতিরিক্ত খরচ পুষিয়ে নেয়া যায়।

স্লারি বা স্লারি কম্পোস্ট উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ

স্লারি বা স্লারি কম্পোস্টে গাছের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। স্লারি বা স্লারি কম্পোস্ট বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরি হয় বিধায় এর পুষ্টিমান প্রচলিত জৈব সার যেমন গোবর, হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠা, খামারজাত সার ও কম্পোস্ট অপেক্ষা শতকরা ২০-৩০ ভাগ বেশী থাকে।

জৈব সার ব্যবহার করলে পরবর্তী ফসলে অজৈব সার কম ব্যবহারের পরিমাণঃ

জৈব সার	পরবর্তী ফসলে অজৈব সারের পরিমাণ কমানো (কেজি) (ব্যবহারকৃত প্রতি টন জৈব সারের হিসাবে)		
	ইউরিয়া	ফসফেট সার	পটাশ সার
গোবর সার/গ্রাম্য কম্পোস্ট	১০	৮	১০
মুরগীর বিষ্ঠা সার	২০	৩২	১৪
খামারজাত সার	৭	৪	৩
কম্পোস্ট	২	৩	৬

কম্পোস্ট তৈরি করার পাশাপাশি বায়োগ্যাস স্লারি অন্যান্য কাজেও ব্যবহার করা যায়। যেমনঃ

-সরাসরি কৃষি জমিতে সার হিসেবে প্রয়োগ

-সরাসরি মাছের খামারে (পুকুরে) মাছের খাদ্য হিসেবে প্রয়োগ

-যদি কম্পোস্ট পিট কম্পোস্টিং করা সম্ভব না হয় তবে হিপ (স্তূপাকৃতি) কম্পোস্টিং করা যেতে পারে

-ভার্মি-কম্পোস্টিং এর মাধ্যমে কেঁচোসার প্রস্তুত

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ এর কবল থেকে পশুপাখি রক্ষায় করণীয়

বাংলাদেশ ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশের মানুষ, পশুপাখি, উদ্ভিদ প্রভৃতি এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়ে থাকে, খরা, শীত, সিডর, আইলা, তাপমাত্রার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়া, অতি বৃষ্টি, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, খাদ্যের অভাব, মারাত্মক সংক্রামক রোগ ইত্যাদি নানাবিধ দুর্যোগ উল্লেখযোগ্য। স্বাভাবিক দায়িত্ব নির্বাহ ছাড়াও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বিভাগ, জেলা ও উপজেলা এবং প্রকল্পসমূহের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ নিম্নলিখিত কার্যসমূহ সম্পাদন করেন।

স্বাভাবিক সময়েঃ

ক। প্রতিবছর ঘূর্ণিঝড়/বন্যা মৌসুম শুরু হওয়ার পূর্বেই ঘূর্ণিঝড়/বন্যাপ্রবণ এলাকার প্রাণিসম্পদ নিরাপত্তা ও সুরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসারগণ কৃষক এবং খামারীদের সতর্ক করবেন।

খ) অধীন অফিসসমূহ, খামারী এবং এর প্রতিনিধি প্রভৃতির সাহিত অধিদপ্তরের গৃহীত নিজস্ব পরিকল্পনা অনুসারে প্রস্তুতির অবস্থা পরীক্ষা করবেন।

গ) দুর্যোগ চলাকালীন সময়ে প্রাণিসম্পদ সমূহ, অধিদপ্তরের পর্যাপ্ত নিরাপত্তার সাথে রাখার জন্য স্থায়ীভাবে নিরাপদ স্থান চিহ্নিত করবেন।

ঘ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকাসমূহের সরকারী ও বেসরকারী প্রাণিসম্পদ সমূহের হালনাগাদকৃত তালিকা প্রণয়ন ও সংরক্ষণ করবেন।

ঙ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকাসমূহের জনসংখ্যা, খামারী ও খামারসমূহের জরিপ ও উপাত্ত সংরক্ষণ করবেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর পর তা হালনাগাদ করবেন।

চ) সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসজনিত আঘাতের কারণে লবণাক্ত পানির প্রবেশ রোধ করবার জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার বাঁধ ও স্লুইস গেইটসমূহের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করবার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের সহিত সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করবেন।

ছ) ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলা প্রস্তুতি ও পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ এবং পুনর্বাসন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন।

দুর্যোগ পর্যায়ঃ

ক) ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজ এবং উদ্ধার অভিযানের জন্য স্বেচ্ছাসেবী যান রিকুইজিশন করার ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান করবেন (ঘূর্ণিঝড় দুর্যোগকালীন সময়)।

খ) নিয়ন্ত্রণ কক্ষ চালু করবেন এবং স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে যোগাযোগ কর্মকর্তা প্রেরণ করবেন।

পুনর্বাসন পর্যায়ে করণীয়:

ক) সরকারী ও বাণিজ্যিক/ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রাণিসম্পদ খাতে ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণের জন্য অফিস থেকে জরিপকার্যের ব্যবস্থা এবং এই খাতের জন্য অফিস থেকে দীর্ঘ মেয়াদী ত্রাণ ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন ও তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করবেন।

খ) প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন খাতে অফিস থেকে দীর্ঘ মেয়াদী ত্রাণ ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন এবং কাজের অগ্রগতির বিষয়ে উচ্চ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন পেশ করবেন।

গ) ক্ষতিগ্রস্থ খামারি দের পুনর্বাসনের জন্য অর্থপ্রাপ্তিতে এবং সহায়তা করবেন

ঘ) স্থানীয় প্রশাসনকে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে সহায়তা প্রদান করবেন

ঙ) খামারীদের জন্য ঋণের ব্যবস্থা করবেন।

বাংলাদেশে প্রতিবছর কোন না কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয়। এসকল প্রাকৃতিক দুর্যোগ জনগণ, গবাদি প্রাণি এবং পোল্ট্রির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে থাকে। সঠিক ব্যবস্থাপনা এবং দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি সম্পর্কে জনসাধারণ অবহিত থাকলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেকাংশে কমানো সম্ভব হয়

প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রতিরোধ ব্যবস্থা:

১. বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করে দুর্যোগগ্রস্ত এলাকার মানুষ, প্রাণিসম্পদের সমস্যা মোকাবেলা করা যায়।
২. উপকূলীয় বনায়ন করে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করা যায়।
৩. প্রাণির খাবারের জন্য লবণাক্ত সহিষ্ণু ঘাস চাষ করা যেতে পারে।
৪. জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ ও ঝুঁকি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা যেতে পারে।
৫. রেডিও, টিভি ও অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমে পরিবেশ বিপর্যয়ের আগাম সংবাদ এবং তাৎক্ষণিক সংবাদ প্রচার করে
৬. জনসচেতনতা বাড়ানো যায়।
৭. দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার জন্য মূল্যবান সম্পদ এবং প্রাণিসম্পদকে স্থানান্তর করা যেতে পারে।
৮. পশু পাখির জন্য নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করা যেতে পারে।
৯. গবাদিপশুর দুর্যোগ কালীন খাবার মজুদ রাখা যেতে পারে।
১০. রেডিও, টিভি এবং মাইকে নিজ নিজ এলাকার মসজিদে দুর্যোগ এর খবর প্রচার করা যেতে পারে।
১১. দুর্যোগ, দুর্যোগের স্থায়ীত্ব, সতর্কসংকেত, দুর্যোগ বার্তা, জরুরী দুর্যোগ মোকাবেলা, দুর্যোগ পূর্ব এবং দুর্যোগ পরবর্তী জরিপ, প্রাথমিক চিকিৎসা, স্বেচ্ছা সেবক তৈরি এবং তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা, পোস্টার, লিফলেট বিলি করা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও খামারি সংগঠনকে দুর্যোগ মোকাবেলায় আগাম প্রস্তুতি গ্রহণের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রাণিসম্পদ প্রতিপালনকারীদের অধিকতর সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবেলায় জীবন ও সম্পদ রক্ষা করা যেতে পারে

দুর্যোগকালীন সময়ে করণীয়:

জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রতিবছরই অনাকাঙ্ক্ষিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ বয়ে যায়। এর মধ্যে রয়েছে বন্যা, খরা, সাইক্লোন, ঘূর্ণিঝড়। যা মানুষ এবং গবাদিপশুর জন্য হুমকিস্বরূপ। প্রতিবছরই প্রাকৃতিক দুর্যোগে জীবন এবং সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতা বেড়ে চলেছে। বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলোর দীর্ঘদিন ড্রেজিং না করায় সবগুলো নদী পলি দ্বারা ভর্তি হয়ে ইদানীং বন্যার প্রকোপ বেড়ে গেছে। নদীর তীরবর্তী শহর ও গ্রামে বহু গবাদি প্রাণি ও মুরগি খামার রয়েছে। এ ছাড়া উপকূলীয় চরাঞ্চলে মানুষের জীবন ও জীবিকা নির্বাহের জন্য গবাদিপশু ক্ষেত্র বিশেষে প্রধান অবলম্বন।

সমুদ্রতীরবর্তী জেলাগুলোতে সাইক্লোন-ঘূর্ণিঝড় প্রায় প্রতিবছরই আঘাত হানে। এতে করে গবাদিপশু পালনকারী কৃষকগণ মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হন। এমতাবস্থায় সকল কৃষক ও খামারীদের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় আগাম প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন। আমাদের দেশে সাধারণত এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত এ দুর্যোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। সুতরাং প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় জনসাধারণ এবং প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট অফিসগুলোর দায়িত্ব হবে দুর্যোগকালীন সময়ে গবাদিপশুর আশ্রয় ও খাবারের পরিকল্পনা পূর্ব থেকে নির্ধারণ করা। প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসার পূর্বেই গবাদি পশুর জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য মজুদ করতে হবে। এক্ষেত্রে খড় সংরক্ষণ, কাঁচা ঘাস ব্লক পদ্ধতিতে সাইলেজ তৈরি করে মজুদ করা যেতে পারে।

এ সাইলেজ তৈরি পদ্ধতি খামারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন। এছাড়া দানাদার খাদ্যের মজুদ দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় পূর্বে থেকেই নিশ্চিত করা জরুরি। দুর্যোগকালীন সময়ে গবাদিপশু নানান ধরণের স্বাস্থ্যঝুঁকির শিকার হয়। বিশেষ করে মাটি ও পানিবাহিত রোগ এদের বেশি সংক্রমিত করে।

দুর্যোগকালীন সময়ের পূর্বেই সকল প্রাণিকে সংক্রামক রোগের (তড়কা, বাদলা, গলাফুলা, ক্ষুরা রোগ) টিকা প্রদান করা জরুরি। এসময় পেটের পীড়া- ডায়রিয়া, আমাশয়সহ অন্যান্য রোগ দেখা দেয়। এসময় গবাদি প্রাণিকে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করাতে হবে। গবাদিপশুর খাদ্য হিসেবে বিভিন্ন গাছের পাতা যেমন: কাঁঠাল পাতা, কলাপাতা, বাঁশপাতা, ডুমুর পাতা, বাবলা পাতা এবং অন্যান্য পাতা খাওয়ানো যেতে পারে

- ✓ বাড়ির আশে পাশে এবং ডোবা পুকুরের পাড়ে, জার্মান ঘাস বন্যার প্রস্তুতি হিসেবে পূর্ব থেকেই লাগানো যেতে পারে।
- ✓ বাড়ির আশে পাশে, পুকুর পাড়ে, রাস্তার পাশে পশু খাদ্য হিসেবে ইপিল-ইপিল, নেপিয়ার হাইব্রিড পরিকল্পিত ভাবে দুর্যোগ মোকাবেলায় লাগানো যেতে পারে।
- ✓ বন্যা সরে গেলে পশু খাদ্য হিসেবে খেসারী মাসকলাই ভুট্টা চাষ করা যেতে পারে
- ✓ গবাদিপশুকে ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র এবং ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক তৈরি করে খাওয়ানো যেতে পারে।
- ✓ এছাড়াও আশে পাশে কচুরিপানা, অন্যান্য জলজ ঘাস সংগ্রহপূর্বক পরিষ্কার পানি দ্বারা ধৌত করে খড়ের সাথে ১ : ১ অনুপাতে মিশিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে।

বন্যাকবলিত এলাকায় ঘাস চাষ

- ✓ বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পরপরই (অক্টোবর-নভেম্বর মাসে) কর্দমাক্ত জমি ঘাস চাষের জন্য নির্বাচন করা যায়। আলাদা ভাবে জমিতে চাষ দেওয়া বা জমি তৈরির দরকার হয় না। উক্ত কর্দমাক্ত জমিতে সরাসরি ঘাসের কাটিং লাগানো যায়।
- ✓ রোপণ পদ্ধতি, সার প্রয়োগ এবং কাটিং এর পরিমাণ উপরের বর্ণনা মতই
- ✓ প্রথম চাষের সময় ঘাসের সাথে ডাল জাতীয় ফসলের আবাদ করা যেতে পারে
- ✓ লাগানোর ৪৫-৬৫ দিন পর প্রথম কাটিং এবং এরপর প্রতি ৩০ দিন পর পর ঘাস কাটা যায়।
- ✓ এপ্রিল-মে মাস পর্যন্ত ঘাস পাওয়া যায়। তবে, অবশ্যই বন্যার পানি আসার পূর্বেই শেষ কাটিং নিতে হবে। কেননা, এ ঘাস বন্যার পানিতে বেঁচে থাকতে পারে না।
- ✓ অতিরিক্ত ঘাস সাইলেজ উপায়ে সংরক্ষণ করা যায়।
- ✓ পরবর্তী সময়ে রোপনের জন্য কাটিং উঁচু জায়গায় সংরক্ষণ করা যেতে পারে

ঘুচবে অভাব আসবে সুদিন
প্রাণি প্রযুক্তি হাতে নিন।
হাওরবাসীকে আহবান
প্রাণিসম্পদের শিল্পায়ন।

হাওর অঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়